অশান্ত ঝিলম

আবদুল জব্বার

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৫৭

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর

চন্দ্রশেখর চৌধুরী

লক্ষ্মী প্রেস

১২ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

এই লেখকের :

ইলিশমারির চর

বাংলার চালচিত্র

বিদ্রোহী বাসিন্দা

অলৌকিক প্রেমকথা

কণকচূড়া

ইত্যাদি

॥ ১ ॥

'আসুন শিল্পী, এই জগন্নাথ—আমাদের কফি দে দু'কাপ—পুজোয় কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?'

শিল্পী তাব আয়ত চোখ মেলে নতুন প্রচ্ছদটি দেখতে দেখতে বলল, 'ল্যাকাবিং কবলে ছবিটা আবো কত খুলত, এমন কৃপণতা করেন—'

'সাতখানা পকেট বুকের কভার পুজোর পরেই কিন্তু করে দেবেন সিরাজ সাহেব, ডোবাবেন না যেন।'

'আপনি তো সব সময়েই ডুবে আছেন! তার মানে আপনি হিমশৈল, উপবে যা দেখা যায তার ন'গুন থাকে সলিলে।'

'আপনাব চেকটা মহালয়ার আগের দিন নিলে হয় না ?'

'সর্বনাশ! চেকটেক নয়, ক্যাশ দিন, কালই আমি কাশ্মীরে চলে যাচ্ছি। ওখানে বসে ছবিগুলো শেষ করব।'

'আজকেই কি হবে ? দেখি প্রদোষ বাবুকে বলে'—অন্য ঘরে ফোনে নাম্বার দিয়ে রিসিভার তুললেন ভানু মিত্র: 'হ্যালো, এই প্রদোষ, আর্টিস্ট সিরাজ সাহেবের টাকাটা আজ হবে ? উনি বসে আছেন। পাঁচ শোর বেশি হবে না ? আরে ওর যে দশখানা ছবির পনেরো শো টাকা পাওনা।—হাজার খানেক দিলে হবে ভাই ?'

সিরাজ কফিটা শেষ করে দামী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট ধরাল। ওর হাতে দামী একটি লাইটার, ভানুবাবুকে সিগারেট অফার করল।

'হবে না যে তা নয়, তবে হয়তো বাইরে গিয়ে টাকার টান পডলে ঘড়ি-আংটি বেচতে হবে।'

'কি যে বলেন, পাঁচঘরে আপনি কাজ করেন, আপনারই তো এখন বাজার। একটু বসুন, বিল আর টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি সব বিল করে দিয়েছেন তো ?'

'হ্যাঁ, সে তো সঙ্গে সঙ্গেই।'

একটি তরুণী এসে দাঁড়াল। আন্দাজে সিরাজের মনে হল ভানুবাবুর কন্যা ওটি। বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল, আপনি?'

'ভাল।'

'হ্যাঁ, এদেশে সবাই ভাল থাকে।'

হাসলেন ভানুবাবু। তরুণীটিও হাসল।

ভানুবাবু বললেন, 'আমার কন্যারত্ন!'

'আন্দাজে ধরেছি।' হাতে সময় থাকলেও বেশিক্ষণ বসে থাকা শোভন মনে করল না সিরাজ। ঘড়ি দেখল। বলল, 'একটু যদি তাড়াতাড়ি করেন।'

'বসুন বসুন, কাশ্মীরে যাচ্ছেন, কোথায় উঠবেন?'

'আমার বাবার ছোট শ্যালক থাকেন ওখানে, ভদ্রলোক খুব ধনী, কার্পেট ব্যবসা আছে, দেখি সেখানেই উঠব।'

'তাহলে তো থাকা খাওয়ার খরচা লাগবে না। নিন, আপনার দক্ষিণা।'

সই করে টাকাপয়সাগুলো না গুনেই ব্যাগে পুরে নিয়ে উঠে পড়ল সিরাজ।

ভানুবাবুর মেয়েটি তাকাল। হাসল মুখ টিপে। অবশ্য বাবাকে আড়াল করে।...

সিরাজকে দেখতে ভাল। হয়তো একটু বেশি মাত্রায় ভাল। এটা তার উপরি পাওনা। তাই তার চারপাশে মক্ষিকাদের ভিড় হয়। বন্ধুরা ঈর্ষা করে। এখন আর কফি হাউসে যায় না। তখন ওরই পকেট কাটত সকলে। যেন বোকা বানাত। এখন আর সময় কোথায়? গেলেও ট্রিংসে একাই থাকতে চায়। ভাল খায়। আধখাওয়া করে অনেক কিছু ফেলে রাখে। বেশি টিপস্ দেয়। বেয়ারারা তাকে সসম্মানে সার্ভ করে।

সিরাজ এখন সে সিরাজ নেই, যে ছেলেটা কাগজের অভাবে ছবি আঁকতে পারত না, পত্রিকা অফিসে যে আড্ডা মারত কিছু আঁকার কাজ পাবার জন্যে—এখন সে যাদুকর—তারের ওপর দিয়ে চলেছে—নিচে হাজার লোক—বাহবা, বেশ গতিভঙ্গি—চমৎকার।

শুকনো চেহারার লোকটি থমকে পথ রোধ করে বলল, 'কেমন আছেন?'

'আরে! শিল্পী সিরাজ, কি খবর? এখনো তুমি যে মদ খাচ্ছ না—এতবড় শিল্পী, দুহাতে পরিশ্রম করছ, টাকা কামাচ্ছ, পথে টলে টলে যাবে, পুর্ণটা ওই করে গেল

'কখনো একটু মেজাজে থাকা মন্দ না, তবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা এই গরম দেশে ভাল না, বলুন এখন কি লিখছেন ?'

'আমার দিন তো ফুরোল। আমাকে কাগজের লোকেরা আর পাত্তা দিচ্ছে না। ওরা পুতুল নাচায়—একে একবার, ওকে একবার। চুলোয় যাক, আমার পাবলিসার আছে।'

'আপনার লেখা আমি ভালবাসি। আচ্ছা চলি।' খানিকটা আসার পর ট্যাক্সি পেল সিরাজ। ভদ্রলোক লেখকটির কি নিদারুণ অবস্থা! ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, ময়লা কাপড়, বিবর্ণ পাঞ্জাবি। প্রকাশকরা ওঁকে ঠকায়। শক্ত হাতে পয়সা আদায় করতে জানেন না। লেখা তো ওঁর আগুন। নামটা কি যেন ?

কিছুক্ষণ বাইরের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল। মিঃ নন্দী।

গ্রামের ধানক্ষেত, আলপথ, অর্জুন গাছ, বাঁশবন, আলুক্ষেত, গরু-বাছুর, নদী—কত কিছু মনে পড়ছে তার।

তাদের মাটকোটা দোতলা বাড়িটা পড়ে আছে। অথচ ঐ সৈয়দ বাড়ির একদিন কি'দপদপা ছিল।

বাসায় এসে স্নান করে খেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোল সিরাজ।

রাত্রে আঁকা-জোকার কাজ নিয়ে বসল, কিছুক্ষণ পর কে যেন দোরে আঘাত করল।

দোর খুলতে দেখল একতলার রুমা। তার গালে টোকা দিয়ে বলল, 'কি খবর বুড়ী. বব্ চুলে চাঁদমুখী—তোকে নাইস দেখাচ্ছে।'

'আপনার শিল্পীর চোখ! আমি তো কুৎসিত। ভাইয়া আমাকে একটা প্রজাপতি এঁকে দিন না।'

'তুই নিজেই তো একটা প্রজাপতি বাবা। যা এখন, ক্লাস নে—কাজ করছি।'

'না দিলে কাজ নষ্ট করে দেবো!'

রুমাকে ধরে খানিকটা আদর করল সিরাজ। কাতুকুতু দিল। তারপর গামছা দিয়ে বেঁধে রাখল বিছানায়। ও আবো উদ্দাম হয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করতে লাগল। ক্লাস ফাইভে পড়ে মেয়েটি। ওর ভাই ছোটন এলো এবার। চুপি চুপি বলল, 'ওকে বুঝি প্রজাপতি এঁকে দেওয়া হচ্ছে? তাহলে আমাকেও একটা ঘোড়া এঁকে দিতে হবে।'

'তোমার বাবা ব্যারিস্টার—তাঁর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কেস করব।'

'কেস করবেন? জানেন, তাঁর কত ফিজ?' বলল রুমা।

'তোর বাবাকে আবার কেউ ফিজ দেয় নাকি?'

'পড়েন নি তো বাপীর পাল্লায়। আমার দাদামশায়ের কেসেও বাপী টাকা নিলেন।'

'এই, বাপের নিন্দে করবে না!'

ছোটন বলল, 'কানমলা খাও।'

রুমা বলল, 'কেমন করে খাব। আমার তো হাত পা বাঁধা।'

'মনে মনে খাও। নাও, এই তোমার প্রজাপতি। আর—এই ছোটনের ঘোড়া।'

দুজনে খুশি হয়ে চলে গেল।

সিগারেট ধরালো সিরাজ। কতকগুলো আর্ট গ্যালারীর নিমন্ত্রণ-পত্র নেড়ে-চেড়ে দেখল। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। অর্কিডগুলো চমৎকার ফুল নিয়ে ঝুলছে। পাশের বাড়ির বারান্দায় ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোয় প্রেমগুঞ্জনে মত্ত দুটি যুবক-যুবতী।

একা থাকলে মেয়েটি সিরাজকে দেখে হাসে। আলাপ করতে চায়। সিরাজ কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়। অন্য মনস্কতার ভান করে।

গতকাল ওর কালো মতো ভালো চেহারার বান্ধবী এসে উচ্চহাস্যরোলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কটাক্ষ করছিল: 'একদম ভাল ছেলে, নির্মল চরিত্র। আমি বাবা শিল্পীটিল্পীদের বিয়ে করছি না—ওদের আবার সবদিন ভাত হয় না।'

সিরাজের মনে হয় এই সাধারণ লোকগুলো কতখানি স্বার্থপর আর লোভী। খেয়ে-পরে নিজের মতো বাঁচতে চায়। এদের রুচি বলে কোনো পদার্থ নেই। জনসাধারণের কতজনই বা সংস্কৃতির স্বাদ বোঝে? অনেকেই কেজো লোক। দলে দলে ঐ সব যুবতী মেয়েরা সুখের ঘরকন্না চায়—অথচ ওদের অনেকেই তা পাচ্ছে না। কজনই বা ভাল বর পায়?

সিরাজ আবার কিছুক্ষণ কাজ করল। ক্যানটিন থেকে খেয়ে এসে কিছুক্ষণ একটি বিদেশী জার্নাল পড়ল। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি। ভারি ভাল লাগে সিরাজের। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। চোখ মুখে তার বৃষ্টি ঝরছে।

রাত বেড়ে চলল।

স্তব্ধ কলকাতা।

॥ ২ ॥

সকালে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে বাক্স বোঝাই করে নিয়ে শিয়ালদায় এসে কালকা ট্রেন ধরল সিরাজ। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট, কাজেই খানিকটা নিরিবিলি, ইজিচেয়ারের মতো সিট। লম্বা হয়ে পড়ে রইল। যাত্রীদের মধ্যে দুজন মাড়োয়ার, দুটি মাড়োয়াবী রমণী, পাঞ্জাবী বুড়ো আর তার কন্যা, বাঙালী জন দশেক। মেয়ে আছে চারটে।

ট্রেন চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। হাওড়া থেকে একেবারে বর্ধমান গিয়ে দাঁড়াবে। দূরে দূরে কিছুক্ষণ গাড়ি ধরবে।

বইপড়া ছাড়া এখন আর কি কাজ আছে। অনেকেই ঘুমোতে আরম্ভ করল।

ফ্রন্ট সিট সিরাজের, পাশেই জানালা। বাইরের প্রকৃতি ছুটে চলেছে। আগে কখনো কাশ্মীরে যায় নি। ছোট মামাকে চিঠি লিখে উত্তর পেয়েছে।

অথচ এই মামা টাকাকড়ি গয়নাগাটি নিয়ে নাকি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পাশের সিটে যে মহিলাটি বসেছিলেন তিনি শাড়িপরা বাঙালী মেয়ে। ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। সামনেই বোধহয় ওঁর আত্মীয়। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় জানা গেল তিনি দিল্লী ইউনিভারসিটির প্রফেসার। সামনের ব্যাক সিটে একজন পাঞ্জাবী খবরের কাগজ পড়ছেন।

প্রফেসার আলাপ করতে চাইলেন। বললেন, 'দীর্ঘ সময় বই পড়া, ঘুমোনো ছাড়া আর কিছু কাজ নেই, আলাপ করা যাক— আপনি ?'

সিরাজ বলল, 'আমার নাম সৈয়দ সিরাজ। পেশা ছবি আঁকা—গন্তব্য স্থান কাশ্মীর।'

'আচ্ছা। আমার নাম প্রশান্ত মিত্র, প্রফেসার দিল্লী ইউনিভারসিটি। এ আমার ভাইঝি মণিকা মিত্র, আমার কাছেই থাকে, এম-এ পড়ছে, সাবজেক্ট ইংলিশ।'

মণিকা করজোড়ে নমস্কার করল।

বেশ মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। সুঠাম গড়ন। আয়ত চোখ। নাকটি মাঝারী। মেয়েদের বড একটা নাক হয় না। খাডা তীক্ষ্ণ নাক নাকি ওদের ভাল নয়। 'সিরাজের মনে পড়ল সাহিত্যিক গজেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন 'নাকটি খাঁদা খাঁদা—চোখ দুটি ভাসা—সেই মেয়ে খাসা।'

খাওয়া-দাওয়ার সময় ওঁরা সিরাজকে অংশ দিলেন। সিরাজও তার খাদ্য দিল।

প্রফেসার কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর ঘুমোতে লাগলেন। সন্ধ্যা নামল। রাত নামল। বাইরের প্রকৃতি অন্ধকারে ঢাকা। বৃষ্টি নামল প্রচণ্ড জোরে। ঝড হচ্ছে।

সিরাজ বলল, 'প্রচণ্ড জোবে ঝড হচ্ছে।'

মণিকা ভয়ে ভয়ে তাকাল, বলল, 'ঝড়ে ট্রেন উল্টে দেবে না?'

'আশ্চর্য নয়।'

'গাছ-পালাও ভেঙে পড়তে পারে?'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে, তবে ট্রেন-রাস্তার পাশে সাধারণত গাছপালা থাকে না, ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ট্রেন ছুটেছে।'

'তাতে তো আরো ঝড বাধবে?'

'ট্রেনের গতি কমে আসছে, কাকু ঝড হচ্ছে, তুমি কেবলই ঘুমোচ্ছ, আমার যে ভয় করছে।...'

'চোখ বন্ধ করে ঘুমো, মরলে আর জানতে পারবি না।'

হাসল সিরাজ।

সহসা বজ্রপাত হল।

মণিকা সিরাজের হাত চেপে ধরল। সে থাবড়াল সেই ভীত কম্পিত হাতে। সবাই জেগে গেছে।

একটা স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল।

শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে মুহুর্মুহু।

আবার ট্রেন চলতে লাগল। গতি নিল। ঝড়বৃষ্টি শেষ হয়ে গেল অথবা এদিকে বৃষ্টি হয় নি।

ঘুমিয়ে পড়ল মণিকা ঘাড হেলিয়ে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটি—দেখতে ভাল লাগে সিরাজের।

এক সময় তারও ঘুম পেল, ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রচণ্ড হুইসেলের শব্দে ঘুম ভাঙল প্রায় সকলের। ট্রেন থামল। দুপুরের স্নান-আহার সারল সিরাজ।

মণিকা বিকাল পর্যন্ত অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। ওর কাকা মাঝে মাঝে উঠে যান। জানালা খুলে দাঁড়ান। পায়চারি করেন। বাথরুমে গিয়ে আর সহজে ফেরেন না। খুব সিগারেট খান।

মণিকা বলে, 'কাকু তো পাগল। পাগল না হলে কেউ ডিটেকটিভ গল্প লেখে।'

'আপনি তো পাগলের ভাইঝি। কাজেই আপনার মাথাতেও কিছু ছিট থাকতে পারে।'

'অসম্ভব নয়। তারপর মা—বাবার চেয়ে এই কাকাকে বেশি আদর করে।'

পিঠে থাবড়া মারল সিরাজ।

কত শহর, কত নগর পার হয়ে চলল—এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী। কাকাকে নিয়ে মণিকা নেমে গেল।

পথের পরিচয় পথেই পড়ে রইল। মণিকা ঠিকানা দিয়েছে। চিঠি লিখে যোগাযোগ রাখতে বলেছে।

মণিকার স্মৃতি খানিকক্ষণ নড়াচড়া করল। ও এখনো যদিও ছাত্রী তবু কলকাতার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাডভান্স এটা জানতে পেরেছে, ওর কাছে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা কত গৌণ ব্যাপার। মানুষ যত ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকে ততই গোঁড়া হয়। কতকগুলো বদ্ধ চিন্তা বা সংস্কার তার মাথায় ভূতের মতো বাসা বেঁধে থাকে। যে যত বেশি বিচিত্রতর মানুষ আর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে, তত বেশি মন খোলা উদার হবে।

জম্মুতে এসে নেমে পড়ল সিরাজ। সেখান থেকে ডিলাক্স বাসে শ্রীনগরে যখন এসে পৌঁছল সে, সন্ধ্যা হল।

ছোট মামার দোকান খুঁজে বার করল।

বেশ বাহারী দোকান। দামী দামী গালিচা, শাল আর সিল্কের কাপড়-চোপড়ে আলমারি ঠাসা। কয়েকজন কর্মচারী। কাবুলী খরিদ্দার পাইকারি গস্ত করছে। এখানে বেশবাসে সবাই প্রায় মুসলমান। মোগলাই বা মধ্যযুগের চেহারা এখনও বর্তমান। আধুনিকদের কারো কারো পরনে স্যুট-প্যাণ্ট।

ছোট মামা সৈয়দ আলী হোসেন তাকে নিয়ে চলে এলেন বাসায়। বললেন, 'এই আমার বাড়ি। কেমন করিৎকর্মা ছেলে আমি বল। এই বাড়িটা

করেছি। একলাখ টাকা খরচ। কোথায় পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার একটা গ্রাম আর কোথায় আমি। টাক'কড়ি গয়নাগাঁটি চুরি করে নিয়ে যদি না এখানে পালিয়ে 'আসতাম তো বরাত ফেরাতে পারতাম? কলকাতার পথে বেকার হয়ে ঘুরতাম। এই তোর মামী।'

সিরাজ আদব জানাল। বলল, 'বাংলা বোঝেন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে ভাল্লুক, ওতো বাঙালী মেয়েই। তবে কাশ্মীরী বলেও চালানো যায়—ওর মা তো কাশ্মীরী মেয়ে—বাবা বাঙালী মুসলমান।'

'এসো, বসো সিরাজ। তুমি এখন ক্লান্ত, গোসল করে খেয়ে নিয়ে ঘুমোও। তোমার কথা শুনেছি কত। এখানে আসার জন্যে কতবার তোমাকে লিখতে বলেছি।'

ছোট মামীর বাংলায় একটু টান আছে—সেটা মন্দ লাগে না।

ছোট মামা দোকানে চলে গেলেন।

দোতলা একটি সাজানো ঘরে ঠাঁই পেল সিরাজ। জাফরানী রঙের গালিচা পাতা সারা ঘরটায়। স্পঞ্জের নরম বিছানা।

স্নান করার পর আহারাদি করতে বসে সিরাজ। এত তাড়াতাড়ি মামী কি করে পোলাও, কোর্মা, ক্ষীর, ফলপাকড় যোগাড় করলে সেই জানে।

ছোটমামার সব আছে নেই কেবল সন্তানাদি।

আরামে সারারাত ঘুমোল সিরাজ। রাত্রে আর তাকে কেউ ডাকে নি।

পাহাড়ী একটা উঁচু জায়গার ওপরে মামার বাড়িটা। দূর থেকে মনোরম দেখায়।

সকালে নাস্তার টেবিলে মামা আলী হোসেন বললেন, 'তুই এখানে থেকে যা সিরাজ। আমাদেরও কেউ নেই, ছবি এঁকে কি পাবি?'

মামী বলল, 'আহা। ছবি আঁকা কি সহজ? যে যা ভালবাসে, যা পারে, তাই করবে।'

'বাপধনের যা চেহারা। হীরো হয়ে সিনেমায় নামলে তো পারতিস্। এক প্রোডিউসার আমার খদ্দের, তাঁকে বলব, তুই প্লে করবি?'

'না মামু ওসব আমার আসে না।'

মামী বলল, 'ছেলে কি লাজুক! আমার দিকে পর্যন্ত সোজা চোখে তাকাতে পারছে না।'

আলী হোসেন বললেন. 'মামী কিন্তু নিষিদ্ধ নারীদের তালিকায় পড়ে না।'

মামার পিঠে চাপড় মারল মামী। লজ্জায় রাঙা হল।

আলী হোসেন খুব আমুদে লোক। বললেন, 'তোর মামী আমার প্রেমে পড়েছিল রে…'

'মোটে না, তুমিই বরং …'

'চিঠি আছে, প্রমাণ হোক।'

'কে গো স্কুলে যাবার পথে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকত? কে গায়ে পড়ে কথা বলত? কে বাসে উঠে আগে হাতে চিঠি গুঁজে দিত?'

'আরে বাবা, ছেলেরা তো একটু এগোবেই। তোমরা প্রশ্রয় দাও কেন? সতী-লক্ষ্মী মেয়ে তো বাবার হাতে চিঠিটা তুলে দিলে না কেন?'

'আরে বাপ! আমার বাবা ছিলেন বাঙালী উকিল। চিঠি দিলে তোমাকে জেলে ঢোকাত না।'

'তোমাকে পাওয়ার চাইতে জেলে গিয়ে তোমার ধ্যান করাই ভাল ছিল।'

'মুসলমান লোক যার আর্থিক অবস্থা ভাল, সে আরো তিনখানা বউ করতে পাবে, তার মুখে এই রকম এক নারীর ধ্যান অশোভন। এটা আমার দ্বারা বিত্ত বা পথ পেয়েছ বলে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

হাসতে লাগল সিরাজ। মামীও কম যায় না। বোঝে এবং বলতে পারেও ভাল।

'তাহলে প্রমাণ হল আমি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু স্ত্রৈণ এই অপবাদ ঠেকাব কেমন করে?'

মামার ভঙ্গি দেখে খুব আমোদ অনুভব করল। হাসতে হাসতে চায়ের কাপ উল্টে দিল।

মামীর গাল দুটো লাল হয়ে গেছে। কাশ্মীরী মেয়েদের অথবা কিশোরদের চিবুক এরকম লাল। রক্তভরা শরীর। কিন্তু মানুষজনের মধ্যে কারো ভুঁড়ি আছে তেমন দেখা যায় না। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও মামা আলী হোসেন এখনো বেশ তরুণ।

আলী হোসেন বললেন, 'এটা শীতপ্রধান জায়গা, বাবা সিরাজ, এই তোমার পোশাক। ধুতি পাঞ্জাবি-শাল জড়ালেই শীত চলে যাবে?'

সিরাজ বলল, 'এতেই এখন চলে যাবে—আমি তো প্যাণ্ট বড় একটা পরি না।'

'তোকে প্যাণ্ট-কোটে খুব ভাল দেখাবে, একেবারে রাজপুত্র হয়ে যাবি।'

মামী বলল, 'তাহলে বানিয়ে দাও।'

'দরকার নেই, আমি গরিব মানুষ!' বলল সিরাজ।

'দারিদ্র্যকে তুই ভালবাসিস বুঝি?'

'কতদিন মেসে কেটেছে, ডালে মাছি, চুল, ভাতে ধান, কাঁকর। ছেঁড়া মোজা জুতো। ঘামে-ভেজা দুর্গন্ধ গেঞ্জি-জামা। আব্বা মারা যাবার পর আমরা দুর্দিনে পড়লাম। যে ক-বিঘে জমি ছিল ভাগচাষীরা আর তেমন ধান দিত না। পরে জমি দখল করে নিল। অবশিষ্ট একটা বাগান ছিল। আম্মা ভাবনায় চিন্তায় একেবারে কাবু হয়ে গেল। নানান রোগে ভুগছিল। আমি ভাড়া মেটাতে না পেরে হস্টেল ছাড়লাম। এম-এ পড়ছি তখন' মেসে থাকি। টিউশনি করি। ছবি আঁকা শিখি কিন্তু রং তুলি কাগজ ইজেল ইত্যাদি কেনার পয়সা ছিল না। পাসটা যদি বা করলাম, সেকেণ্ড ক্লাস পেলাম। কোথাও কিছু পেলাম না। পার্টি না করলে এখন তো কোনো চাকরি বা মাস্টারী কিছুই পাওয়া যায় না। এরমধ্যে আবার আম্মাও মারা গেল। দারুণ দুঃখে কাল কেটেছে আমার—দুঃখকে কি আমি ভুলতে পারি।'

'এখন ছবি আঁকা থেকে কি রকম পাস?'

'এখন মোটামুটি পাই। একশো আশি টাকা সরকারী ফ্ল্যাট ভাড়া দিই। মাসে কোনো ফিক্স উপায় নেই। কোনো মাসে পনেরো শো আবার কোনো মাসে পাঁচশোও হয়।'

'তুই যখন দুরবস্থায় পড়লি আমাকে চিঠি লিখে কাশ্মীরে চলে এলে পারতিস।'

'ভাড়া কোথায়? আর দুরবস্থায় পড়লে কি অতসব মনে থাকে, না মানুষকে তার আত্মীয়-স্বজন গ্রাহ্য করে! অবস্থা ভাল হলে তাকে সবাই পেয়ার করে। এই যে ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ নেই অথচ আপনার এই মোজেক-করা চকচকে বাড়িতে আমি বেমানান, এটা দৃষ্টিকটু বলেই তো নতুন স্যুট তৈরি করার প্রসঙ্গ তুললেন। আমি হাজার টাকা নিয়ে বেরুই, যাওয়া-আসার ভাড়া মিটিয়ে স্যুট করার ভাবনা কি এতে করতে পারি?'

মামা বললেন, 'স্যুটের খরচ আমি দেবো। তোকে যেরকম সুন্দর দেখতে আমি ঐ চেহারা পেলে রাজকন্যা জুটিয়ে ফেলতাম না!'

মামী বলল, 'আহা! চুক্ চুক্! জীবনটা তাহলে বৃথাই গেল?'

মামা বললেন, 'তবু একবার প্রেমে পড়েছিলাম রে! সে বড় মজার ব্যাপার।'

মামী ফলের আচার খেতে দিল। ভারি চমৎকার মিষ্টি।

আলী হোসেন বললেন, 'তখনো তোর এই মামীর সঙ্গে পরিচয় হয় নি। কাশ্মীরে এসে একটা বুড়ীর বাড়িতে থাকি। বুড়ীর মেলা ভেড়া ছাগল। দুর্গন্ধে ভরা বাড়ি। দশটাকা ঘর ভাড়া দিই। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। রাত্রে এসে শুই। শীতে কষ্ট পাই। চেরোল কামড়ায়। বুড়ীর একটি ভেড়ীর সঙ্গে আমার দারুণ ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল। আমি এসে দোর খুললেই সে ঘরে ঢুকত। তার জন্যে খাবার আনতাম। তাকে বিছানায় তুলে নিতাম। তার গায়ের উষ্ণতায় আমার শীত তাড়াতাম। শেষে আমি তার সঙ্গে পশু হয়েই থাকতাম।'

সিরাজ এবং তার মামী দু'জনেই তাকাল আলী হোসেনের দিকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখে।

আলী হোসেন চুপ করে রইলেন। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

পরে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে বললেন, 'মানুষ তার জীবন-কাহিনীর সব কিছু কি বলতে পারে? প্রায় সব মানুষের জীবনে কিছু কিছু পশুত্ব আছে যা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। তা প্রকাশ পেলে ফাঁসী হতে পারে। যাকগে, আমার প্রেমে পড়ার কাহিনী শোন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে অবেলার দিকে ডাল লেকের ধারে আসি। সেখানে এক মেয়েকে দেখি—সঙ্গে আছে তার দাদী। মেয়েটিকে যে আমি দেখছিলাম সে তা টের পায়। প্রথমে লজ্জায় ভাল করে তাকাচ্ছিল না। ওরা বসে আছে ঘাসের ওপরে। আমি হাসতেই মেয়েটিও হাসল। কাছাকাছি যেতেই বুড়ী তার ছড়ি নেড়ে শুধোলে, 'এই ছোঁড়া, একটু চা যোগাড় করে দিতে পার?'

আমি চা-ওয়ালাকে ডেকে আনলাম।

বুড়ী আমাকে চা খেতে দিল। গল্প করতে লাগল—কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, আমি সব চেপে গিয়ে বললাম,—আমাদের দোকান আছে। মনিহারী দোকান। বুড়ী বলল, এ আমার নাতনী। এর বাপ দারোগা। বাইরে থাকে।...দারোগার মেয়ে, বাপরে! ভয় পাচ্ছিলাম। তবু সে হাসল। সন্ধ্যার পর কথা বলতে বলতে আমাকে বুড়ী তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। পুরোনো শ্যাওলা-ধরা বাড়ি। পাশেই ঝুরি-নামা বটগাছ আর মসজিদ। এদিকটা লোকালয় নেই তেমন কিন্তু পাহাড়ী টিলার নিচে পশ্চিম দিকে বসতি।

সেখানে আগুন জ্বলছে। নানান লোকের গান বাজনা করার হল্লা। বুড়ীর এক নাতি ছিল। তার সঙ্গে আলাপ জমালাম। হিন্দীতে কথা বলি। বন্ধুর অভাব ছিল বোধহয় ছেলেটার। বেশ জমে গেল। এরপর তার কাছে প্রায়ই যেতাম। তার বোন শরিফার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বুড়ী কিন্তু চোখ রাখত। একদিন আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছিলাম দেখে বুড়ী শাসন করল শরিফাকে। আর আমাকেও বাড়িতে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু পেটে অন্ন জুটুক আর নাই জুটুক তখন আমার ছিল শরিফাই ধ্যান-জ্ঞান। একদিন রাত্রে আমি লতা ধরে ঝুলে গিয়ে ওদের দোতলার বারান্দার আলসে ধরলাম। লতা ছেড়ে দিতেও পারি না—পুরোনো আলসে যদি ছেড়ে যায়। তবু লতা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু অনেক কষ্টে প্রাণপণ করেও উঠতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম। হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে। নিচে পড়লে একেবারে কুপোকাৎ। লতাটা ছাড়া উচিত হয় নি। শরিফাকে আস্তে আস্তে কতবার ডাকলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না। হাত পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। আমার প্রেমিকা তখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। আমি আল্লাকে ডাকতে লাগলাম। তারপর যখন একটা ইট নড়তে লাগল আমি সেলিমকে ডেকে উঠলাম। ওরা জেগে গেলো তিনজনেই। আলো আনল।

অবস্থা দেখে সবাই অবাক। বুড়ী বলল, 'ও বেটা পড়ে মরুক—' কিন্তু সেলিম শরিফা আমাকে টেনে তুলল। বুড়ী আমাকে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসল। আমি মাথা হেঁট করে বসে রইলাম। এখন প্রাণে তো বেঁচেছি। গালমন্দ করে যদি অথবা মারেও তবু সহ্য হবে। শেষ পর্যন্ত বুড়ী আমার চুল ধরে টেনে তুলে পিঠে গুঁতো গাত্তা মেরে বাইরে বার করে দিল।...তারপর আমি টলতে টলতে বাসায় ফিরে এলাম। ভেড়িকে জড়িয়ে ধরে ভাবতে লাগলাম। আমি বাড়ি থেকে পলাতক, প্রেমিকার দুয়ার থেকে তাড়িত, কিন্তু টাকা যা আছে কলসীর জলের মত একদিন তা ফুরোবে। মায়ের গহনাগুলো এখনো সব আছে। কি খেয়াল গেল উঠে আলো জেলে বাক্স খুলে গহনাগুলো সব বার করলাম। ভেড়ির গায়ে পায়ে পরালাম। ঝলমল করছে আমার রূপসী প্রেমিকা ভেড়টা।'

মামী লজ্জায় মুখ চেপে খুব হাসতে লাগল।

সিরাজ উঠে গেল। তার ঘর থেকে ইজেল এনে বসাল। মামা আর মামীর ছবি আঁকতে বসল। মামা জানলার ধারে বসে গল্প বলছেন। মামী দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত শূন্য চেয়ারে, অন্য হাত আলমারির গায়ে।

আলী হোসেন বলতে লাগলেন, 'তার পরদিন আমি গহনা বেচে একটা ছোট মতো দোকান ভাড়া নিয়ে কিছু ফার্নিচার এনে গামছা, তোয়ালে, রুমাল, ঝাডন, টুপি, লুঙ্গি, পাজামা, বোরখা এইসব বিক্রির দোকান খুললাম। মাস ছয়েক গেল। তখনো বুড়ীর বাসাটা ছাডি নি। বুডী একবার খুব অসুখে পড়ল। তার ভাইরা এলো। আমি তার চিকিৎসার খরচ যোগাতে লাগলাম। বুড়ী সেরে উঠল। ভেড়াগুলোকে বেচে দিল। আমার প্রিয় ভেড়িটাকেও বেচে দিয়েছে জেনে আমি বুডীকে খুব নিন্দে মন্দ করলাম। বললাম যে ঐ ভেড়িটার জন্যে যদি তুমি হাজার টাকাও নিতে তাতে আমার কিছু আসত যেত না।'

বুডী বলল, 'সেই জন্যই তো বেচে দিলাম। আমার বাসায় ফেরেস্তা আসত না বলেই তো আমার বিমার হল। তুই বেটা শয়তান। যা, আমার বাড়ি থেকে চলে যা।'

'আমি বুড়ীর আজনার বাডি ছাডলাম। অন্য বাড়িতে উঠে গেলাম। মাস তিনেক পরে একদিন হঠাৎ কি খেয়াল গেল, দোকানের দেনার তাগাদায় বেরিয়ে বুড়ীর কাছে এলাম। দেখি বুডী আবার শয্যাশায়ী। আমাকে হাত নেড়ে ডাকল। তাকে দেখার আর কেউ নেই। সবাই তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। বুড়ীর খুব ক্ষীণ কণ্ঠস্বর : বলল, ভাইরা এসে বলে তোমার টাকাকড়ি কোথা, অতো ভেডা বেচলে—আমি বলি নেই, চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই ভাইরা হতাশ হয়ে চলে গেল। এরা একদিন আমাকে শরিক্ দেয় নি। শরিক চাইতে যেতে আমার সোয়ামীকে অপমান করে ঘাড ধরে বার করে দিয়েছিল। আমি টাকা দোব ?—আমার কাফন এনে দিস। আমাকে কবর দিস। আমার জন্যে খতম পড়াস। খানা খাওয়াস।'

বললাম, 'অত টাকা আমি পাব কোথা নানী ?'

বুডী হাত ধরল। উঠে বসতে গেল। দেখলাম শুয়ে পড়ে থেকে তার পিঠে ঘা হয়ে গেছে। বুড়ীর হলদেটে ঘোলা চোখ মুখের বর্ণ দেখে বুঝেছিলাম যে কোনোদিন সে মারা যাবে।'

'বুড়ী ইশারা করে দেখাল, টাকা আছে—তুই সব নিবি।'

'আমি তাড়াতাড়ি বাজারে গেলাম। কাফনের কাপড় আর আঙুর সন্দেশ আনলাম। বুড়ী কাফন দেখে তাতে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল—ও হো হো হো—আমি মারা যাব—আমার দিন ফুরোল—কিন্তু আমি কি পেয়েছি—আল্লা আমাকে কি দিয়েছে—শুনেছি আজনা বুড়ী বহুকাল বিধবা ছিল। তার ছেলে-

পুলেরা মারা গিয়েছিল। মসজিদের ইমাম ছিল নাকি তার স্বামী। কোনো একদিন জুম্মার নামাজ পড়াবার সময় সেজদায় (প্রণিপাত) গিয়ে আর উঠল না। আসলে তার হার্টের ব্যামো ছিল—'

'বুড়ী টুকটুক করে সব খেল। ফোগলা গালের মধ্যে তার জিভটা নড়তে লাগল। বুড়ী শেষ পর্যন্ত জানাল ঐ যে পানির ঘড়া আর থালঘটি বসানো আছে ওর নিচে একটা ছোট চৌবাচ্চা আছে—তার মধ্যে কাঠের বাক্সে টাকা আছে। কত আছে বুড়ী সঠিক জানে না।'

আলী হোসেন বলতে লাগলেন, 'বুড়ীকে শুইয়ে দিয়ে তখনি আমি টাকাগুলো তুলে এনে বার করে গুণতে লাগলাম। পাঁচ হাজার সাত শ পঁচাশী টাকা।'

'টাকা নিয়ে চলে গেলাম। ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। একটা বেওয়াকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বুড়ীকে দেখতে বলে গেলাম। সেদিন রাত্রে খবর পেলাম বুড়ী আজনা মারা গেছে।'…আলী হোসেন চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন। হঠাৎ তার গলার স্বর ভারী হয়ে গেল। বলতে লাগলেন, আমার মাকে তো আর আমি জীবনে দেখতে পাব না, তাই তার কর্তব্য যেন বুড়াতেই বর্তাতে চাইলাম। আমি শেষকৃত্য, খানাপিনা সবেরই ব্যবস্থা করলাম। মসজিদগড়ার কাজে বুড়ীর বাকি টাকাগুলো সবই দান করে দিলাম। এতে এক রকম শান্তি অনুভব করলাম। আমি মন্দ ছিলাম কিন্তু ভাল হতে তো পারি। কেন না আল্লা আমাকে বাঁচিয়েছেন প্রেমিকা শরিফাদের বাড়ির ভগ্নদশা দোতলার আলসে থেকে। আমার ভেতরে একটা অন্য মানুষ জন্ম নেয়। তাছাড়া আমার দোকানেও ভাল বিক্রি হচ্ছিল। হাজার তিনেক টাকা বাকি পড়লেও তা মার যাবার সম্ভাবনা ছিল না। যা হোক, আমি বছর পাঁচেক পরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জমিয়ে গালিচা বেচার কারবার জুড়লাম। সেই সময় তোমার এই মামীকে চোখে পড়ল। ওর বাঙালী উকিল বাবা আমার খদ্দের ছিলেন। তাগাদায় যেতাম। তারপর ইয়ে মানে প্রেম-প্রণয় হয়ে যায়। দেখি তোর ছবিটা?'

আলী হোসেন ছবি দেখে তাজ্জব! মামীও। এ্যাকজাক্ট আমাদের এঁকেছে, ভাল করে আমার একটা রঙিন ছবি এঁকে দিও, একশো টাকা দেবো' বলল মামী।

'একশো টাকা! পাঁচশো টাকা বলুন।' বলল সিরাজ।

'তোমার ছবির এত দাম?'

'তাই তো দেয়।' বলল সিরাজ। 'ঠিক আছে, আমিও দেবো—তবে নঃপূত হওয়া চাই।'

মামা শুধোলেন, 'কদিন থাকবি তুই ?'

'সপ্তা খানেক।'

'চলি আমি, দোকানে যাই, সন্ধ্যায় একবার দোকানে আসিস, স্যুটটার মাপ দিবি'—বলে হোসেন বেরিয়ে গেলেন।

মামী তার রাঁধাবাড়ার কাজে চাকরানীটাকে নিয়ে ব্যস্ত হল।

ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে নামল সিরাজ।

॥ ৩ ॥

ডাল হ্রদ দেখল সে। স্থির জল। আয়নার মতো আকাশ মুখ দেখছে। নানান রঙের পোশাক পরা মানুষজন, ক্যালেণ্ডারের বেশ একখানা ছবি হয়। ইজেল ঠিক করে ছবি আঁকতে বসল সে রঙিন পেনসিল দিয়ে। লোকগুলোকে ফুটিয়ে তুলল। সবুজ পাড়ের ওপরে সবুজ গাছ। খানিকটা লেকের জল। পিছনে পর্বত।

কেউ কেউ তার ছবি আঁকা দেখছিল। খানিকটা দেখল আবার চলে গেল।

একজন সাহেবী পোশাক পরা তরুণ নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকা দেখছিল। বলল, 'বেশ আঁকেন তো আপনি!'

সিরাজ বলল, 'সিগারেট আছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' দামী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট দিতে নিজের লাইটার বার করল সিরাজ ঝোলা থেকে। তার রিজেণ্ট কিং সিগারেটের শূন্য প্যাকেটটা তরুণটির পায়ের কাছে ফেলে দিল। অর্থাৎ দেখাল আমিও যা তা সিগারেট খাই না এবং দুজনেরই একই ব্র্যাণ্ড।

তরুণটি হাসল।

সিরাজ আবার পেনসিল চালাতে লাগল। বলল, 'ছবি আঁকা কি পাপ ?'

'আমি মানি না।'

'সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের মুক্তবুদ্ধি হয়ে অনেক

কিছু করা দরকার কেন না ধর্মের নামে তাদের সামনে পিছনে অনেক কাঁটা ছড়ানো হয়েছে। গান গাওয়া ছবি আঁকা নাকি জায়েজ। আসলে এসব করার সাধ্যও নেই ফতোয়াধারীদের অবশ্য গানের উন্মাদনা বা অশ্লীলতা নিন্দনীয় এবং ছবির সম্বন্ধেও শালীনতা থাকা উচিত।'

'ঠিক। আপনি কি বাঙালী?'

'আপনার আন্দাজ অভ্রান্ত। আমি কাশ্মীরী। আমার নাম কাশেম আলী। দিল্লী ইউনিভারসিটির ছাত্র।'

সিরাজ ফিরে তাকাল। বলল, 'পোশাক-আশাক চেহারা-বর্ণ দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের আর্থিক কৌলিন্য আছে।'

হ্যাঁ, বাবার ব্যবসা, কারখানা, বাগ-বাগিচা, বাড়ি-গাড়ি আছে। আপনি যাবেন আমাদের বাড়ি? গেলে খুব খুশী হব। আপনার মতো আর্টিস্টের বন্ধুত্ব পেলে কত কৃতার্থ হব।'

হাসল সিরাজ, বলল, যাওয়া যেতে পারে। কাশেম ঘাসের ওপর বসে পড়ল দেখে সিরাজ তার ঝোলা থেকে আর কয়েকটি ছবি বার করে দেখতে দিল। 'আরে বাপ! আশ্চর্য সুন্দর আপনার ছবি তো! নিসর্গ চিত্রও যেমন মনোরম, তেমনি বাস্তব ছবিও খুব ঋজু এবং নিখুঁত। কলকাতার মানুষরা নিশ্চয়ই আপনার যোগ্য সমাদর করছেন?'

'তা আমি পরিচিত হয়েছি। বড় বড় প্রায় সমস্ত পাবলিশারস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমাকে দিয়ে এখন ছবি আঁকাচ্ছেন।'

'এবং দুর্নামও আছে যে আপনি যথা সময়ে ছবি দেন না।'

'আমি বড় একটা কথার খেলাপ করি না।'

'আপনি কি প্লেন লাইফ ভালবাসেন?'

'শিল্পীর নিজের জীবনের বৈচিত্রের চাইতে বিচিত্রতর জীবনকে ভালবাসা বা তাকে রূপায়িত করার দিকটাই বড়।'

'আপনি ভ্যানগগ, মাইকেল এঞ্জেলো, দ্য-ভিঞ্চি ইত্যাদি জগৎবরেণ্য শিল্পীদের জীবনের বৈচিত্র বা খেয়াল খুশীকে কি ভালবাসার চোখে দেখেন না?'

'যা আত্মক্ষয়ী, নাশকতাধর্মী, সমাজবিরোধী তা শিল্পী জীবনেরও ক্ষতি-কারক। সাময়িক অসুবিধারও সৃষ্টি করে কিন্তু এসবে যেন মহৎ শিল্পীর অধিকার আছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা কাজী নজরুল ইসলাম কোনো পতিতালয়ে রাত্রি-যাপন করলে সেটাকে মানুষ তেমন বড় করে দেখে না কেন না শিল্পী যা

হারান তার চাইতে অনেক কিছু বেশি আহরণ করে আনেন জাতির জন্য। তাই শিল্পীর সর্বত্র যাবার অধিকার আছে। তাঁর জাগ্রত বিবেক হাঁসের পালকের মতো, তাতে জল লাগে না। ডানা ঝেড়ে ফেললেই উড়ে যায়।'

সমর্থন করল কাশেম আলী।

'ভাইয়া!—তীক্ষ্ণ সুরেলা নারী কণ্ঠ আহ্বান করল কিছু দূর থেকে। একটি গাছের আড়ালে কালো বোরখা পরা তরুণী। কাশেম হাত নেড়ে ডাকল তাকে।

তরুণীটি এলো। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কাশ্মীরী সব মেয়েই প্রায় সুন্দরী। বোরখা থাকলেও আধুনিকা। হাতে ঘড়ি, চোখে সান গগলস্, মাথাটা খোলা।

'এটি আমার বোন রিজিয়া। বি-এ পড়ছে। ও-ও ছবি আঁকে।

হেসে আদাব করল রিজিয়া।

'আমার নাম সৈয়দ সিরাজ। আপনি ইচ্ছা মতো ঘরে আঁকেন না আর্ট স্কুলে আঁকা শেখেন?'

ইংরেজিতে কথাবার্তা চলছিল। এবার রিজিয়া হিন্দীতে বলল, 'জী হ্যাঁ, আমি আর্ট স্কুলের ছাত্রী।'

ছবিগুলো দেখতে লাগল রিজিয়া।

নিজের ভাষায় কি সব বলাবলি করতে লাগল ওরা ভাইবোনে। ইংরেজি শব্দগুলোই যা বুঝতে পারল সিরাজ। ভাল বলছে নিশ্চয়ই। আর নিন্দে করলেই বা কি!

সিরাজ কাগজপত্র সব গুটিয়ে নিল।

রিজিয়ার নীলাভ চোখের তারা একটু লাজুক, একটু আধুনিকা। ধর্ম-প্রভাবিত জায়গায় মানুষ। অন্তরের সমৃদ্ধি ওর কতটুকুই বা হয়েছে?

রিজিয়া বলল, 'আপনি যদি আমাকে একটু আঁকা-জোকা সম্বন্ধে দেখান, যদি আমাদের বাড়ি আসেন, খুব ভাল হয়।'

একটা কার্ড দিল কাশেম আলী। বলল, 'যে কোনোদিন আসবেন কিন্তু। আমি দিল্লী চলে যাব দু'একদিন পরে। রিজিয়া আঁকে মন্দ না, তবে হাতটা এখনো মোটা। অনুপ্রেরণা পেলেই হাত বা মাথা খুলে যায়।'.

'নিশ্চয়ই। নিজের অধ্যবসায় থাকা চাই। শিল্পী হতে গেলে লেগে থাকতে হয়। তার জন্য দুঃখ বরণ করতে হয়। নইলে খেয়াল খুশী মতো হঠাৎ এটা সেটা করার লোক সংসারে যথেষ্ট আছে।'

রিজিয়া সমর্থন করে মিষ্টি একটু হাসল।

সন্ধ্যার পর চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূব এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল কাশেম আলী।

হালকা বৃষ্টি নেমেছিল পথেই!

বৃষ্টির গুঁড়ো রিজিয়ার চুলে আর বোরখায়। বোরখা তো নয়, যেন কার্টি'-কর। আধুনিক ডিজাইনের বর্ষাতি।

রিজিয়ার হাত দুটো কি নিটোল মসৃণ। দুধে আলতা রঙ।

কাশেম আলী বলল, 'কি খাবেন?'

'যা হোক একটা কিছু হলেই হল।'

'কফি আর চিকেন স্যাণ্ডুইচ তিনটে'—বেয়ারাকে বলল রিজিয়া।

কয়েকজন কাবুলী বসে আছে মাথায় পককড নিয়ে গোল হয়ে।

সিরাজ বলল, 'আচ্ছা এই কাবুলীরা মাথার পককড খোলে কখন?'

রিজিয়া বলল, খুলবে কেন, ওরা ত মাথায় পককড় মার পেট থেকে নিয়ে এসেছে।'

সিরাজ খুব হাসল। কাশেমও।

কিন্তু সিরাজ নির্লজ্জের মতো বলে বসল, "কাবুলী মেয়েদের প্রতি আমার খুব সহানুভূতি হচ্ছে।

রিজিয়া মাথা গুঁজে হাসতে লাগল লজ্জায়। কাশেম হালকাভাবে হেসে উড়িয়ে দিল। খাবার এসে যেতে হাত ধুতে গেল সিরাজ। ওরা কিন্তু হাত ধুলো না। রুমালে হাত মুছে নিয়েই হাত দিয়ে খেতে লাগল।

'কাশেম শুধল, আপনার কলকাতার লাইফ কেমন লাগে?'

'মোটামুটি। গরিবদের সেখানে খুব কষ্ট। রাজ্যের লোকজন। অপরিকল্পিত শহর। খারাপ রাস্তাঘাট। আবর্জনায় ভরা। বস্তি, খাটাল, মশা, মশা, মাছি, ছারপোকা,—মিটিং—মিছিল-দাঙ্গা। আবার সংস্কৃতি, সিনেমা নাটক, নভেল, ছবি, নাচ, এসবও আছে। সেখানের নামী দামী হোটেলের ভেতরে ডিম্বাকৃতি কালো টেবিলের ওপরে বিবসনা নর্তকী লাস্যময় ভঙ্গী দেখায় বিত্তশালী মানুষদের আর বাইরে অনেক ভিখারী পড়ে থাকে অনাহারে প্রায় নগ্নবেশে। তবু ভাল-মন্দয় এই কলকাতায় আমরা মানুষ হয়েছি—দারিদ্র্যে-দুখে বাবা-মা আমাদের যেমন করে মানুষ করেছেন, তাঁদের যেমন ধিক্কারে শ্রদ্ধায় ভালবাসি তেমনি কলকাতাকে ভালবাসি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

রিজিয়া শুধোলে, 'কবে আমাদের বাড়ি আসছেন বলুন?'

'আমার ইচ্ছে গোটা কাশ্মীরটা ঘুরে দেখি কিন্তু সাতদিনের বেশি তো সময় পাব না। হাতে অনেক কাজ।'

'গোটা কাশ্মীর তো দেখতে পাবেন না'—বলল কাশেম আলী—'অর্ধেকটা তো পাকিস্তানের হাতে।'

হাসল সিরাজ। বলল, 'আচ্ছা এখানের অনেক লোকের মুখে বসন্তর দাগ, কি রকম অমার্জিত হাবভাব, লেখাপড়ার হার খুব কম—তাই না?'

'ওরা সব আগের জমানার লোক। যাদের বয়স চল্লিশ, তারা অনেকেই লেখাপড়া জানে না। ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায়, বাগান-বাগিচায় কাজ করে, ভেড়া পোষে, লোম বেচে, গালিচা শাল তৈরি করে। ফল বিক্রি করে। একালে লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে। ফ্রি এডুকেশন। চাল আটাও সস্তা। তবে মিলিটারী বা পুলিসের খুব চাপ আছে। থাকাও স্বাভাবিক—সীমান্ত বিরোধের জায়গা।'

'আপনি কাল আসুন না!' বলল রিজিয়া।

'আচ্ছা চেষ্টা করব।' সিরাজ কথা দিল।

ওদিকের টেবিল থেকে একজন তরুণ কাশেম আলীকে ডাকল। কাশেম আলী উঠে গেল।

রিজিয়া বলল, 'আচ্ছা, আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, করি। অদ্ভুতভাবে বলতে পারে কেউ কেউ। এটা এক রকম গাণিতিক বিজ্ঞান। যেমন ধরুন, কিরো অনেকগুলো খুনীর হাতের রেখা মিলিয়ে দেখে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে হৃৎরেখা আর বুদ্ধি রেখা বা মাতৃরেখা একটা হলে এবং তা এপার ওপার পড়ে গেলে সে নিশ্চয়ই খুনী হবে। এটা আমি মিলিয়ে দেখেছি খুবই সত্য।'

'কোন্ রেখাটা, দেখান না, প্লিজ!' বলল রিজিয়া তার হাত টেবিলের আড়াল দিয়ে ধরে।

সিরাজ ওর নরম রক্তাভ হাতটা ধরল। নিজের উরুর উপরে রাখল। রেখা দুটো দেখাল।

'আমার হাত কেমন, বলুন না।' বলে হাতের একটু চাপ দিল রিজিয়া।

'মোটামুটি আপনার হাত ভাল। আর একদিন বলব।'

'বলবেন কিন্তু।' নীলাভ চোখে তাকিয়ে হাসল রিজিয়া।

'আজ আমি উঠি—' বলল সিরাজ।

'ভাইয়া আসুক। এত তাড়া কিসের?'

সিরাজ কিছু বলল না। ওর মুখটা দেখল। ভুরু কি চমৎকার। ঠোঁট দুটোর জোড়েনও খুব নিখুঁত। তবে কাশেম আলীর নাক আরো চমৎকার।

রিজিয়া বলল, 'আচ্ছা আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'বেশ তো বলুন না।'

'আপনি কি বিবাহিত?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাছাড়া আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি শিল্পের সমাদর খুব একটা কম না হলেও শিল্পী সাহিত্যিকদের কোনো মা-বাবা বড় একটা মেয়ে দিতে চান না। কারণ তাঁদের দুরবস্থা।'

'এখনো কি সেরকম অবস্থা আছে? এখন তো অনেক পত্র-পত্রিকা পাবলিকেশন, নাটক সিনেমা থেকে শিল্পীরা টাকা-পয়সা পান।'

'চাকুরী না থাকলে মাস কাবারী তাঁদের তো কোনো নির্ধারিত উপায় থাকে না। শিল্পীদের দেখার ব্যবস্থা যদি রাজনীতির লোকদের হাতে থাকে তবে চরম দুঃখের হয় তা। আবার শিল্পীরা নিজেরাও খুব ঈর্ষান্বিত। একজন শিল্পী তার শিল্পকে বাদ দিয়ে মানুষ হিসাবে কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের চাইতেও ঢের খারাপ—একথা রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন।'

'এটা হবার কারণ কি?'

'কারণ দুটো আছে—এক, শিল্পী-সাহিত্যিকের ভেতরে সব সময় বিবেক জাগ্রত থাকে, তিনি যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, মঙ্গলধর্মী তার কথা বলেন কিন্তু সেকথা যখন কাজে লাগাতে না পারেন তখন অন্য দিকটা জাগ্রত হয়, সেদিকটাও তাঁর খুব বলিষ্ঠ। সাধারণ মানুষকেও ছাপিয়ে যায়। আর দ্বিতীয় দিক, সাধারণ মানুষের চাইতে একজন শিল্পী-সাহিত্যিকের সৃষ্টি-ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি সর্বদাই নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা বোধ করেন কিন্তু সৃষ্টির প্রতি মোহগ্রস্ত নন। আর শিল্পীর ভেতরে সৃষ্টি ক্ষমতা বহুকাল থাকে—সাধারণ মানুষের মধ্যে তা অল্পকালেই নিভে যায়।'

'আপনাদের বাঙালী লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো নারীদের খুব মর্যাদা দিয়ে এঁকেছেন কিন্তু নারীরা তাঁকে কি যোগ্য সমাদর করতে পেরেছেন?'

'বোধ হয় না—তা হলে তিনি নিষিদ্ধ পল্লীর কোনো রমণীর গৃহে সমস্ত

কাটাতেন না। ধর্মের সংস্কার রমণীদের এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে তাদেরও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। মুসলিম রমণীদের কথা শরৎবাবু লেখেন নি, অর্ধেক মেয়েদের কথা লিখেছেন বলে তাঁর এক ভক্ত মুসলিম মহিলা অনুযোগ করেছিলেন ঢাকায়। যখন শরৎচন্দ্রকে—ডি-লিট উপাধি দেওয়া হয়। তিনি কথা দিয়েছিলেন মুসলিম রমণীদের কথা জানবেন এবং লিখবেন। কিন্তু তার আর সময় হয় নি, তিনি অল্পদিন পরেই মারা যান।'

'পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?'

'অনেক লোক যখন মানছে তার বিরুদ্ধে কটু কথা বলাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে পর্দা তুলে দিয়ে বেপর্দা হওয়াও খুব যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। নারীর রূপ সৌন্দর্য আছে, পুরুষ প্রলুব্ধ হতে পারে বলে তাকে বোরখায় আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া হল কিন্তু প্রলুব্ধ ইতর পুরুষরা যখন লেখাপড়া শিখে মার্জিত হল, যখন আর তাদের দ্বারা ধর্ষিত বা লুন্ঠিত হবার সম্ভাবনা নেই এবং অর্থনৈতিক সংকটে নারীকেও সহকারীর ভূমিকা নিতে হচ্ছে সংসারে, তখন এই পর্দায় ঢেকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?'

'তাই আমরা বোরখাও পরছি, আবার নেকাবও তুলে দিয়েছি। পুরুষদের বিশ্বাসও করি আবার অবিশ্বাসও।'

হাসল খুব দুজনে।

কাশেম আলী এলো।

উঠে পড়ল ওরা।

ভাইবোনে গাড়িতে উঠতে সিরাজ হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে মামার বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল।

॥ ৪ ॥

ভূস্বর্গ কাশ্মীর। সত্যিই অপূর্ব। পার্বত্য অঞ্চলে গাছপালার সারি আর পর্বত চূড়ার দৃশ্য অতি মনোরম। ছোট শহর শ্রীনগর। টাঙ্গা আর টাট্টু ঘোড়াই প্রধান বাহন। উলার হ্রদ এলাকা থেকে ঘুরে এলো সিরাজ।

পার্বত্য উপত্যকা থেকে নেমে চারণভূমি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল অদ্ভুত সুন্দরী একটি কিশোরীকে। তন্বী চেহারা, নীলাভ টানা চোখ।

চিলের ডানার মতো সরু কালো তুলি টানা ভুরু। গায়ে লম্বাটে পীরহানের মতো কালো রঙের ময়লা পশমী জামা।

বোতাম ছেঁড়া। মাথায় উলুল-ঝুলুল চুল—বাতাসে উড়ছে। মুখে পড়ছে।

এক হাতে সরিয়ে দিয়ে সিরাজকে দেখতে লাগল। হাতে ওর পাচনবাড়ি। সামনে গোটা পঞ্চাশ ভেড়াভেড়ি। গোটা কয়েক বড় বড় ছাগলও আছে। তারা চরে চরে ঘাস খাচ্ছে. ডাকছে আর গুঁতোগুঁতি করছে। ছড়ি হাঁকিয়ে তাড়া করছে বালিকাটি। ওর কাছাকাছি এলো সিরাজ। আরো মেষপাল নিয়ে দূরে দূরে বুড়ো বুড়ী বা ছেলে ছোকরারা চারণক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

মেয়েটাকে দেখতে থাকলে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বোধ হয় বিরক্ত হয়।

ঘাসের উপর বসে পড়ল সিরাজ। কাগজ-পত্র বার করে ওর ছবি আঁকতে গেলে বালিকাটি সরে যেতে চাইলো।

সিরাজ ওর পিছু নিল। ডাকল 'শুনছ, ও মেয়ে দাঁড়াও না—তোমার ছবি আঁকছি।'

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বাঁকা চোখের দৃষ্টি। রাঙা দুটো ঠোঁট।

বলল. 'আমাকে তসবির (ছবি) তুলবে না' কেউ দেখলে বকবে।'

না না আমি ফটো তুলছি না, তোমাকে চেনা যাবে না, 'তোমার মতো একটা ছবি আঁকব।'

মেয়েটি অরাজি। বসে পড়ল। হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোলো।

সিরাজ কিছুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরে চলতে থাকলেই মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল।

সিরাজ দেখে একটু হাসল।

মেয়েটিও হেসে মুখ নামাল।

সিরাজ যতক্ষণ না তার ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠ পার হয়ে আড়াল হল মেয়েটি তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে সিরাজ তাকিয়ে দেখেছে দড়া পাকানো পিঙ্গল জটাজাল উড়ছে মাথায়। হাতে পাচনবাড়ি, ছায়াঘন কালো অবয়ব।

মেয়েটির অসামান্য সুন্দর চোখ দুটো আর রাঙা ঠোঁট যেন মনের মধ্যে ভাসতে লাগল।

পর্বতের গায়ে কুঠিবাড়ি। উঠতে নামতে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। ডাল লেকের তীরে শংকরাচার্য পর্বতে উঠতে গিয়েছিল, তার হাঁপ ধরে গিয়েছিল।

মামার বাসায় ফিরে ক্লান্তিতে সে শুয়ে পড়ল।

চাকরানী বুড়ী বাদশার মা বলল, 'ভাইজান, চা খাবেন ?'

'হ্যা ভীষণ খিদে লেগেছে, মামী কোথায় ?'

'ঘরেই আছেন, শালের নক্‌শা সেলাই করছেন।'

হাত মুখ ধুয়ে এসে চা নাস্তা খাবার পর কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল সিরাজ। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে স্বপ্ন দেখতে লাগল মেষ চরানো সেই গরিব মেয়েটির সঙ্গে সে মেষপালের মধ্যে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। যখন সে দৌড়য় মেষগুলো সব পথ করে দেয় আর তাদের মধ্যে লুকোলে মেঘের মত যেন ঢাকা দিয়ে দেয়।

এক সময় সে বালিকাটিকে ধরে ফেলল।

তারপর সে শর্তানুসারে তার ছবি আঁকতে দিল। ওকে দেখতে দেখতে তুলি টানছিল সিরাজ—হঠাৎ ঘুম ভাঙল কে যেন।...

মামী তার মাথা ধরে নাড়া দিচ্ছে।

চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সিরাজ।

মামী বলল, 'ঘুমে ঘুমে তুমি গোঁ গোঁ করছিলে, হাসছিলে, কি ব্যাপার স্বপ্ন দেখছিলে নাকি ?'

'মামী, আমাকে জাগানো ঠিক হয় নি। চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'কি স্বপ্ন ?' মামী বসল বিছানায়।

সিরাজ পা গুটিয়ে নিয়ে খাটের ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল।

'মাঠে একটা অসামান্য সুন্দরী গরিব কিশোরী মেয়ে মেষ চরাচ্ছিল, আমি তার ছবি আঁকতে চাইতে সে অরাজি হয়—চলে আসার সময় সে কিন্তু হাসল আর তাকিয়ে রইল। আচ্ছা মামী, এখানের লোকেরা মেয়েদের ফটো তুলতে বা ছবি আঁকতে দেয় না কেন ?

মামী তার নিজের হাতটা দেখতে দেখতে বলল, 'ছবি আঁকা বা ফটো তোলা হারাম বলে প্রচার আছে মৌলবীদের মধ্যে।'

'কিন্তু হজে গেলে তো পাসপোর্টের জন্য ছবি তুলতেই হয়, তখন ?'

'কি জানি, শুধু তো জানি পয়গম্বরদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ। কারণ তাতে বোত্‌-পরস্তি বা মূর্তি পূজা আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ছবি আঁকার মধ্যে বেশরিয়তি কাজ কি বুঝি না—সে ছবি যখন পূজা করা হবে না।'

'এটা বোধ হয় অপৌত্তলিকতার গোঁড়ামি। যদি কোনো অবস্থায় পৌত্তলিকতা এসে পড়ে।'

'কিন্তু আমি বলি পয়গম্বর বাদে বিখ্যাত গুণী জ্ঞানী মানুষদের মূর্তি বা ছবি করা উচিত কেননা এতে ভাস্কর্য এবং কলাশিল্প জাতির মধ্যে অবলুপ্ত হয় না। তাছাড়া ধরুন, দু'হাজার বছর পরে এদেশে কারা রাজত্ব করত কি করে জানা যাবে যদি হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশটা ধ্বংস হয়ে যায়? আজ হরপ্পা বা মহেঞ্জোদাড়ো খনন করে যেসব মূর্তি বা শিলালেখ পাওয়া গেছে তা থেকেই তো তখনকার সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। অথচ চারুশিল্প, কারুশিল্প, ললিতকলা, ভাস্কর্যশিল্প, সাহিত্য, কাব্য এসব একদিন ইসলামে অনাদৃত ছিল না।'

'সত্যি কত মুসলীম মনীষী মধ্যযুগে জন্মেছেন কিন্তু একালে আর তেমন বেশি প্রতিভার জন্ম হচ্ছে না। অথচ শিক্ষার হার তো বাড়ছে!'

প্রতিভাকে লালন করতে হয়, তাকে যদি সমূলেই ধ্বংস করা হয় তো জন্মাবে কি করে?'

কিছুক্ষণ আর কোনো কথাবার্তা হল না।

মামী জানালা দিয়ে পর্বতের গায়ে আলো জ্বলা কুঠিটার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলল, 'কাল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যাবে নাকি সিরাজ?'

'কোথায়?'

'আগে বলছি না।' মামী হেসে হাঁটুর ওপরে গাল রেখে রহস্যময় চোখে তাকিয়ে রইল।

মামী মাহমুদার বয়স তিরিশ হলেও সন্তানাদি না হওয়ার জন্য যেন এখনো অষ্টাদশীর মতো হয়ে আছে। তবে বাঙালী অষ্টাদশীর মতো নয়—যাদের বিয়ের ভাবনায় লাবণ্য চলে যেতে থাকে।

মামী কোথায় নিয়ে যেতে চায়, মামা জানবেন কিনা, জানলেই বা কি ভাববেন এসব কথা ভাবল সিরাজ।

'তোমার মামা যে দোকানে যেতে বলল, কই গেলে না?'

সিরাজ কিছু বলল না। হঠাৎ মাঠের সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল।

'ওই তোমার মামা এসে গেছে, এসো খেয়ে নেবে।'

কিছুক্ষণ পরে খাবার টেবিলে আলী হোসেন বললেন, 'কই, দোকানে গেলি না যে?'

'আপনি আমাকে সাহেব বানাবেনই দেখছি।'

'শীতে তুই কষ্ট পাচ্ছিস না? ঠাণ্ডা লেগে গেলে বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে ভুগবি আবার।'

'দেখি, কাল যাব।'

'হ্যাঁ যাস।'

মাহমুদা বলল, 'কাল ওকে নিয়ে আমি এক জায়গায় যাব ভাবছি।'

'ওঃ। তাই নাকি। রাত্রে ফিরবে না?'

'আমোদ! খুব মজা হবে না, তাহলে?'

'আমার!'

'তবে কি আমার? আমি তো ওকে এক উকিলের বাড়িতে নিয়ে যাব।'

সিরাজ অবাক হল, বলল, 'কেন 'উকিলের বাড়িতে কেন?'

আলী হোসেন এবার বুঝলেন। মাহমুদা ওর বাবার কাছে যেতে চাইছে, সিরাজের সঙ্গে আলাপ করাবে? বলল, 'তুমি তো সাংঘাতিক একটা কেশে পড়েছ। সমন এসেছে জান না?'

'সমন!' বলল সিরাজ।

'তুমি নাকি কলকাতার কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তির কন্যাকে অপহরণ করে এনে কাশ্মীরের এক হোটেলে লুকিয়ে রেখেছ।'

মামার মুখের রেখাচিত্রগুলো পড়তে লাগল সিরাজ।

মামী হাসতেই বুঝল মামা তামাশা করছেন।

আলী হোসেন বললেন, 'যে অপরাধের কথা বললাম তা করার বয়স হয়েছে তোমার—আমি বলি কি বাছাধন, এবার সংসার-ধর্মের দিকে মন দাও...'

মাহমুদা বলল, 'আমার বাবার কাছে নিয়ে যাব তোমাকে—তিনি তো একজন উকিল।'

'এবং বাঙালী, বুড়ো মানুষ, একা থাকেন—বাঙালীকে পেয়ে জমবে ভাল।' বললেন মামা।

মামী বলল, 'আর তিনি রাতে থাকার জন্য পীড়াপীড়িও করতে পারেন।'

'দাদুকে দেখতে যাব আমি।' খুশী হয়ে বলল সিরাজ।

'সেকি হাত গুটিয়ে নিলে যে, পায়েস আছে, ফলার আছে, পাঁপর-আচার এসব খাও।'

মামী চেপে বসিয়ে দিল। অগত্যা খেতেই হল সিরাজকে।

আলী হোসেন আহার শেষ করে উঠে গিয়ে টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে আলমারি খুলে শ্যাম্পেন বার করে আনলেন।

মামী চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে শাসন করতে চাইল। কিন্তু কুছপরোয়া নেই ভাব করে ছোট সুন্দর গ্লাসে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে বললেন, 'খাবি নাকি খোকা, সব চেয়ে দামী মাল, হাজার বছর আগে তৈরী, খেলে টকটকে লাল হয়ে যাবি।'

সিরাজ বলল, 'মদ খেলে আমার অ্যালার্জি হয়। ভীষণ পেট খারাপ করে ? আমাশা এসে যায়, পাইল্‌স হবার লক্ষণ দেখা দেয়।'

'সেটা পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ায় হয়, বাঙালীদের মাথায় পর্যন্ত আমাশা আছে। খনিজ পানি না থাকার জন্য এটা আরো হয়েছে। এখানে ফ্রুট্‌ আছে, প্রোটিন আছে, ভয় নেই, খা—তাছাড়া শীতপ্রধান জায়গা। শীতপ্রধান জায়গায় চর্বিদার গোসত আর মদ স্বাস্থ্যমতে নিষিদ্ধ নয়।'

'মামার যুক্তিটা অযৌক্তিক নয়। তাই তাঁর বাড়িয়ে ধরা গ্লাসটা নিয়ে চুমুক নিয়ে শেষ করে ফেলল।

মামা বললেন, 'বাঃ। বেটা মানুষ হ। আমার গুরু বলতেন, পুরুষের জন্য তিনটি কর্তব্য আছে। এক. খুব পরিশ্রম করবে, তুই, খুব ভাল জিনিস খাবে; তিন, উত্তম বিছানায় নিদ্রা যাবে। তোমাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি না, তুমি এম-এ পাস, তুমি শিল্পী; কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় বাবা, মহাকবি গ্যেটের এই কথাটি, জীবন তারই লোভ্য এবং ভোগ্য যে প্রতিদিন জয় করে এটুটি।'

'প্রতিদিন জয় করতে হয়⋯ প্রতিদিন। খুব ভাল কথা। একটু কাজ নিয়ে বসব মামা, শুভরাত্রি!' সিরাজ চলে এসে নিচে কামরার ইজিচেয়ারটাতে পড়ে রইল।

'ঝিমঝিমে নেশা ধরেছে। মাথাটা ঘুরছে। শরীরটা আরামদায়ক উষ্ণতায় গরম হয়ে যাচ্ছে। রিজিয়ার কথা তার মনে পড়ল।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

তারপর সারারাত চমৎকার ঘুম।

সকালে দেখল পেট খারাপ করে নি।

মামীকে বলল, 'এ বেলা আমি একটু ঘুরে আসি, ওবেলা তো যাবেন ?'

'হ্যাঁ। দুপুরে ঠিব খাবার সময় এসো।'

'আচ্ছা।' বলে ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে বের হল সিরাজ।

॥ ৫ ॥

কার্ডটা হাতে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ী টিলার ওপরে যে বাড়িটি কাশেম আলীদের বলে ভাবল সে দেখল সেটি বাড়ি নয়, প্রাসাদ। গেটে দারোয়ান বসে আছে। একজন ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়িঅলা রাঙা টুকটুকে লোক সবুজ রঙের মোটরে করে বেরিয়ে গেলেন। মোটর চলার পথ তৈরি করা হয়েছে এঁকে বেঁকে সমতল করে। শ্রীনগর শহরের শেষপ্রান্ত।

অল্প দূরে দূরে আরো কয়েকখানা বাড়ি। অ্যাডভোকেট জামসেদ আনোয়ারের বাড়িটা যেন একটা লালকুঠি।

নিজের পোশাক আর জুতোটার দিকে চোখ পড়ল সিরাজের। কে যেন বলেছিল, জুতোতেই মানুষের রুচি বা বাবুয়ানা চেনা যায়। জুতোবিলাসী এই সব সাহেব-সুবাদের বাড়ি সে তার ময়লা বেশ নিয়ে ঢুকলে তাঁরা আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে নিয়ে মনে মনে ঘেন্নায় ঠোঁট বেঁকাবে।

ধুত্তোর! জুতোপ্রেমিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দরবারে গিয়ে ভিখারীর মতো থাকার তার দরকার কি! ধনীরা সবাই এক, গরিবদের তারা পরিশ্রম নিতে চায় কিন্তু মানুষ মনে করে না।

পাহাড়ী টিলাপথ দিয়ে পূর্বদিকের মাঠের দিকে চলতে লাগল সিরাজ। অপূর্ব সুন্দর পাইন বন। মেঘের মতো রঙ নিয়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ঊর্ধ্ববাহু ঝাউগাছ। চেনার গাছে অসংখ্য ফুল।

আপেল বাগান। আঙুরক্ষেত।

সমতলের পথের ধারে পান সিগারেটের দোকান। সিগারেট নিল সিরাজ।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চলার পর হঠাৎ সিরাজের সামনে পড়ল একটি মেয়ে। চমকে উঠল সে। এত সুন্দরী মেয়ে তো সে আর কখনো দেখে নি। আগুনের মতো জ্বলছে যেন তার রূপলাবণ্য। হাতে কাস্তে, পাকা সোনা রঙের গম কাটছে মেয়েটি। ক্ষেতে আরো দুটি বুড়ী মেয়ে আছে। মেয়েটির কি অসামান্য চোখ—নীলাভ দীঘল। নাকটা বাঁশির মতো। ছোট্ট রাঙা পুরুষ্ট দুটি ঠোঁট।

যৌবন-ভরা পরিপূর্ণ চেহারা। রোদ্দুরে মেয়েটি কাজ করছে। মাথায় কাপড় নেই। দুটো হাত খোলা।

সিরাজ তাকাতে আবার মেয়েটি তাকে দেখল। একটু দূরে সরে এসে খেজুর কুঞ্জের নিচে বসে গমক্ষেতে কাজ করা মেয়েটির ছবি আঁকতে বসল সিরাজ।

মেয়েটি তাকে দেখতে পাচ্ছিল। কি বলাবলি করল তিনজনে। তারপর হাসতে লাগল। মেয়েটা গান গাইতে লাগল। বুড়ী দুজন তার ধুয়ো ধরেছে।

বুড়ো চাষী ক্ষেতে এল টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে। ক্ষেতমজুর মেয়েদের জন্য জল-খাবার এনেছে। বুড়ো নামার পর ওরা সিরাজকে দেখিয়ে কি যেন বলল। ঘোড়ার পিঠে আবার উঠে বুড়োটা এলো সিরাজের কাছে।

কাশ্মীরী ভাষায় কি শুধোলে—সিরাজ কিছু বুঝল না। আঁকতে লাগল। বুড়োটা ঘোড়া থেকে নেমে এসে ছবি আঁকা দেখল। তার বোধহয় রাগ হল। গজগজ করতে করতে চলে গেল।

সিরাজ উঠে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে মাঠের পথে অনেক দূরে চলে এলো।

সেই বালিকাটি কোথায় যে মাঠে মেষ চরায়! কোনদিকে সেই মাঠ? বোধহয় পশ্চিমে। সে হেঁটে চলল।

অবশেষে সে চারণক্ষেত্র পেল।

বিরাট ঢেউখেলানো অসমতল ঘাসের মাঠে এখানে সেখানে কালো কালো রেখায় মেষপালের অবস্থান। পাহাড়ী উঁচু জায়গা থেকে নেমে চলল সিরাজ।

মেয়েটিকে দেখতে পেল। শতখানেক ভেড়া আর গোটা পঞ্চাশ ছাগল আছে ওর কাছে। এখনো লোম ছাঁটা হয়নি ভেড়াগুলোর।

কিশোরীটির সেই একই পোশাক।

কাছে গেল সিরাজ। বলল, 'তোমরা কোন্ পল্লীতে বাস করো?'

'নিশান-গাও।'

'কে আছে তোমার?'

'মা আছে। আর আমি।'

'বাপ নেই?'

'তাহলে কি পরের মেষ চরাতে আসি? বাপ থাকলে আমি ইস্কুলে পড়তাম।'

'তোমার বাপ কি মারা গেছে?'

'জী।'

'কি করে?'

'ভারত পাকিস্তানে যুদ্ধ হল—সেই যুদ্ধে আমার বাপ মারা গেছে। আমার বাপের নাম ভারতের সবাই জানে, বীর শহীদ হাবিলদার আবদুল হামিদ।'

'তাই নাকি। তুমি হাবিলদার আবদুল হামিদের কন্যা। তুমি মেষ চরাচ্ছ।'

'হ্যাঁ।' লজ্জায় দুঃখে মাথা নিচু করল কিশোরীটি।

'তোমরা তো সরকারী মাসোহারা পাবার কথা।'

'হ্যাঁ, মা তা পায়।'

'তবে?'

'সে তো সামান্য।'

'প্যাটান ট্যাঙ্কের যিনি চেন কেটেছিলেন সেই আবদুল হামিদ তো?'

'জী হ্যাঁ।'

বালিকাটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সিরাজ। মেয়েটি তারপর চোখ তুলে তাকাল।

হাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে ধরে সিরাজ বলল, 'বেশ সুন্দর তোমাকে দেখতে। কি নাম তোমার?'

'আমার নাম লায়লা।'

'লায়লা মানে তো রাত্রি—কিন্তু তুমি যে অপূর্ব ফর্সা মেয়ে।'

লজ্জা পেল লায়লা।

'তুমি মোটে পড়াশুনো করো নি?'

'হ্যাঁ, দুসরি কিতাব পর্যন্ত পড়েছি। তারপর মাদ্রাসা ছাড়তে হল। আমার বাপ মরে গেছে—আমরা গরিব লোক—আমাদের ক্ষেতি নেই—কি করে খাব? তাই মেষ চরাতে আসি।'

'তোমার বাবা যখন মারা যান তখন তুমি কত বড়?'

'আমি? তখন নাকি সবে মাত্র হয়েছি।'

'তার মানে তুমি এখন চোদ্দ বছরের। তোমার একটা ছবি আঁকব?'

'না।'

'কেন?'

'গাঁয়ের মোল্লা জানতে পারলে আমাদের 'একঘরে' করবে। এমনি তাই রাগ।'

'রাগ কেন ?'

'ভারতের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে বলে। আচ্ছা, এ দেশটা কি আমাদের নয় ?'

'নিশ্চয়ই আমাদের দেশ।'

এবার লায়লার চোখে যেন আনন্দ খেলা করল। সিরাজের ওপরে খুশী।

সিরাজ তার ঝোলার ভেতর থেকে কতকগুলো খোরমা বার করে লায়লার হাতে দিল। বলল, 'খাও—লজ্জা কি রে মেয়ে। কি খেয়ে এসেছ তুমি ?'

মাথা নাড়ল লায়লা, না সে কিছু খেয়ে আসে নি। তবে তার জামার নিচে একটা রুমালের মধ্যে বাধা আছে দুখানা রুটি আর একটু হালুয়া।

বেলা যখন ঠিক দুপুর হবে তখন সে রুটি খাবে। ঐ পল্লীটার ইদারা থেকে পানি খেয়ে এসে খেজুর তলাটার নিচে শুয়ে ঘুমোবে। কখনো কখনো ঐ খেজুর কুঞ্জটার ভেতরে খেলা করে কিন্তু খেলায় মাতলে ভেড়াগুলো অন্য পালে চলে যায় আর ভেড়িদের জ্বালাতন করে। মালিকের লোক এসে পড়লে গালাগালি করে। মারে।

'ছবি আঁকতে তাহলে দেবে না ?'

'না। তুমি তো পূর্ব দেশের লোক ?'

হ্যাঁ, আমি বাঙালী।'

'ওঃ বাঙালী। বাঙালীরা খুব খারাপ লোক। মা ব'ল ওদের বিশ্বাস করতে নেই।'

'কেন, কেন ?'

'একজন বাঙালী মুসলমান না এই কাশ্মীরে এসে কাশ্মীরী এক মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করল। বারো বছর পরে তিনটে ছেলেমেয়ে রেখে দেশে পালিয়ে গেছে, আর আসে না।'

'সবাই তো আর এক রকম নয়।'

মেঘ ঝুলে আসছে। বৃষ্টি আসবে এখনি, হয়তো সব ভিজিয়ে দেবে।

বাকি খোরমাগুলো সব লায়লার হাতে তুলে দিয়ে সিরাজ দ্রুত পায়ে পাহাড়ী টিলার দিকে হাঁটতে লাগল।

বৃষ্টি এসে পড়ল। গোটা মাঠে বৃষ্টি হচ্ছে। লায়লা আর তার মেষপাল ভিজছে। হয়তো লায়লা খেজুর কুঞ্জটার নিচে এসে লুকোবে। ভিজে গেলে ঠাণ্ডা পোশাকে কষ্ট পাবে। রোদ উঠলে জামা শালোয়ার শুকোবে।

একটা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াল সিরাজ। আবদুল হামিদের মেয়ে মেষ চরাচ্ছে।

ওর মাও নিশ্চয়ই গতর খাটায়। যা মাসোয়ারা পায় তাতে চলে না। মেয়েটার লেখাপড়ার হয়তো খরচ লাগে না। কিন্তু পেট চলবে কেমন করে?

গলার ভেতরে কেমন যেন তেতো লাগতে লাগল সিরাজের।

সেই যুদ্ধের স্মৃতিটা মনে করতে লাগল সিরাজ। আইয়ুব খাঁর হুমকি: তিন দিনেই আমরা মার্চ করে গিয়ে দিল্লী দখল করে নেবো।

কাশ্মীরের যুদ্ধ সারা সীমানায় ছড়িয়ে পড়ল। লাহোরের পতন হয় হয়।

ভারত অনেক জায়গা জিতে নিল। পাকিস্তানও এদিক ওদিক অনেক ভেতরে ঢুকে এলো।

প্যাটান ট্যাঙ্ক, চক্রব্যূহ ভেদ করলে ভারতীয় জওয়ানরা, শহীদ হয়ে গেলেন আবদুল হামিদ প্রমুখ কত বীর সৈন্যরা।

মিঃ চাগলা ছুটলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে।

তাসখন্দ মীমাংসা বৈঠক বসল আইয়ুব খাঁর সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর:

মীমাংসা অবশ্য হল কিন্তু হঠাৎ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাসখন্দেই মারা গেলেন।

যে যার ভূ খণ্ড ফেরত পেল।

কাশ্মীর সমস্যা যা ছিল তা রয়েই গেল, মাঝ থেকে দু-দেশের বহু প্রাণ গেল, অনেক সংসার ভেসে গেল।

নিশান গাঁওয়ের গোঁড়াপন্থী মুসলমানরা নাকি হামিদকে শহীদ বলে স্বীকার করে না। যিনি ন্যায় যুদ্ধের জন্য প্রাণ দেন শহীদ হন। আবদুল হামিদ মুসলমান হয়ে পাকিস্তানী মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়েছেন কাজেই তিনি আদত কাফের।

সিরাজের মনে হল হাবিব আকবর যে মোহন বাগানে খেলছেন মোহামেডানের বিরুদ্ধে যখন খেলা পড়ে তখন কি তারা জাত ভাই বলে দয়া করে ছেড়ে দেবেন অথবা মোহামেডান দলে যে সব হিন্দুরা আছেন তারা কি ঘুষ খেয়ে জাত ভাইদের জিতিয়ে দেবেন? পাকিস্তানের অধিবাসী কোনো হিন্দু সৈন্য কি তার দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেবে না?

পাকিস্তানে কি হিন্দু সৈন্য আছে?

ভারতে কিন্তু মুসলমান সৈন্য আছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। এখানে অধিনায়ক বা রাষ্ট্রপতিও হতে পারেন ভারতীয় মুসলমান।

ধর্ম নিরপেক্ষ না হলে বিভিন্ন জাতি সমন্বিত একটি বৃহৎ দেশে ক্রমাগতই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

আর সম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা অত্যন্ত নীচ ব্যাপার। এই পুঁজি নিয়ে জাত-সম্প্রদায় কখনো বড় হতে পারে না।

যারা নিজের কওম, নিজের জাত, নিজের সম্প্রদায় বলে বেশি চিৎকার করে তারাই তাদের বেশি শত্রুতা করে।

বৃষ্টি থেমে যেতে একটা টাঙ্গাতে উঠল সিরাজ। মামার দোকানে এলো।

মামা ক্যাশে বসে আছেন। ভেতরে এসে বসল সিরাজ।

কফি আর কিছু ভাজা খাবার দিয়ে গেল কর্মচারীদের একজন।

মামা ওকে নিয়ে এলো এক ইংলিশ কাটিং টেলারের কাছে। কাপড় সঙ্গেই এনেছিলেন। মাপজোক দিল সিরাজ।

মামু বললেন, 'তিনদিনের মধ্যেই দিতে হবে। কলকাতায় চলে যাবে, জরুরী কাজ করার জন্য আলাদা মজুরী পাবে।'

দর্জি সবিনয়ে স্লিপ কেটে দিল।

টাঙ্গাতে চড়ে বাসায় এলেন ওরা মামা-ভাগ্নে

গরম পানিতে স্নান করার পর আহারাদি সেরে এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে খুব ঘুমোল সিরাজ। ঘুমোবার আগে সে অবশ্য কিছুক্ষণ গমক্ষেতে কাজ করা সেই অসামান্য সুন্দরী নিটোল যৌবনা মেয়েটির কথা ভাবল। তার চোখের দৃষ্টি দেখে হাফিজের লাইন মনে পড়ল : বুলবুলের বাসা পুড়ে গেছে তার (সাকির) নার্গিশ চোখের চাহনিতে।

অর্থাৎ বুলবুল পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে বাসায় আর তিষ্ঠতে পারছে না।

মামীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গল সিরাজের। বিকালের তির্যক রেখার রোদদুর তখন ঝলমল করছে পাইন বনের শাখায়।

॥ ৬ ॥

বাঙালী মেয়ের মতো মামী মাহমুদা খাতুন শাড়ি পরে বের হল। বলল, 'সিরাজ, তোমার ছবি-ছাবা কতকগুলো সঙ্গে করে নাও—আমার আব্বাকে দেখাবে। তাঁরও এক সময় আঁকা-জোকার হাত ছিল।'

সিরাজ ঝোলা কাঁধে নিয়ে বের হতে মামী তাকে দেখে স্মিত হাসি হাসল। বলল, 'তোমাকে দেখতে ভারী সুন্দর। কাশ্মীরে এত রূপবান যুবক আছে কিন্তু হাজারের মধ্যেও তোমাকে চোখে পড়বে।'

'কলকাতার পথেও আমার দিকে সবাই তাকায়।'

'বিশেষ করে মেয়েরা।' মামী ঠাট্টা করল।

'মেয়েরা তাকায় আর হাসে। ওদের আমি বড একটা বিশ্বাস করি না।'

'কেন, কারো কাছ থেকে বোধহয় খুব আঘাত পেয়েছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিরাজ। কিছু বলল না।

গাড়িতে পাশাপাশি বসেছে দুজনে। মামীর গায়ে দামী সেন্টের গন্ধ। পথের লোকজনরা তাকাচ্ছে। ভাবছে বোধহয় বাঙালী হিন্দু দম্পতি।

চারদিকে পর্বত-ঘেরা অপূর্ব সুন্দর শহর।

পথের পাশে দোকান। বড় বড় শাল-গালিচা-কাপড়-চোপড়ের দোকানের মালিকরা মাড়োয়ারী। কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবীরাও আছে।

ফল দোকানগুলো ভারি চমৎকার। রুপোর গহনার চল্ আছে এখনো এখানে। দরিদ্র মেয়েরা রুপোর সাতনরী হার পরে।

হঠাৎ ঝ্যাঁৎ করে যেন মনে পড়ল সেই লায়লার কথাটা। বীর শহীদ হাবিলদার আবদুল হামিদের কন্যা—অভাবে অনটনে মেষ চরাচ্ছে। জাতীয় কর্তব্য ছিল তার সমস্ত কিছু ভরণপোষণ শিক্ষাদীক্ষার ভার সরকারের তত্ত্বাবধানে নেওয়া। আবদুল হামিদ কি সাধারণ সৈনিক ছিলেন? কত তাঁর পেনসন? তিনি কি কাশ্মীরী ছিলেন, না পাঞ্জাবী?

ক্ষমতা থেকে সরে গেলে মানুষ তাকে ভুলে যায়। অনেক বীরের কাহিনীর মধ্যে আবদুল হামিদের কাহিনী একটু লেখা থাকবে।

কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছিল এই আবদুল হামিদ অবশ্য একক এবং স্বতন্ত্র।

সিরাজ ভাবল, আর বাকি সবাই ?

হজরতের কথা মনে পড়ল, শহীদের রক্তের চাইতে পণ্ডিতের কলমের কালি আরো পবিত্র।

কিন্তু এইসব পণ্ডিতরা একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হীন কটাক্ষ করেও নিজেদের সাধু সাজিয়ে রাখতে চান।

সিরাজ হঠাৎ বলে বসল, 'লায়লা মেষ চরাবে কেন ?'

মামী অবাক হল। কে লায়লা ? পাগল নাকি সিরাজ ? হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছে।

মামীও কোনো কিছু না জেনেই বলল, 'চরাবেই বা না কেন ? নবীও তো মেষ চরিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণও রাখাল ছিলেন।'

সিরাজ হঠাৎ হেসে অপ্রাসঙ্গিক আর নাটকীয়ভাবে উত্তর দেওয়াতে একটু চেপে ধরল গা দিয়ে। মাহমুদা খুব হাসল। বলল, 'তুমি বুঝি এই রকম অসংলগ্ন কথা বলো মাঝে মাঝে ?'

'কী আশ্চর্য। যে বীর শহীদ দেশের জন্য শত্রুকে চরম আঘাত হেনে প্রাণ উৎসর্গ করলেন, আর তাঁর পরিবারের হাতে একটি মানপত্র আর মাসে ষাট কি একশো টাকা দিলেই কর্তব্য শেষ ?'

মামী আবার আলগা কথায় রসিকতা করতে লাগল, 'দেশটা অনেক বড় আর প্রাণটা তো ছোট—ছোট ছোট লক্ষ কোটি প্রাণ তো পিঁপড়ের সারি—গোটা কতক যায় যদি—'

'মামী তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় নেই দেখছি—'

'দুরবস্থায় আছি নাকি ?'

'তুমি ড্রিঙ্ক করেছ। সেণ্টের গন্ধে আগে তা বুঝতে পারি নি।'

'আরে ধেনো হলে তো বুঝবে। আমি নামাজ পড়ি না, রোজা করি না। আমি মদ খাই, ভাল ভাল খাবার খাই, ভাল পোশাক পরি, প্রাসাদে ঘুমোই—আমি জীবনটা ভোগ করতে চাই। মরে গেলে আল্লার ফেরেস্তারা আমার শরীরটাকে নিয়ে যা পারে করুক গে। পঁচিশ বছর পরে কবর খুঁড়লে হাড় পর্যন্ত পাওয়া যায় না যখন তখন কেমন করে বিশ্বাস করি লক্ষ বছর ধরে শাস্তি হবে আমার ?'

'সামাজিক অনুশাসনের জন্য এসব বলা হয়েছে। জন্মান্তরবাদ তাই। তবে মামী স্বৈরাচারও ভাল নয়। যাই করি না কেন সবাই আমরা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি।'

'মৃত্যুকে আমি বড ভয় করি সিরাজ।'

টাঙ্গা উপরে উঠছে। মামী তার মাথাটা সিরাজের কাঁধে রাখল।

হঠাৎ মামী কাঁদতে লাগল। চাপা একটা কান্না।

সিরাজ আশ্চর্য হল।

বলল, 'কাঁদছ কেন মামী ?'

'কি বলব, কাঁদছি কেন ? জানো, আমি ভাল বেহালা বাজাতে জানি। করুণ সুব বাজাতে বাজাতে এক সময় আমি তার ছিঁড়ে ফেলে দিই। আর সব আছে, জানো সিরাজ—কিছুই নেই। আমি সর্বহারা।'

লোক আসছে দেখে সিরাজ মামীর মাথাটা কাঁধ থেকে তুলে দিল।

টাঙ্গা এসে দাঁড়াল।

অ্যাডভোকেট জামসেদ আনোয়ারের বাড়ি।

সিবাজ দেখল সকালেই তো সে এই বাড়িটার সামনে দিয়ে গিয়েছিল।

কাছেই, একটু উপরে রিজিয়াদের বাড়ি।

ভেতরে যেতেই বৃদ্ধ উকিল জামসেদ আনোয়ার এগিযে এলেন। 'এসো মা মাহমুদা—ইনি কে—আমি তো চিনলাম না।'

'এ আপনার নাতি, ওঁর ভাগ্নে, কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী সৈয়দ সিরাজ। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে এলাম।'

'এসো ভাই, বসো।'

বসল সিরাজ। বৃদ্ধের টেবিলে মদের বোতল। গ্লাসে ঢালা মদ। তিনি একটু খেলেন।

'এই তো একা আছি। সঙ্গিনী মারা গেল। বড় একা লাগে। তবে ঠিক একা নেই, কুকুর আছে, বই পড়ি। মাহমুদা তুই বড় কম আসছিস।'

মাহমুদা বলল, 'এই তো সেদিন এলাম।'

যুবতী দাসীটি এলো, তাকে কি যেন বললেন উকিল সাহেব একটু উঠে গিয়ে।

'তোমরা আজ থাকবে এখানে। আমি ভাইয়াকে নিয়ে গল্প করব।'

মাহমুদা খুশী হয়ে ভিতরে চলে গেল।

সিরাজ বলল, 'আপনি কতদিন এখানে আছেন ?'

উকিল সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তা বছর তিরিশেক হবে। ওকালতি পাস করার পর প্রথমে দিল্লীতে এসে ছিলাম বছর দুয়েক। তারপর শ্রীনগরে এলাম। সেই বছরেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল। আজাদ কাশ্মীর নামে অনেকটা জায়গা পাকিস্তান দখল করে রইল, কত গণ্ডগোল, কত যুদ্ধ দেখলাম, দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলাম।'

'কাশ্মীরী মেয়ে তো বিয়ে করেছিলেন?'

'কাশ্মীরী মেয়ে নয়, কাশ্মীরী হিন্দু মেয়ে। পরে সে মুসলমান হয়ে গেল অবশ্য আমি বাধ্য বা পীড়ন করিনি। লেখা-পড়া জানত, ইসলামী গ্রন্থাদি পড়ার পর মন খুলেই বলল, স্বামীর ধর্মই আমার ধর্ম। তারপর সে আরবী পড়া শিখল। নামাজ পড়ত, রোজা করত। বাংলা ভাষাও খুব ভাল করে শিখে ফেলল।'

'আপনি এখন কি ধরনের বই পড়েন?'

'ঠিক নেই, যা পাই পড়ি।'

'এই যে পিক্‌থলের কোরআন, এও কি আপনি পড়েন নাকি?'

'শুধু পড়ি না, আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে!'

'আপনি মদও খান, আবার কোরআনও পড়েন?'

মাথার পাকা চুল ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন উকিল সাহেব। বললেন, 'নেকির ধান্ধা তো আমার নেই। পাপও করি, পুণ্য করি—উসুল যায়। মরলে দোজখেও যাব না, বেহেস্তেও না—এই রকম পৃথিবীর মতো একটা জায়গা হলেও চলবে।'

সিরাজের হঠাৎ এই লাইন কটায় চোখ পড়ল কোরআন শরীফের:

"যে কেউ চায় এই সংসারের জীবন আর এর শোভা সৌন্দর্য, আমি তাদের কাজের দাম পুরোপুরি দিয়ে দেবো এখানেই, আর সে সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করা হবে না।

এরাই তারা যাদের জন্য পরকালে আগুন ভিন্ন আর কিছু নেই, আর তারা এখানে যা করছে সব বৃথা হবে আর যা কিছু তারা করে তা ফলহীন।"

সিরাজ ভাবল, এই হল উত্তর, গাড়িতে আসার সময় মামী যা বলছিল। সে জীবনটা ভোগ করতে চায় কিন্তু ফলহীন তার জীবন। শুধু তাই নয়—দোজখের আগুন তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই আগুন কিসের আগুন—অতৃপ্তির?

উকিল সাহেব দেখালেন তাঁর ঘরে কত বই। অনেক বইই আইনের, বিদেশী সাহিত্যের বই আর রাজনীতি বা ধর্মের বইও আছে।

দেখালেন তাঁর আঁকা ছবি।

সিরাজ হাসল। বলল, 'গুণী মানুষ দাদু আপনি।'

'তোমার ছবিগুলো এনেছ নাকি, কই দেখাও।'

'এমন কিছু না, এখানেই এঁকেছি এই কটা।' ছবিগুলো দেখে বৃদ্ধ খুব তারিফ করলেন।

বললেন, 'তুমি জাতশিল্পী, হাতের টানটোন খুব পাকা।'

এরপর বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বেহালা বাজিয়ে শোনালেন। অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিল সিরাজ।

খাবার ডাক পড়ল তাঁদের।

মামী পরিবেশন করল।

আহারাদির পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ঘরে শোবার জন্য নিয়ে এলো মামী। বলল, 'আমি পাশের ঘরেই থাকব, মাঝখানে দোর। খোলাই থাকে। ভয় নেই, এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই। তাছাড়া বাড়িতে অ্যালশেসিয়ান কুকুর আছে। তুমি এখনি ঘুমোবে তো?'

'হ্যাঁ মামী, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, শুয়ে পড়ো। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।'

মামী চলে যেতে পোশাক ছেড়ে কম্বলের নিচে ঢুকল সিরাজ।

একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধহয়—ভেঙে গেল—মামী স্তিমিত নীলাভ আলোর সামনে বসে করুণ সুরে বেহালা বাজাচ্ছে।

নিচের ঘরে আছে উকিল সাহেব তার কুকুর টাইগার আর যুবতী দাসীটি। দাসী মেয়েটি নাকি খৃষ্টান ছিল। আগে ছিল নান্। তারপর পদস্খলন ঘটে এক পাদরীর সঙ্গে। তাদের গীর্জা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। পাদরীটি তাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল কিন্তু সে বেচারা হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গেল। তারপর অনাথ হয়ে যায় মেয়েটি। পাঞ্জাবী খৃষ্টান মেয়ে। একদিন আইনের পরামর্শ চাইতে এলো উকিল জামসেদ আনোয়ারের কাছে। মেয়েটির স্বামী যে জমি আর বাড়ি রেখে গিয়েছিল নিঃসন্তান হওয়ার জন্য সেসব নাকি তার ভ্রাতুষ্পুত্ররা পাবে ইত্যাদি। শেষকালে মেয়েটি সব ছেড়েই দিল, খোরাকী দেবার কথা ছিল কিন্তু স্বামীর ভাইপোরা আর দিল না।

তখন উকিল সাহেব বললেন, 'আমার ভার নাও তুমি—একা থাকি বুড়ো মানুষটা, আর তোমারও থাবার-দাবারও অভাব হবে না।'

মেয়েটি রাজি হয়ে গিয়ে এখানে বছর পাঁচেক হল আছে।

মাহমুদার মা মারা গেছেন প্রায় ছ-বছর হবে। মেয়ের বিয়ের পর নাকি মাত্র বছর দুয়েক বেঁচে ছিলেন।

সিরাজ ঘড়ির ঘণ্টা শুনল, এগারোটা বাজল। এর মধ্যেই শহর শুব্ধ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি বা টাঙ্গাঅলার ঘণ্টা শোনা যায়।

সিরাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাতে কুকুরের বিকট চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যেতে উঠে বসল।

ছুটো অন্ধকার ঘরের মধ্যে খোলা দোরটা যেন হাঁ হাঁ করছে।

মামী বোধহয় ঘুমোচ্ছে খাটের ওপরে।

বাইরে যাওয়া দরকার। কোথায় আলোর স্যুইচ কে জানে।

থাক। কিন্তু বাইরে তাকে যে যেতেই হবে।

হঠাৎ দখতে পেল, ও ঘরের মেঝেয় কেউ যেন পড়ে আছে। খাট থেকে মশারীর কোণ ছিঁড়ে নিয়ে পড়ে গেছে। হাঁ, তাই তো।

ঘরের মধ্যে গিয়ে সিরাজ দেখল সত্যিই মামী নিচে পড়ে আছে।

ডাকল, 'মামী! ও মামী—'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। কপালে হাত দিয়ে দেখল ঠাণ্ডা। মারা গেল নাকি। নাড়ী ধরে দেখল—না, ঠিকই তো চলছে।

নাড়া দিতে লাগল। কোনো সাড়া নেই।

মামীর মুখে মদের গন্ধ!

কি জ্বালা, মেয়েরা মদ খায় কেন? টাকা-পয়সা আছে, কোনো কিছু করার নেই বলে তাই!

কিন্তু মামী তো চমৎকার নকশার কাজ জানে।

ওকে বিছানায় তুলে দেবে, নাকি দাদুকে ডাকবে। দাসীটাকে ডাকতে পারলেই ভাল হয়। কিন্তু দাদু হয়তো তাকে নিয়ে আছেন, কুকুরটা হয়তো ছাড়া আছে।

বেড স্যুইচ টিপে আলো জ্বালল সিরাজ।

মামীর সারা মুখে রক্তিম লাবণ্য যেন ফেটে পড়ছে। চোখের পাশের নীল শিরাগুলো দেখা যায়।

মামীকে টেনে তুলে বিছানায় শোয়াল সিরাজ। মামী বাঙালী মেয়েদের মতোই শাড়ি পরে এসেছিল—সেই পোশাকেই আছে।

অসম্বৃত ওর বেশবাস।

এমন নিরোগ সুন্দর স্বাস্থ্য মামীর কিন্তু তবু সন্তানাদি হল না কেন?

মামাই হয়তো—।

মামী অনেক পীরের মানত করেছে।

সিরাজ অবাক হয়ে কিছুকক্ষণ মামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আসবার সময় মামী বলছিল, আমি সুখে থাকতে চাই ··

পার্থিব সুখের আকাঙ্ক্ষী মামী।

কিন্তু সন্তান না পাওয়াতে একটা হতাশায় ভুগছে। মদ খাচ্ছে।

মামার সঙ্গে নাকি মারামারি করে।

নিজের ঘরে চলে এলো সিরাজ।

শুয়ে পড়ল।

দূরে ঝিকিমিকি আলো। ডাল লেকের হাউস বোটের আলো নাকি ওগুলো।

ঝিলম নদীতে শিকারায় তার যাওয়া হল না।

এখানের একটা বড় মহীরুহের দাম বোধহয় লাখ টাকা। কারণ তার কাঠ কুরে কুরে খুদে খুদে কাশ্মীরীরা কত আসবাবপত্র তৈরি করে।

মামার দোকানে দেখেছে একখানা গালিচার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা।

মামার বোধহয় অনেক টাকা।

মামীর বাবা অনেক টাকা দিয়েছেন বোধহয়, তাই মামীকে কিছু বলেন না।

তন্দ্রা ধরেছিল। হঠাৎ মামীকে কাশতে শুনল। ওয়াক করে একটা শব্দ করল। বোধহয় বমি করছে।

উঠে এলো সিরাজ।

হঠাৎ চোখ চাপা দিল। মামী একেবারে বস্ত্রহীনা। আলোটা নিভিয়ে দিল। কাপড় টেনে নামিয়ে দেবার পর আলো জ্বালল আবার।

দেখল মামী খানিকটা বমি করেছে বটে। তবে খাটের নিচে।

ডাকল সিরাজ, 'মামী, ও মামী।'

'আরে ধ্যেত্তেরি।' মামী বিরক্ত হয়ে একটু নড়ল। মুখটা চাকুম-চাকুম করল।

আবার পা ধরে নাড়া দিতে মামী বলল, 'খাব, মদ খাব। ঢালে—আরো ঢালো—

তারপর আর কোনো চেতনা নেই।

সিরাজ চলে এলো।

বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মামীর নগ্ন তনুশ্রী চকিতের জন্য দেখলেও সেইটাই তার মনে পড়তে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নটি মনে পড়ল তার। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ধর্মরাজ, আপনার মা জননী কুন্তীদেবী তো স্থির যৌবনা। তাঁকে দেখে আপনার মনে কখনো কামনার উদ্রেক হয় নি ?

শ্রীকৃষ্ণ কী ভয়ঙ্কর !

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'হয় প্রভু, যখন এমন চিন্তা হয় তখন মাহুত যেমন লোহার কুশ বিদ্ধ করে তার অবাধ্য হাতীকে ফেরায় আমিও তেমনি করি।'

সিরাজ দোর বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল ঘুম ভাঙল তার ভোরবেলায়—জেগে দেখল, ডাল লেকের জল লাল করে সূর্য উঠছে।

সকালের নাস্তার টেবিলে মামীকে দেখল সিরাজ, তার চোখে মুখে কোনো মালিন্য নেই।

উকিল সাহেব বললেন, 'রাত্রে ঘুম হয়েছে তো ভায়া ? কুকুরটা বড় চেঁচায়। ওর বোধহয় মা হবার সময় এসেছে—একবার নিয়ে যেতে হবে।'

মাহমূদা অন্যমনস্ক হল, মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

দাসীটি বলল, 'দুপুরে আমাদের এখানে খাবে তো মামণি ?'

মাহমূদা বলল, 'না। এখনি আমরা চলে যাব—ওঁর খাবারদাবার তৈরি করতে হবে।'

সিরাজ বলল, আমারও কিছু জরুরী কাজ আছে।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কাশ্মীরে এলেই আমার কাছে আসবে ভাই। যতদিন খুশী থাকবে।'

'আচ্ছা।' বলল সিরাজ।

নাস্তাপানির পর মামী বের হল। বাইরে এসে সিরাজ বলল, 'মামী তুমি যাও, আমি পরে যাব।'

মামী অবাক চোখে তাকাল একটু। তারপর টাঙ্গায় চড়ে চলে গেল।

সিরাজ একটু হাঁটতেই অন্যমনস্ক ভাবে কাশেমদের বাড়ির কাছে এসে হাজির। কাশেম ওপরের বারান্দা থেকে দেখতে পেল। হাঁকল, 'এই যে, এদিকে, চলে যাচ্ছেন কেন ?'

মুখ তুলে তাকাল সিরাজ। হেসে হাত তুলল। সেই ময়লা জুতো। আজ বেশ-বাস অবশ্য চলনসই।

কাশেম ছুটে নেমে এসে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। মার্বেল পাথরের পিস গাঁথা বাড়ি।

দারুণ চকচকে ঘরের মধ্যে বসাল তাকে।

কাশেমের বাবা এলেন। সেকহ্যাণ্ড করলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িঅলা ভদ্রলোক। দারুণ রঙ আর চেহারা। ভাল করে হিন্দী বা ইংরেজি বলতে পারেন না। মুখাবয়বে যেন একটা কাবুলী ঢং। মাথা নেড়ে হেসে হেসে শুধু ছেলের কথায় সায় দেন। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল কাশেম ওদের কাশ্মীরী ভাষায়।

রিজিয়া এলো। চিকন রেশমী পোশাক পরা। জরিগুলো ঝলমল করছে। সুর্মাটানা স্তিমিত মিষ্টি চোখ।

পাইপ মুখে নিয়ে আবার করমর্দন করে ওদের বাবা উঠে চলে গেলেন। মোটর বেরিয়ে গেল।

কাশেম বলল, 'আপনি আসবেন—রোজই আমরা প্রতীক্ষা করি। রিজিয়া, দেখা তোর আকা-জোকা। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে দিস। ফাইন আর্টস সেণ্টারে নিয়ে যাস। আজ রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি ভাই।',

সিরাজ হাসল একটু সহানুভূতি দেখিয়ে। ঘরের ছবিগুলো দেখতে লাগল।

কাশেম চলে গেল। বলল, 'আসছি আমি। ওকে একটু দেখবেন প্লিজ এ্যাঁ।'

ঘাড় নেড়ে মৃদু সম্মতি জানাল সিরাজ।

পাশেই বসল রিজিয়া। বলল, 'এই সব আমার ছবি। আজে বাজে! আমি নতুন তো—'

ছবিগুলো দেখতে লাগল সিরাজ: 'এটা কি?'

'এটা অন্ধকার গাছপালার ভেতরে লতায় শিং জড়ানো হরিণ, হরিণীটি তার সঙ্গীকে ছাড়াতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছে।'

'এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? এতো সব গাছপালা কেন? এত মোটা হাবিজাবি টানটোন। তাছাড়া লতায় জড়ায় হরিণটির মুক্ত হবার প্রচেষ্টা কই? তার চোখে সেই রকম আর্তি থাকবে। মুখ শূন্যে বাঁকবে। পেট হেলা হবে, পায়ে টান পড়বে। অবশ্য শিংগুলো তার শত্রু নিধনের অস্ত্র হলেও সেগুলোই বিপদ করছে বলে তা প্রাধান্য পেতে পারে। খুব ভাল সাবজেক্ট। এটা কি তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, অরিজিন্যাল?'

'জী হ্যাঁ।'

'তোমার নরম্যাল টেম্পারেচার কত?'

'সাতানব্বই।'

'কিসের এত উগ্র গন্ধ?'

'ওডিকোলন।'

'হাতটা তোমার অত্যন্ত সুশ্রী আর সুডৌল।'

হাসল রিজিয়া।

দেখ, তোমার এই ছবিটা আমি এঁকে দিই।'

ইজেল পেতে কাগজ এঁটে রঙ তুলি এগিয়ে দিল রিজিয়া।

'একটা সিগারেট খাব যে।'

হাসল রিজিয়া। ভাইয়ার কাছ থেকে আনল। কফি আর সিদ্ধ ডিম, পনীর আর চানাচুর আনল একটি বুড়ো লোক। তার ঝোলা দাড়ি ধরে একটু মজা করল সিরাজ।

লোকটি খুশী হয়ে হেসে আদাব জানাতে জানাতে পালিয়ে গেল।

ডিমটা গালে পুরে জানালা দিয়ে তাকাতেই দূরের চারণক্ষেত্র চোখে পড়ল সিরাজের। সব উৎসাহ যেন হঠাৎ তার নিভে গেল।

রিজিয়া সিরাজের আঁকা ছবিগুলো দেখছিল ঝোলা থেকে টেনে বার করে।

'উহুঁ। অনধিকার চর্চা।'

'এস্‌কিউজ মি।' হাসল রিজিয়া।

'আচ্ছা, আবদুল হামিদ কি কাশ্মীরী ছিলেন, যিনি যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন?

'না বোধহয়, পাঞ্জাবী।'

'ঠিক জানো না? কেন, কোনো ইন্টারেস্ট ফিল করো নি?'

ঠোঁট উল্টে একটা তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করল রিজিয়া। বলল, 'একদিকে গোলামী, অন্যদিকে গোঁড়ামী। কোনদিকে যাই বলুন তো?'

'বলেছ মন্দ না।' মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করল সিরাজ।

হাসল রিজিয়া।

কফিটা খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একটু টেনে নিয়ে তুলি ধরল সিরাজ।

কাশেম আর রিজিয়ার মা এলেন—একচোখ দেখে নিয়ে মৃদু হাসল সিরাজ।

ওঁরা এখন ডিসটার্ব না করে চলে গেলেন।

ছবিটা আঁকা শেষ করতে মাত্র মিনিট দশেক গেল সিরাজের।

রিজিয়া বিস্মিত।

কিন্তু শুধু কালো কালি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করল না সিরাজ।

'এতে অন্য রঙ দেওয়া যাবে না?' শুধোল রিজিয়া।

জানালার পাশে গিয়ে আবার দাঁড়াল সিরাজ। ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল।

'ওই গমক্ষেতে একটা অসাধারণ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে কাজ করে, তাকে তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, সেই তো হাবিলদার আবদুল হামিদের বউ—চাষী গোলাম নবীদের শস্যক্ষেতে কাজ করে।'

'হাবিলদার আবদুল হামিদের বউ।'

'হ্যাঁ।'

'বিধবা?'

'হ্যাঁ।'

'আর কি করেন?'

'ছোলা পাছড়ায়, গম ভাঙে—গরিব মেয়েরা যা করে থাকে।'

'ওঁর মেয়েটি কি মেষ চরায়?'

'হ্যাঁ। তার নাম লায়লা। আকলিমা বুড়ীদের মেষ চরায় রাখাল বালিকা লায়লা। বড় মিষ্টি চেহারা, না?'

'হ্যাঁ বড় মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ ধারালো চেহারা। ছবি আঁকতে দেয় না মেয়েটা।'

'কাশ্মীরে এই রকম রেওয়াজ।'

'বাজে ব্যাপার। ধার্মিকদের প্রভাব এখানে অনেক বেশি।'

ছবিটাতে আবার হাত দিল সিরাজ।

'এটাকে আবার রঙীন করা যায়, দেখ।'

অন্য একটি কাগজ এঁটে নানান রঙ তুলি নিয়ে ছবিটাকে বিচিত্রতর করে এঁকে দিল সিরাজ। গাছপালা, হরিণ, লতা, ঘাস, মাটি, পাথর যার যা রঙ হওয়া স্বাভাবিক।

শুধোল, 'তোমার কাছে কোনটা ভাল লাগছে বলো।'

'দুটোই।'

'দূর বোকা মেয়ে। এই এক রঙাটি অনেক ঋজু—ভাবব্যঞ্জক। কলকাতার রাস্তায়-ঘাটে তোমার চেয়ে ভাল আঁকতে পারে কত শিল্পী আছে অথচ তাদের ভাত হয় না। দেখ, বিলাসী জীবনে সময় কাটানোর জন্য আর্ট নয়—এর জন্য রোদে রোদে ঘুরতে হবে, বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। দুঃখে দুর্দশায় পড়তে হবে—জীবনে জীবন যোগ করতে হবে—নইলে তোমার ছবি রোমান্টিক হয়ে যাবে। এই

বিত্তশালী রোমান্টিক দলের শিল্পীরা দেশ জুড়ে অনেক পত্র-পত্রিকায় বসে আছে—বাস্তববাদীদের এঁরা ঠেলে রেখে দেন। অনেক প্রতিভাকে এঁরা পা দিয়ে চেপে রাখে। বিদেশের এরা ভাড়াটে দালাল। চরিত্র এদের কুৎসিত।'

'এই ধরনের লোকদের সঙ্গে আমি কিছু কিছু পরিচিত।' বলল রিজিয়া।

'তাই নাকি। তুমিও তাদের দলে?'

'না, ওরা আসে আমাদের বাড়ি। খায়-দায় ফুর্তি করে, চলে যায়।'

অবজ্ঞার স্বরে বলল সিরাজ: 'কারা ওরা।'

'ভদ্রলোকদের বাড়িরই ছেলেমেয়ে।'

'দেশের আপদ। বোহেমিয়ান। অসামাজিক।'

'কিন্তু কেউ তো এদের মধ্যে থেকে আসতে পারে?'

'একটা গাছে ফল ফলবে বলে জায়গা জুড়ে এত কাঁটাগাছ রাখবে?'

'পাঠশালায় তো অনেকেই পড়ে—ক'জন উচ্চ শিক্ষা পায়? অথবা ফুল যত, ততগুলোই কি ফল হয়? আপনি নতুনদের ঘেন্না করলে তারা ভাববে আপনি অহংকারী অথবা পথরোধকারী। গগা, পিকাসোও তো উৎচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। শিল্পীদের জীবন একটু স্বতন্ত্র হবেই।'

সিরাজ বলল, 'তাহলে হঠাৎ যদি আমি তোমাকে ধরি আর কিছু করি, তুমি বদনাম দেবে না?'

রিজিয়ার মুখ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে গেল। অথচ সিরাজ মোটেই এগোল না।

'শিল্পীদের নামে যতখানি বদনাম হয়, ততখানি তারা হতে পারে না—সাধারণ মানুষ এসব ঈর্ষায় রটায়। তারাও বড় হতে চেয়েছিল—পারে নি। কোনো শিল্পীকে স্থানীয় মানুষ কখনো সুখ্যাতি করতে শুনেছ?'

'আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবেন, আয়োজন করব—বিকালের দিকে, আপনি যাবেন?'

'যেতে পারি।'

'ওঃ! কি মজা হবে। ফোন করে বলে দিচ্ছি।' রিজিয়া অন্যঘরে চলে গেল।

এ মেয়ে তৈরি। ভাবল সিরাজ। মজা করা যায়। সন্ধ্যায় যদি তেমন পরিস্থিতি হয় দেখবে নাকি?

কাশেম আর তার মা এলেন।

'ইনি আমার আম্মা। ইনি বলছেন, দুপুরে আপনাকে আমাদের বাড়ি আহার করতে হবে।'

সিরাজ আদাব জানিয়ে হাসল। ছবি দুটি দেখল কাশেম।

রিজিয়া এসে বলল, 'বলে দিলাম—বিকালে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। পাপ্পী তো খুব খুশী। আপনার চার পাঁচখানা ছবি নাকি বেরিয়েছে আজকের কাগজে।'

'কই, আমি জানি না তো।' বলল সিরাজ। 'তবে মামা কখানা ছবি নিয়েছিলেন—হয়তো তিনিই কাগজে পাঠিয়েছেন।'

কাশ্মীরী ভাষার সবচেয়ে বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাটি আনল কাশেম। দেখিয়ে বলল, 'এই যে আপনার ছবি।'

'ইস্। ছেপেছে তো ভাল।'

রিজিয়া যেন হাওয়ায় উড়তে লাগল। তাকে এঁকে দেওয়া হরিণ-হরিণীর ছবি দুটো নিয়ে মাকে দেখাতে দেখাতে বলল, 'স্রেফ কুড়ি মিনিটের মধ্যে এঁকে দিলেন। এ দুখানা আমি রুপো দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব মা।'

মা খুব খুশী। তিনি রান্নার কাজ দেখার জন্য চলে গেলেন।

চুরুট আর সিগারেট দিয়ে কাশেমও সরে গেল।

রিজিয়ার কোমর আর পাছাটি ভারি সুন্দর! উত্তুঙ্গ ওর বুক।

সিরাজ ঈজি চেয়ারে বসল। সিগারেট টানতে টানতে বলল, 'তুমি কি রকম কে জানে! আচ্ছা, গমক্ষেতের ঐ মেয়েটার চাইতেও তুমি ভাল হতে পার?'

'তার মানে?'

'তুমি নরম। ওর শরীরে আছে শক্তি-সামর্থ, রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভেজে—'

'ওকে সবাই চায়। অনেক দ্বন্দ্ব। ওকে নিয়ে নিশান গাঁওয়ে মোল্লাদের ভেতরে মারামারি হয়ে গেছে কতবার। সবাই ওকে চায় কিন্তু কেউ ওকে পায় না। ও সেই আবদুল হামিদের পুরোনো স্মৃতিকে আঁকড়ে বসে আছে।'

'তুমি রাগ করলে না তো, ওর কথা বললাম বলে?'

'না, ওতো কথার কথা। মানুষের কত কিছু খেয়াল হয়। আচ্ছা, আপনি কি ধনীবিদ্বেষী?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ়ভাবে বলল সিরাজ।

নখ খুঁটতে লাগল রিজিয়া।

'আমি ধনীর ঘরে জন্মেছি বলে কি অপরাধী ?'

'না, তা কেন ? মানুষের ওপরে সহানুভূতিশীলা হবে। দরিদ্রদের অবজ্ঞা করবে না।'

'আমি তাদের কত পয়সা দিই। কাপড-চোপড দিই। আমার একটা বান্ধবীর বিয়ে হচ্ছিল না হারের জন্য, আমি তাকে আমার গলার হারটা দান করেছি। সে হিন্দু মেয়ে, নাম তার আনন্দময়ী।'

'বাঃ! ভারি ভাল মেয়ে তুমি। দেখি এদিকে এসো।'

কাছে এলো রিজিয়া। তার চোখে লজ্জা কিন্তু চকিত দৃষ্টি।

সিরাজ ভাবতেও ঘেমে উঠল। কেমন করে বলবে ওর সঙ্গে দেহ-সংক্রান্ত কথা। তবু বলল, 'আচ্ছা, কাশ্মীরী মেয়েদের নাভিদীপ নাকি অপূর্ব সুন্দর—তুমি কি দেখাতে পার ?'

রিজিয়া বলল, 'আমার লজ্জা করে।'

সিরাজ ওর লজ্জাকাতর মুখের ভাবটা উপভোগ করতে লাগল গম্ভীরভাবে বসে বসে।

রিজিয়া হঠাৎ সরে গেল, দোর গোড়া থেকে পর্দা তুলে কেউ আসছে কি না দেখে এলো।

লোকটি আর কিছু বলে না কেন ? দারুণ সুন্দর ওকে দেখতে। পাল্কী না পাগল হয়ে ছিনিয়ে নেয়। বলল, 'আপনি কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রণয় করেন নি ?'

'না।'

'কেউ আসে নি আপনার কাছে ?'

'হয়তো এসেছিল, আমি তাদের ভাষা বা ইংগিত বুঝি না। গরিব ছিলাম। পেটের ধান্দাই বড় ছিল।'

প্রসঙ্গ হারিয়ে গেছে, কি করে নাভিদীপ দেখাবে! বলল, 'আপনি কাউকে এখনো চয়েস করেন নি ?

'তুমি ?'

মাথা নাড়ল রিজিয়া।

হাত ধরল সিরাজ। দেখতে লাগল। বলল, 'হাতটা এত নরম, সুন্দর! দেখি না তোমার নাভিটা।'

তাড়াতাড়ি রিজিয়া তার শালোয়ারের বাঁধনটা নামিয়ে দিল।

'সত্যিই সুন্দর।' সিরাজ বলল, 'ঠিক প্রদীপের মতো। কাশ্মীরী রমণীর দেহলাস্তের বর্ণনা আমি পড়েছিলাম—তাতে নাভি-কুণ্ডলীর মনোরম চিত্র আছে।'

আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দেখার সময় রিজিয়ার চোখ দুটো যেন স্তিমিত হয়ে গেলো। হাত ধরে একটু টানতেই কোলের মধ্যেই বসে পড়ল সে। সিরাজ ওর রাঙা ঠোঁট দুটোয় নিজের উত্তপ্ত ঠোঁট চেপে ধরল।

চকিতে উঠে পালাল রিজিয়া।

আর আসছে না দেখে সিরাজ কেমন যেন ভয়ে-আতঙ্কে ঘামতে লাগল।

বলে দেবে না তো? প্রায়ই তো এ রকম ঘটে। কত জনের কাছে শুনেছে। শিল্পী তুষার রায় বলে, 'মেয়েরা ভীষণ ছল করে। সল দিয়ে দিয়ে কাছে আসে আর তুমি যদি একটু কিছু করো অমনি সাধু সেজে মাকে বলে দেবে তারপর আর সে-বাড়িতে বসতেই বলবে না।'

না, রিজিয়া বোধহয় কিছু বলবে না। হয়তো তাকে জীবনে জড়াতে চাইবে।...

কিন্তু না না—তা হয় না। ধনীর দুলালী, এতো টাকা কোথায়? ওকে গ্রহণ করা আর শ্বেতহস্তী পালা একই কথা।

তাছাড়া তার কি আছে? চাল নেই—চুলো নেই। রোজগারের ঠিক নেই—যদি কাজ না পায়—যদি আকস্মিক নতুনরা এসে তাকে হটিয়ে দেয়। যেমন দিয়েছে সে নিজেও।

জানালায় দাঁড়াল সে। দূরে সেই গম ক্ষেত। আরো অনেক দূরে আকাশের কোলে চারণক্ষেত। লায়লা সেখানে নিশ্চয়ই মেষ চরাচ্ছে।

হঠাৎ সিরাজ ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে পড়ল। না—কেউ দেখল না। দারোয়ানটা গেটে বসে ঘুমে ঢুলছে।

দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিরাজ পাহাড় থেকে নিচে। উত্তরের চারণক্ষেতের দিকে যাবার সময় গমক্ষেতে দেখল সেই মেয়েটি গম কাটছে। কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ ও একটু দাঁড়াল। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল সিরাজের। কাস্তে ছুঁড়ে মারবে না তো মেয়েটা।

অকস্মাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। সারা মুখে ঘাম। দীঘল চোখে বিস্ময়। লাল হয়ে গেছে মুখটা।

মেয়েটি আর তাকাল না।

বুড়ো দুজন গল্প করতে করতে কাজ করছে মাথা গুঁজে।

সিরাজ চলল আঁকা-বাঁকা সাপের মতো পথ ধরে।

হয়তো জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রিজিয়া। ক্ষোভে ফুঁসছে! কাঁদছে নাকি?

ওই বউটাকে ফেলে রেখে যুদ্ধে গিয়ে আবদুল হামিদের মরা উচিত হয়নি। চৌদ্দ বছর আগের যৌবন এখনো মেয়েটি কি করে বাঁচিয়ে রেখেছে?

মেয়েদের কতদিন যৌবন থাকে? এ তো অনন্যসাধারণ। কত বয়স মেয়েটির? চৌদ্দ আর ষোল—তিরিশ—কিন্তু ওকে দেখলে মনে হয় আঠারো বছরের যুবতী। স্থির যৌবনা।

হয়তো রিজিয়ার অন্যকিছু থাকতে পারে। কিন্তু গমক্ষেতের ঐ রমণী যেন সোনার প্রতিমা।

॥ ৭ ॥

পাহাড়ের থেকে কাছে মনে হলেও বেশ অনেকটা দূর চারণক্ষেত্র।

দুদিকে কত রকম ফলের গাছ। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর বাড়ি।

চেরি গাছে বিস্তর ফল।

নাসপাতি গাছের বাগান। পপলার গাছের সারি।

আখরোট আর আপেল গাছ আছে সর্বত্র। বাগানে চেয়ারে-বসা মালিক কোলে কেতাব নিয়ে বসে আছে।

বোরখা পরা মেয়েরা চলেছে।

নানান দেশের মানুষ এখানে এসে আছে।

কাশ্মীরে থেকে যেতে ইচ্ছে করে না। কাশ্মীরী ভাষাটা জানলে এখানেই পসার জমিয়ে তোলা যায়। তবে ছবি বা কালচার সবকিছুতোই আফগানী ঢং।

আজ বোধহয় শুক্রবার। জুম্মার নামাজ পড়তে চলেছে মানুষজন মসজিদের দিকে। এখানে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ।

হাঁটতে হাঁটতে দুপুরের মিষ্টি রোদে এক সময় চারণভূমিতে এসে পৌঁছল সিরাজ।

লাল সবুজ হলুদ নিশান কিম্বা গাছের ডাল পুঁতে রাখল বালক বালিকারা তাদের চারণভূমি নির্দিষ্ট করে রেখেছে।

লায়লাকে দেখতে পেল না। যেখানটায় খেজুর কুঞ্জের নিচে রাখালরা খেলা করে সেখানে গেল।

দেখল লায়লা একাই পড়ে ঘুমোচ্ছে। দুর্গন্ধ মলিন তার গায়ের বস্ত্র। মুখে আঁচড়ের দাগ। চোখ থেকে পানি ঝরার চিহ্ন। মেয়েটা কেঁদেছে খুব। যেন নেতিয়ে পড়ে আছে। রুক্ষ চুল। ঠোঁট দুটো শুকনো।

সিরাজ হেঁট হয়ে বসে ওর কপালে একটু হাত ছোঁয়াল। ডাকল, 'এই যে লায়লা—এই মেয়ে?'

লায়লা জেগে গেল। ভয়ে আর আতঙ্কে হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসল।

সিরাজ বলল, 'কি হয়েছে তোমার? মারামারি করেছ কোনো রাখাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে?'

গম্ভীর হয়ে গাল ফুলিয়ে বসে রইল লায়লা। কোনো কথা না বলে এবার ফোঁসফোঁস শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

'তোমার মা মেরেছে?'

মাথা নাড়ল লায়লা।

'তবে?'

'আকলিমা বুড়ী। আমার চুল ধরে ঝোনা মারল। পিঠে কীল মারল! মুখে আঁচড়ে দিল। কাস্তে দিয়ে একদিন হারামী বুড়ীর ভুঁড়ি ফেড়ে দিতে বলব আমার মাকে।'

'কেন মারল কেন?'

'আজ মাঠে আসতে বেলা হয়েছিল—তাই।'

'কেন, বেলা হল কেন?'

'ফজরের নামাজ পড়ার পর আম্মা বলল রাত্রে-রীটে-ফল-ভিজিয়ে-রাখা-গরম কাপড়গুলো কাচতে। সারাদিন রোদে শুকোবে। আমরা নাকি নানার-বাড়ি যাব। তাই কাপড় কাচতে বেলা হল।'

'আকলিমা বুড়ী কি দেয় তোমাকে?'

'সারাদিন ভেড়া চরালে এক কেজি গম আর আড়াইশো অড়হর কিংবা ছোলার ডাল দেয়। প্রথম প্রথম রোজ দিত। এখন আবার হপ্তা-কাবারী দেয়—হপ্তা ভরের মাল বাকি আছে। চাষী গোলাম নবী বুড়োও হাড়-কিপ্পিন। মায়ের রোজের দাম দেয় না সহজে।'

'তোমার মা ঐদিকে শহরের পাদদেশে পর্বতের নিচের গমক্ষেতে কাজ করে, না?'

'হ্যাঁ, তাকে দেখেছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল্ সিরাজ। বলল, 'তোমার আব্বা কি কাশ্মীরী না পাঞ্জাবীলোক ছিলেন?

'কাশ্মীরী। আমি আর মেষ চরাতে আসব না—নানার-বাড়ি চলে যাব। মা বলেছে, নিশান গাঁও বস্তির মোল্লা-মৌলবীরা আমাদের দেখতে পারে না।'

'তোমার নানা কি করেন?'

'সে বুড়ো গালিচা-শিল্পী। চোখে চশমা, বাঁকা বড় নাক। লম্বা গলা। মাথায় টুপি। লম্বা আলখোল্লা আর ওয়েস্ট কোট পরে আফগানীদের মতন। গরিব লোক। তবু তার বাড়ি আছে। ছোট মতন একটা আপেল বাগান আছে। আমরা সেখানে চলে যাব। তবে সে জায়গা সেই উত্তরে—অনেক দূর। ঝিলম নদী পার হতে হয়।'

'তোমরা ভাড়া বাড়িতে থাক?'

'হ্যাঁ। কুড়ি টাকা ভাড়া। দিতে দেরি হলে বাড়িঅলি বুড়ী আমাদের কাঁথা-কম্বল সব দূর দূর করে উঠোনে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর ছাদ-ফাটা শ্যাওলা-ধরা পুরোনো সাবেক কালের বাড়ি—পানি হলে ঘর ভেসে যায়।'

'তোমার ঠোঁট শুকনো কেন? আকলিমা বুড়ী বুঝি আজ নাস্তার রুটি-হালুয়া দেয় নি? ঘর থেকে কিছু খেয়ে আস নি?'

মাথা নাড়ল লায়লা।

মেয়েটার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে দয়া হল সিরাজের।

'রাত্রেও মা কিছু রান্না করে নি। কিছু ছিল না।'

'তোমার মুখে এই রকম করে আঁচড়ে দিয়েছে?' আঙুল বুলিয়ে দেখল সিরাজ।

মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল ভুলে-যাওয়া কান্নার জের টেনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কি চমৎকার ভ্রু আর চোখ এই মেয়েটির। অনাথা মেয়ে। ওর বাপ কি দেখতে পাচ্ছেন নিজের কিশোরী অভুক্ত মেয়ের এই দুর্দশা?

মানুষ মরে গেলে সবই ফুরিয়ে যায়।

সিরাজ বলল, 'কাশ্মীরের এত বৈভব, এত ফল-পাকড়, তবু দারিদ্র্য কেন মানুষদের মধ্যে? আচ্ছা খুকী, তুমি কিছু খাবে? আমি এনে দোব?'

লায়লা এক অবিশ্বাসী চোখে তাকাল। হয়তো সন্দেহ করল কোনো কিছু।

সিরাজ বলল, 'অবশ্য তোমাকে যে খাবার এনে দোব তার বিনিময়ে কোনো কিছু দাবি করব না। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যও আমার নেই। তোমার আব্বা হাবিলদার আবদুল হামিদকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তাঁর মেয়ে তুমি, ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছ জেনে কি চুপ করে থাকতে পারি? এনে দিই তোমাকে কিছু খাবার। তুমি এখানেই থাকো, এখনি আমি ফিরে আসছি। হাট-বাজার কোনদিকে বলো তো?' আঙুল বাড়িয়ে দিক নির্দেশ করল লায়লা। লায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পুবদিকে হাঁটতে শুরু করল সিরাজ।

চারণভূমি পুবের দিকে কম, উত্তরেই বেশি জায়গা। মিনিট কুড়ি হাঁটার পর সে একটি শহরতলির মতো পল্লীতে এলো। ছোটোখাটো কলকারখানা আছে। হাট-বাজার, দোকানপাট আছে। একটা হোটেলে ঢুকল। রাঙা টুপী মাথায় একটি বুড়ো তনদুর রুটি শেঁকতে শেঁকতে ফারসী বয়েৎ পড়ছে।

সিরাজ কি নেবে বুড়োর ছেলে শুধোল। মনে হল এরা বিহারী বা উত্তর প্রদেশের লোক। সিরাজ খান আষ্টেক রুটি, ভেড়ার মাংসের চাপ বা রোস্ট আর কতকগুলো গুলগুল্লা নিল। হালুয়ার পাটালি নিল। ভাল আপেল নিল এক কিলো, মাত্র দু-টাকা দাম। আঙুর নিল এক ঠোঙা। তারপর সে হাঁটতে লাগল।

জুম্মার নামাজ পড়ে মানুষরা ফিরে আসছে যে-যার বাড়িতে।

ঝোলার মধ্যে খাবার। কাগজপত্রগুলো হাতে নিয়েছে।

মামী তার জন্য আহার্য নিয়ে বসে থাকার পর ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

রিজিয়াও খুব বিস্মিত। ভাববে, লোকটা পাগল নয় তো!

সিরাজ বলতে লাগল, 'আমি তো বলি নি খাব। রিজিয়া তোমাদের বাড়ি যদি খেতাম দুপুরে আর বিকেল তোমার সাথে আর্টস সেণ্টারে চলে যেতাম তবে লায়লার এই দুর্ভাগ্য তো যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম না। আমিও তো ক্ষেতখামারের কাজ করেছি ছোটবেলায়—রোদে পিঠ পুড়ে যায়—দূর থেকে ঐ দেখতে ভাল লাগে। ওরা কেমন কাজ করছে!'

মনে হল যেন এত দিনের পর একটা সৎকাজ করার সুযোগ পেয়েছে সে।

সিরাজ ঘড়ি দেখল প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল।

এসে দেখল, লায়লা একটা পাথরে বসে খেজুরগাছে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। হাতে তার পাচনবাড়ি। একটু দূরে মেষ চরে বেড়াচ্ছে।

শহরের দিকে একটা মিছিল চলেছে দূরের গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। স্লোগান শোনা যাচ্ছে : 'ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও।'

ক্লান্ত চোখে মিছিলটার দিকে তাকিয়েছিল লায়লা। রাখাল বালক-বালিকারা ছুটে চলেছে মিছিলের লোকজনদের দেখতে।

কাছে আসতেই লায়লা যেন চমকে সোজা হয়ে বসল। সত্যি লোকটা এলো!

খাবারগুলো পাথরের ওপরে রাখল সিরাজ। বলল, 'নাও খাও, তুমি। বাব্বা! তোমাদের এখানে দোকান-পাট কত দূরে! খাও, লজ্জা কি!'

'তুমি খাবে না?'

'হ্যাঁ, খাব বৈকি। দুপুরে তো এক বাড়িতে খাবার কথা ছিল—পালিয়ে এসেছি। না এলে তুমি যে এই রকম না খেয়ে কেঁদে-কেটে পড়ে আছ জানতে পারতাম কি?'

'তুমি বোধ হয় ফেরেস্তা?' খেতে খেতে বলল লায়লা।

সিরাজ বলল, 'ফেরেস্তাদের তো শরীর নেই, তাদের খেতে হয় না—যাদের খেতে হয় আর খাবার কোনো সংস্থান নেই তাদের কষ্ট ফেরেস্তারা কি বুঝতে পারে?'

'তুমি খালি ছবি আঁকো?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে চলে? তোমরা বুঝি বড়লোক?'

'না। ছবি এঁকেই চলে যায়।' আমি হাজার, দেড-হাজার টাকা পাই।'

'হাজার দেড-হাজার!' মাথায় হাত দিল লায়লা।

'কোনো মাসে আবার পাঁচ-ছশো টাকাও হয়। আমার তো সবে নাম হয়েছে—পরে আরো পাব। নাও, এইগুলো সব খেয়ে নাও।'

'তুমি আরো খাও—আমি এত খেতে পারব না।'

'খুব পারবে। কাল থেকে খাওয়া হয়নি।'

'না না। তুমি এই আপেলটা আর গোটা কতক আঙুর খাও।'

'বেশ খাচ্ছি।'

'আমার নাম কি জিজ্ঞেস করলে না তো?'

লজ্জা পেল লায়লা। খাওয়া-দাওয়ার পর যেন শরীরে মনে একটু তৃপ্তি পেলে সে।

'আমার নাম সৈয়দ সিরাজ। কলকাতায় বাড়ি। আমার আঁকা চারখানা ছবি আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েছে তোমাদের এখানে।'

লায়লা বলল, 'আচ্ছা, তুমি যে মানুষ জীবজন্তুর ছবি আঁকো, তাদের কি প্রাণ দিতে পার?'

'বোকা মেয়ে। আল্লা যা দিয়েছে তারই নকলনবীশী করি আমরা। মেঘের রঙ, ফুলের রঙ দেখে আমরা রঙ তৈরি করতে শিখেছি। আমাদের মাথায় ভেতরে, বুকের ভেতরে কত যন্ত্রপাতি কল-কব্জা আছে সেসব ডাক্তাররা জানে, খারাপ হলে যেমন হওয়া-উচিত তেমনি করে সারিয়ে দেয় কিন্তু নতুন একটা জীবন্ত মানুষ তৈরি করতে পারে না। অবশ্য টেস্ট টিউবে মানুষ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। সেসব তুমি বুঝতে পারবে না, অনেক লেখাপড়া জানলে তবে বুঝবে।'

'আমার আব্বা থাকলে আমাকে অনেক লেখাপড়া শেখাত।'

তোমার আম্মা বেশি লেখাপড়া জানলে সরকারকে ধরে সে ব্যবস্থাটা করতে পারতেন।'

'হুঁ। আম্মা আব্বার পেনসনটার জন্যে তাই কত ধর্না দিয়েছে।'

'তোমার জামা-কাপড় ময়লা, দুর্গন্ধ লাগে না? কতদিন ছাড়া ধোও?'

'মাসে একবার কাপড় কাচি আমরা। গরিব লোক। বেশি কাপড়-চোপড় নেই।'

'কদিন ছাড়া গোসল করো?'

'এমনি মুখ-হাত-পা ধুই। সপ্তায় একবার গরমপানি করে গোসল করি।'

'শীতকালে যখন বরফ পড়ে তখন খুব কষ্ট হয়, না?'

'উঃ! হাড় কনকন করে। আমরা আর বেরুতে পারি না। সব সাদা হয়ে যায়। তখন ঘরে বসে সেলাই আর কাঠের নক্‌শার কাজ হয়।'

'এবার তোমার ছবি আঁকব?'

আঁকো! কিন্তু কাউকে দেখাবে না—কাগজে বেরুলে মোল্লা-মৌলবীরা আমাদের বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

'না, কাউকে দেখাব না, ওঠো, এই গাছের ধারে এমনি করে দাঁড়াও।'

লায়লা বাধ্য হল। তাকে হাসাতে লাগল সিরাজ।

কয়েকখানা ছবি আঁকল সে নানান ভাব-ভঙ্গিতে। ছবি আঁকা রেখে শেষে মেষ চরানো বালিকার সঙ্গে খেলে বেড়াল। লায়লা খুব খুশী।

বেলা পড়ে আসতে ভেড়া-ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে উত্তরের বাগ-বাগিচার ভিতর দিয়ে চলে যাবার সময় লায়লার সঙ্গে কিছুদূর এলো সিরাজ। এক সময় বললে, 'আচ্ছা লায়লা, আজও যদি তোমাদের রান্না না হয়?'

জিভ ভাসাল লায়লা। অর্থাৎ, না তা হয় না।

বলল, 'মা আজ রান্না করবেই। চাষী গোলাম নবী যদি আজ টাকা না দেয় তো মা বুড়োর পেটে গুঁতো মেরে এই রকম ধনুক বাঁকা করে দেবে তার চেহারাটাকে।'

সিরাজ খুব হাসল। বলল, 'তোমার মা খুব রাগী লোক নাকি!'

'না। তবে রেগে গেলে মুশকিল! একবার এক মৌলবীর কাস্তে দিয়ে কান কেটে নিতে গেছিল···সে নাকি আমার মাকে—?'

'কি হয়েছিল বল বল।'

লজ্জা পেল লায়লা। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'নিকে করতে চেয়েছিল।'

'ওঃ।' হাসল সিরাজ।

এবার বিদায় নিতে হবে। বলল, 'লায়লা, একটা জিনিস তোমাাক দিচ্ছি, চোখ বন্ধ করে হাত পাত।'

লায়লা অবাক হল। মেষগুলো আখরোট গাছের তলায় পাতা কুড়িযে খাচ্ছে। হাত পাতল সে।

সিরাজ পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিয়ে মুঠোটা চেপে বন্ধ কবে দিল। লায়লা প্রথমে নিতে চাইল না। যাবার সময় বলল, 'আমাদের বাডি ঠিক যাবে?'

'হ্যাঁ, তোমার মাকে আমার আদাব দিও। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে একদিন দেখা করে আসব।'

'আচ্ছা, আদাব।' লায়লা মুঠো করা টাকা ধরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম জানিয়ে মেষ তাডাতে তাডাতে চলে গেল।

সিরাজ অন্ত পথে শহরের দিকে ফিরল।

॥ ৮ ॥

শ্রীনগর শহর আলোয় আলো। সন্ধ্যাবেলাটা বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। মামার দোকানে এসে বসল সিরাজ।

আলী হোসেন একখানা শাল মুড়ি দিতে দিলেন। বললেন, 'তোর ক'খানা ছবি বেরিয়েছে আজকের 'নওরোজ' পত্রিকায়। পত্রিকা অফিস থেকে আমার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে অনেকেই ফোন করেছে। কেননা পত্রিকায় জানানো হয়েছে শিল্পী এখন শ্রীনগরে আছেন।'

সিরাজ বলল, 'লাও, ঠেলা সামলাও। আগল-পাগলয়া সকলে এসে হাজির হোক।'

'হোক না। হ্যাঁরে, দুপুরে খেতে গেলি না, কোথায় খেলি?'

'খাওয়াই তো হয়নি—মাঠে মাঠে প্রকৃতির শোভা দেখে ঘুরেছি।'

'শোনো কথা। এই রহমান, খাবার এনে দে তো। কি খাবি?'

হঠাৎ ফোন এলো। নারী কণ্ঠ। ছবি সংক্রান্ত ব্যাপার! আলী হোসেন ফোনটা দিল সিরাজের হাতে। 'হ্যালো, বলছি আমি—হ্যাঁ, আমিই সৈয়ব সিরাজ।'

অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেল:

'কি ব্যাপার বলুন তো—হঠাৎ যে চলে গেলেন—দুপুরে আমরা খাবার নিয়ে আপনার অপেক্ষায় বসে রইলাম।'

'তুমি বলেছিলে শিল্পীদের একটু খেয়ালী হওয়া উচিত। তাছাড়া ভয়ে পালিয়ে এলাম!'

'ভয়! কিসের ভয়!'

সিরাজ আর কিছু বলল না।

'কিসের ভয় বলুন না?'

'বুঝে নাও।'

'ওঃ! ধ্যেৎ! ওসব কেউ বলে!'

'তুমি রাগ করো নি?'

'হ্যাঁ, খুব! কি কাণ্ড করলেন বলুন তো! বন্ধুদের কাছে অপদস্থ হলাম।'

'কাল যেতে পারি।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাহলে কোথা থেকে আপনাকে আমি নেবো?'

'আমার মামার দোকান থেকে। ৪০ নং মৌলানা আজাদ রোড।'

'কাল বেলা তিনটে।'

'আচ্ছা।'

'ভাইয়া আজ চলে যাচ্ছে দিল্লীতে।'

'আদাব জানাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনার কলকাতার ঠিকানা?'

'পরে জানাব। তোমার আম্মাকে রাগ করতে বারণ করো। খাব একদিন তোমাদের বাড়িতে—চলে যাবার আগে। ছেড়ে দিলাম।'

'আচ্ছা, আদাব আরজ।'

ফোন রেখে দিল সিরাজ।

নানান ফলের কুঁচো দিয়ে তৈরি করা কেক এনে দিতে সে খেতে লাগল।

সামনের পথ দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া আর বিচিত্র চেহারার মানুষজন চলেছে।

সামনের দোকানটাতে সবুজ বোরখা-পরা দুটি মহিলা সেলসম্যান বসে আছে। কলকাতার নিউ মার্কেটে কাশ্মীরীদের এরকম নকশার-কাজ-করা জিনিসের থান দুই দোকান আছে।

কাশ্মীরীরা নকশার কাজে সিদ্ধহস্ত। হাড়, কাঠ, কাপড়, পাথর, মাটির পাত্র— সবেই এরা সুন্দর সুন্দর নকশার কাজ করে।

মামা আলী হোসেনের ঘরে দামী দামী কাঠের নকশার-কাজ-করা আসবাব-পত্র আছে।

রিজিয়াদের যে ঘরে তাকে বসতে দিয়েছিল চন্দনকাঠের আসবাবের জন্য সুগন্ধে ভরপুর ছিল।

সিরাজের মন বলে উঠল, কোথায় সেই গরিব শিল্পীরা—যারা সারাদেশ জুড়ে এইসব কারুকার্য করে—তাদের তো দেখা উচিত।

তাদের মধ্যে যেতে হবে।

আলী হোসেন এলেন। ভেতরে একটা ঘর দেখালেন। বললেন, 'এখানে

আমি মাঝে-মধ্যে বসি। তাস-পাশা খেলি বন্ধুদের সঙ্গে—যখন খুব ঠাণ্ডায় সারা কাশ্মীর বরফ পড়ে সাদা হয়ে যায়। গরিব মানুষরা তখন বেরুতে পারে না। গরিব ধনী সবাই তখন হাড় কনকনে ঠাণ্ডায় ঘরের মধ্যে লুকোয়। ধনীদের অবশ্য ফায়ার প্লেস আছে, হিটার আছে, গরিবরা কাঠ-কয়লা বা কয়লা জ্বালাবার পয়সার অভাবে শীতে কষ্ট পায়।'

সিরাজ বলল, 'কাশ্মীরে কারুকাজ তাই সম্বল হয়েছে ঘর থেকে বার হতে না পারার জন্য। ঘরে-বসে-থাকা মানুষরা কি করবে? তাই হাড় চেঁছে, কাঠ কেটে তাতে নকশা করে। শাল বা পশমী কাপড়ে নকশা তোলে। গালিচা বোনে। তাই টুপিতে নকশা। পীরহার, তহবন, আলখাল্লা, সেমিজ, কামিজে নকশা। আচ্ছা মামা, আমাদের পশ্চিম বাংলার মতো এখানেও শিমুল জাতীয় প্রকাণ্ড উঁচু গাছে পাতাহীন অবস্থায় অজস্র ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম, ওটা কি গাছ?'

মামা একটু ভাবলেন, বললেন, 'বোধ হয় চেনার গাছ।'

'এত সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বোধ হয়, না মামা।'

'আছে, সুইজারল্যাণ্ডও এমনি সুন্দর।'

'বিরাট পর্বত, মাথা সাদা ধপধপ করছে, নিচে ছোট ছোট গাছপালা, কেমন মোহময় ছায়া ছায়া ভাব, সরসীর জলে গাছের প্রতিচ্ছবি, সূর্যের রেখা, সুন্দর শিকারা, দরিদ্র মানুষদের মধ্যে গলাবন্ধঅলা বুক-চেরা লম্বা জামা-পরা কিশোরী মেয়ের অপূর্ব চোখ মুখের ভাব, লেকের জলের ওপরে সুন্দর কাঠের ঘর—মামা, ইচ্ছে করে সারা জীবন আমি কাশ্মীরে থাকি আর সারা প্রদেশটা ঘুরে ঘুরে দেখি।'

'বেশ তো, থাক তুই। আমারও তো কেউ নেই, তুই থাকলে আর একটা দোকান করে দিতে পারি। আমার পরিচয়ে তোকে বসিয়ে দোব—মহাজনরা শাল, গালিচা, কম্বল, কাপড—সব কিছু দিয়ে যাবে বাকিতে, বিক্রি হলে পরে পরে দাম দিবি। ফাইভ পারসেন্ট গভর্নমেণ্ট ট্যাকস, ফাইভ পারসেণ্ট সেলস ম্যানদের আর ফাইভ পারসেণ্ট তোর। এর ভেতরে বাজারের উঠতি পড়তি আছে। কাঁচা-পাকা মালের ধন্ধগিরি আছে।'

'না মামা, আমার দ্বারা বোধহয় ব্যবসা হবে না। গরিব হয়ে, শিল্পীর কাজই আমি করব।'

'ওরে বাপ, কাশ্মীরেও শিল্পীর অভাব নেই। পথে ঘাটে এখানে ওখানে শিল্পীরা ছড়িয়ে আছে। একটা সাধারণ মানুষ এমন নকশা এঁকে দেয় যে তাজ্জব হতে হয়। তুই যদি ভাল নকশা আঁকতে পারিস—এখন আধুনিক শিল্পীরাও

নানান ডিজাইন এঁকে দিচ্ছে,—এখানে থাকলে, দামী একটা চেম্বার করলে, শিল্পী হিসাবেও কদর পাবি। দেড় শো টাকার ছবির জন্য কলকাতার পাবলিশারদের মতো এখানে পঁচাত্তর কিংবা আশী টাকা নিন না, বলে সোনাকে রাং করে দেবে না।'

সিরাজ চুপচাপ বসে রইল।

মামা বললেন, 'বাঙালীদের ভাল মানুষীর কথা আর বলিস না। শাক-ভাত-খাওয়া আমাশা-রোগী। তবু তারা প্রতিভা বা বুদ্ধি-মেধা নিয়ে পৃথিবীর চার-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে—অনেকেই নাম করেছে।'

'এখানে বসে আঁকলে…'

'বেশ তো, থাকতে পারিস কিন্তু কেন বল তো দুপুরে গেলি না, তোর মামীর সঙ্গে কোনো মতবিরোধ ঘটেছে নাকি? রাত্রে বাড়ি যাবি। এখানে দিনে বসে কাজ করবি—রাত্রে বেরুতে পারবি না। দোকানে তো কেউ থাকে না। পুলিস পাহারাদার আছে। কলকাতার মতো এখানে বড ধরনের ডাকাতি হয় না। আসলে এখানের এ-ঘরটা আমার গোপন-ঘর। এখানে যেমন মহাজন বা বন্ধুরা বসে তেমনি দেশের নাম-করা ব্যক্তিরাও বসেন। রাজনীতির নানান দলের প্রতিনিধিরা আসেন, চাঁদা দিতে হয়—মদ খাওয়াতে হয়। নামকরা গুণ্ডা-বদমাশদের হাতে রাখতে হয়।'

সিরাজ দোকানটাকে কেমনভাবে সাজানো যায় তার জন্যে একবার বাইরেটা দেখে গেল। মাপ নিয়ে নিল।

রাত ন'টা পর্যন্ত সে যা এ কেজুকে দাঁড করাল দেখে মামার খুব পছন্দ হল। বললেন, 'ঠিক আছে, এরকম করে আমি সাজিয়ে নেবো। চল, এখন বাড়ি যাই।'

বাইরে হিম রাত্রি। গাছপালার মধ্যে আলো। পথে লোকজন গাড়ি-ঘোড়া কমে গেছে।

বাসায় ফিরতে মামী তাকে একবার দেখল। বলল, 'সারাদিন তুমি খেতে এলে না সিরাজ, কোথায় ছিলে, না খাবে তো আমাকে বললেই পারতে।'

সিরাজ কোনো কৈফিয়ত দিল না।

চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হল।

নিজের ঘরে এসে গরম বস্ত্রের মধ্যে শরীর ঢোকাতেই তার দুচোখ জুড়ে ঘুম এলো।

॥ ৯ ॥

এক দুপুর মামার ঘরে যত কাশ্মীরী পত্রপত্রিকা ছিল সেসব দেখল সিরাজ।

দুপুরে সে আহারাদি করল মামার সঙ্গে। মামী কি রকম গম্ভীর। মামাব বিশ্রাম করার সময় ঝোলা আর শাল কাঁধে নিয়ে বের হল সিরাজ। গাডিতে উঠল না। হেঁটে হেঁটেই মাইলখানেক দূরে মামার দোকানে এলো।

দোকানের ক্যাসিয়াব ভেতরেব কামরাটা খুলে দিল। কফি পাঠাল একটু পরে।

ঠিক তিনটের সময় এলো রিজিয়া।

আলী হোসেন সে-সময এসে পডেছিলেন। মেয়েটিকে তিনি ভালই চিনতেন, বললেন, 'কি মা-জননী, তোমাব আব্বার তবিয়ৎ ভাল আছে তো?'

'জী হ্যাঁ আপনি ভাল আছেন তো?'

'আর আল্লার মরজি। সিরাজ আমার ভাগ্নে, এসো মা ভেতরে আছে ও।'

দোর খুলে দিতে ঢুকে গেল রিজিয়া। সুইমিং ডোর এঁটে গেল।

খাটের ওপর বসেছিল সিরাজ তাকিয়া ঠেস দিয়ে। রিজিয়া আদাব জানাতে সোজা হয়ে বসল। রিজিয়া বসে পডল। নিভৃত এই কক্ষ, ওবা কি ভাববেন! তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বসল, 'চলুন তাহলে।'

'হ্যাঁ, ওঠা যাক।'

দুজনে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। রিজিয়া হেসে বিনয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম জানিয়ে গেল আলী হোসেনকে।

মোটর এনেছে রিজিয়া—তাদের সেই সবুজ রঙের দামী মোটর—কালো রঙের বেহারী একটি বুড়ো ড্রাইভার।

নানান দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে পার্বত্য উপত্যকা বেয়ে ফাইন আর্টস সেণ্টারের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি। লাল রঙের গম্বুজ বিশিষ্ট বাড়ি।

তারা নামতেই অনেকে ছুটে এলো।

জনা কুড়ি ছেলেমেয়ে সিরাজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে একটি সিংহাসনের মতো সুন্দর কারুকাজ-করা চেয়ারে বসিয়ে সকলে মাল্য

ভূষিত করল। ফটো তুলল অনেকে। সংস্থার সেক্রেটারী প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে দলবলসহ সমস্ত ছবি বা শিল্পকাজ দেখাতে নিয়ে গেলেন।

সিরাজ মুগ্ধ অবাক চোখে দেখতে লাগল। কাশ্মীরের মুসলমান শিল্পীদের এত মনোরম কারুকার্য থাকতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে কোনোদিন কি ভাবতে পেরেছিল সিরাজ?

এসবের তুলনায় নিজের প্রদেশের স্বসম্প্রদায়ের লোকদের মনে হয় দীন দরিদ্র ভিখারী! তারা কি নিয়ে আছে তাহলে—চাষ-আবাদ, কলকারখানা, ছোট ছোট ব্যবসা আর বেকার জীবন।

মোগল যুগের বহুচিত্র তার মন হরণ করল। আধুনিক যুগের ছবি দেখে সে মুগ্ধ হল না। বিদেশী ছাপ পড়েছে।

সমস্ত মিলিয়ে নকশার কাজের প্রয়োজনভিত্তিক প্রাধান্যই এখানে বেশি।

ফিরে এসে বসল সিরাজ।

সেক্রেটারী-বুড়ো চলে গেলেন।

বিচিত্র পোশাক-পরা পার্শী মেয়ে ইসমৎ পাল্কীওয়ালা খুব ঢং দেখিয়ে হাসে। বসে গা দোলায়। তাকায়। সে-ই ছেলেদের মাতিয়ে রাখে।

সবাই তাদের আঁকা ছবি দেখাতে লাগল একে একে। রমজান, আখতার, অজিত, শরিফ, রিক্তা, রউফ, আকলিমা, ছন্দ, রেহানা, জয়ন্ত—সবাই যৌবনের প্রতীক। প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে।

শুধু একজন গরিব—তার পোশাকও সাধারণ কিন্তু তার ছবিই সিরাজের প্রশংসা পেল বেশি।

ভ্যানগগ, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, মাতিস, নানান শিল্পীর জীবনকথা বলল সিরাজ। তার স্বাক্ষর নিল সকলে।

আবদুর রউফ বলল, 'আমি বছর পাঁচেক কলকাতায় ছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, জয়নুল আবেদিন, সত্যজিৎ রায়—কত শিল্পীর ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।'

আটটার পর ঘড়ি দেখল সিরাজ। রিজিয়ার খরচে চা-পানির ব্যবস্থা হয়েছিল।

হল ছেড়ে বেরুবার সময় পাল্কী হাত ধরল। বলল, 'চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'ওই পর্বতের তলা দিয়ে হাঁটা পথে—ওদিকে চমৎকার জঙ্গল। সুন্দর চাঁদের আলো—অথবা নদীর ধারে যাবেন? শিকারা ভাড়া নিয়ে আমরা নদী-বিহার করব।'

রিজিয়া হাসল।

'ইচ্ছে করে আপনাকে নিয়ে কোথাও পালাই। কিন্তু আপনি এমন গম্ভীর কেন? আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?' পাল্কী বড় বাচাল মেয়ে।

রিজিয়াদের মোটর চলে গিয়েছিল।

ওদের কাছ থেকে বিদায় চাইল সিরাজ। সবাই কেটে পড়তে বাধ্য হল যেন।

রিজিয়া সিরাজকে একটা টাঙ্গাতে তুলল। তারপর কোথায় যেতে বলল সেই জানে।

আকাশে চাঁদ আছে, তবু কুয়াশায় যেন একটা ধোঁয়াটে ভাব। চেনার আখরোট, চেরি, পাইন, ঝাউ পপলার ইত্যাদি গাছের নিচে দিয়ে টাঙ্গা চলেছে।

রিজিয়া বলল, 'শীত লাগছে না?'

'হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছি আমরা—পাহাড়ের দিকে তো?'

হাসল রিজিয়া। বলল, 'আমাদের একটা ফলের বাগান আছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে। বেদানা, ডালিম, আখরোট, চেনার, চেরি, নাসপাতি, আপেল, আলুবোখরা, লেবু, সফেদা, বাদাম, পেস্তা—সব রকমের ফলের গাছ আছে। একটা কাঠের কুঠিবাড়ি আছে পুষ্করিণীর ওপরে। সেখানে যাচ্ছি।'

সিরাজের হাত দুটো কনকন করছিল। রিজিয়ার হাত ধরল। রিজিয়া ওর গায়ে ঠেস দিল।

সে গান করছিল গুনগুন করে। আরবী গানের ঢং।

সিরাজ বলল, 'প্রথম দিন যখন দেখি, তোমার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছিল, তার সঙ্গে এখন দেখছি তেমন মিলছে না।'

কাঁধে মাথা রেখে রিজিয়া বলল, 'কি রকম ধারণা শিল্পী?'

'যেমনটা আমাদের প্রদেশে হয়, অথবা তার চাইতেও বেশি—ধর্মীয় বা সামাজিক প্রভাবে তুমি বোধহয় একটু গোঁড়া হবে।'

'অর্থাৎ?'

'ঐ যে গো তোমাদের মেয়েদের মধ্যে যা থাকে—সতীপনা যাকে বলে—'

'সেটা অবশ্যই আছে।' হাসল রিজিয়া।

সিরাজ গম্ভীর হল। বলল, 'এখন বাগান দেখতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

'শহরের আলো দেখতে দেখতে আমার চোখের তারা জলে গেছে। আমি এই গ্রামীণ অন্ধকার ভালবাসি। চলুন, নামা যাক—এই আমাদের বাগান।'

দুজনে নেমে বড় বড় সারিবদ্ধ গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটল কিছুক্ষণ। সামনে একটা ছোট্ট কুটির। ঘোড়ার হ্রেসাধ্বনি শুনতে পেল। দু-তিনটি ঠেলা-গাড়ি পড়ে আছে।

কুটিরের দোরে ঘা মারতে একজন বুড়ো বেরিয়ে এলো। রিজিয়াকে দেখে খুশী হয়ে সালাম জানাল।

চাবি চাইল রিজিয়া। বুড়ো তার ঝোলা জামার নিচের জামা থেকে চাবির গোছা বার করে দিল।

'কি খাবার করছ গো তোমরা'—রিজিয়া ভেতরে ঢুকে গিয়ে এক লোলচর্ম বৃদ্ধার সামনের চুল্লী থেকে রোস্ট-করা ভেড়ার ঠ্যাং তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে আবার ফিরে এলো। বলল, 'বুড়ো-বুড়ী খুব বাধ্য লোক, ভাল লোক। দাদুর আমল থেকে আছে।'

একটা পুল পার হয়ে জলটুঙ্গিতে এসে ঘরের দোর খুলল রিজিয়া। অন্ধকার। কেমন যেন গুমোট গন্ধ।

'পেট্রোম্যাচ জ্বালুন।'

মোটা লাল রঙের মোমবাতি জ্বেলে দিল রিজিয়া।

সোফা, কোচ, বিছানা দেখতে পেল। দেয়ালে তেল রঙের ছবি।

'সপ্তাখানেক আগে আমরা অনেক বন্ধু-বান্ধবী মিলে এসেছিলাম। আস্ত একটা ভেড়াই খেয়ে গেলাম!! ভাইয়াও ছিল।'

'আজ তো ভাইয়া নেই!'

'তাতে কি! বসুন এই ঈজি-চেয়ারটাতে। আসছি আমি।'

রিজিয়া চলে গেল।

সিরাজ উঠে বারান্দায় বেরিয়ে আকাশের চাঁদ-তারা-ভরা অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল বাগানের গাছপালার ভেতর দিয়ে। অন্ধকারে চকচক করছে জলটা।

বুড়ো-বুড়ীকে নিয়ে মিনিট পনেরো পরে ফিরল রিজিয়া। একটা কাঠের থাঞ্চায় করে এনেছে মাংস, ফল আর কফি।

রিজিয়া বলল, 'ওদের আহারটা কেড়ে নিয়ে এলাম—ওরা আবার করবে। নিন খান।'

বুড়ী সিরাজকে দেখে তামাশা করে কি সব যেন বলল রিজিয়াকে। রিজিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে নাচাল খানিকটা।

সিরাজ বুঝল তা। বোধহয় বুড়ী মস্‌কারা করে বলছে, 'এই ছোঁড়াটা তোমার বর হবে—বাঃ! বেশ দেখতে। একে নিয়ে আজ রাতে থাকো। কালকে আমার বুড়োকে বলব, কোরআন পড়িয়ে সাদি দিয়ে দেবে।'

বুড়ো-বুড়ী চলে গেল।

হিম আসছে—দোরটা বন্ধ করে দিল রিজিয়া।

ভেড়ার রোস্টটা চমৎকার লাগছিল সিরাজের।

রিজিয়াও খেতে লাগল। বলল, 'বলুন, আপনাব সেদিন কি হয়েছিল, হঠাৎ পালিয়ে এলেন যে?'

'হঠাৎ একটা কীর্তি করে ফেলে আমার যা ভয় করতে লাগল। ভাবলাম, হয়তো বা তুমি তোমার মাকে বলে দিতে গেছ।'

'উঃ! কী মজা! কী ভীতু!' রিজিয়া উচ্ছল উদ্দাম হয়ে বলল, 'পাম্মী শুনে বলল, কলকাতার ছেলেটাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে একটু চালাক করে দে। না পারলে বলিস।'

'আমাকে কি বোকা লাগে নাকি।'

ঈজি চেয়ারের হাতলে বসে গালে খাইয়ে দিতে লাগল রিজিয়া।

ওকে কি হাত দিয়ে একটু ধরবে?

হঠাৎ তার গমক্ষেতের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ল।

লায়সার মুখটাও।

বলল, 'কতক্ষণ পরে আমরা ফিরব?'

'যদি না ফিরি?'

অবিশ্বাস্যভাবে হাসল সিরাজ। বলল, 'মামা তো দেখেছেন তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি—কাল খুব ক্ষেপাবেন।'

'এই সবে আপনি ভয় পান বুঝি?'

'তোমার মা-বাবা বকবেন না?'

'কেন, আমি তো মিথ্যে কথা বলি না।'

'আমার সঙ্গে বাগানবাড়িতে এসেছ, সেকথাও কি বলবে নাকি?'

'আম্মাকে তো বলেই এসেছি। জানেন, আম্মা আপনাকে ভীষণ পছন্দ করেছেন।'

'তাই বুঝি!'

'আপনি থেকে যান কাশ্মীরে।'

'ভাবছি তাই। মামুও বলছেন।'

সিরাজ কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল। ইচ্ছে করছিল ওকে ধরে চুম্বন করে, কিন্তু ওকে বোঝা দরকার। হাত ধরে সামনে এনে বলল, 'আমার তো চাল-চুলো নেই, রোজগারের ঠিক নেই, তাছাড়া আমাকে রোদে-জলে-পোড়া দরিদ্র জীবনের ছবি আঁকতে হবে, বিলাসবহুল জীবনের স্বাদ পেলে আমি যেন কেমন করে সেটা হারিয়ে ফেলি। রিজিয়া চলো, ফিরে যাই—আমাকে একটু ভাবতে দাও। দু-একদিন পরেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব—অনেক কাজ আছে।'

রিজিয়া হঠাৎ যেন আহত হল। সরে বসে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল একটু। বলল, 'বেশ, চলুন।'

আলো নিভিয়ে দোর এঁটে পুলটার ওপর দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ সিরাজ বলল, 'তুমি ড্রিঙ্ক করো? এখানে অন্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে রাত কাটিয়েছ?'

রিজিয়া বলল, 'ড্রিঙ্ক করেছি। ঠাণ্ডা জায়গায়, স্বাস্থ্যের কারণে এটা অনেকেই করে, তবে প্রকাশ্যভাবে নয়, ধর্মীয় নিষেধ আছে। এককভাবে কাউকে নিয়ে রাত কাটাইনি।'

টাঙ্গায় ফেরার সময় দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। শ্রীনগরে পৌঁছে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

সিরাজ ভাবল, আমি আধুনিকা চাই কিন্তু রিজিয়া কি কম আধুনিকা? তবে? ওকে কি নষ্ট মেয়ে বলে সন্দেহ করেছে সে? তবে কি রকম মেয়ে চায় সে? গ্রামীণ সাদামাটা সৎ এবং সতীমেয়ে? কে জানে—ভাবতে ভাবতে মামার বাসায় এসে যখন কড়া নাড়ল যখন তখন রাত সাড়ে এগারোটা।

সকালে মামার সঙ্গে দোকানে আসতে দর্জি কোট প্যাণ্ট দিয়ে গেল। ভেতরের ঘরে এনে মামা তাকে স্যুট পরালেন। বললেন, 'বাহা বাহা, রাজপুত্তুর হয়ে গেছিস! চল দেখি—জুতো জোড়াটা কিনে নিবি। ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মিশিস—আরে, ঐ বিখ্যাত ব্যবসাদারের মেয়েটা—রিজিয়া ওর নাম—ও মেয়েটাকে যদি পাস, মক্কা! দুই ছেলেমেয়ে। বিরাট বাগান। গালিচার কারখানা। বাড়িগাড়ি আছে।'

মামার সঙ্গে জুতো দোকানে এসে ঢুকল সিরাজ। সেখানে আবদুর রউফের

সঙ্গে দেখা হল। সে এসে করমর্দন করল: 'চিনতে পারছেন, গতকাল বিকেলে আর্ট সেণ্টারে আলাপ হল—আমাদেরই দোকান।'

রউফের বাপ-চাচার সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা খুব সমাদর করলেন। নাস্তা-পানি আনালেন।

দামী দামী জুতো বার করে আনলেন।

একশো পঁচিশ টাকার জুতো কিনে দিলেন মামা আলী হোসেন।

রউফ মামাকে বিদায় করে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখল সিরাজকে। দোতলায় তার স্টুডিওয় নিয়ে গেল। তার আঁকাজোকার কাজ দেখাল। বলল, 'রিজিয়াকে আপনার কেমন লাগল?'

সিরাজ বলল, 'লাগালাগির কি আছে, আমি তো খুব মাথামাথি করি নি। হঠাৎ না-বলে-কয়ে সন্ধ্যার পর ওদের বাগান-বাড়িতে নিয়ে গেল।'

'ওর একবার বিয়ে হয়েছিল, জানেন?'

'না তো!'

রউফ টেবিলে নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল। বলল, 'ছেলেটা খুব খারাপ ছিল না। ডাল লেকে শিকারায় একদিন সে হঠাৎ ওকে দেখে রমজানের সঙ্গে। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছিল। ছমাস গেল না। ওর হাজবেণ্ড ওকে শাসন করল ওদের বাড়িতেই। বোধহয় ঘা দুই চড মেরেছিল। ওর বাপ চাবুক মারলেন ছেলেটিকে। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে ছেলেটি আমার কাছে, এই ঘরে এসে, কি বিক্রম! রিজিয়ার-বাপ-বুড়োকে গুলী করে মেরে ফেলবে। শেষে খুব কাঁদল। বলল, রিজিয়াকে আমি এত ভালবাসতাম, শেষে সে যে আমাকে এমনভাবে ঠকাবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি! আমি গরিবের ছেলে কিন্তু আশী হাজার ছেলের মধ্যে তো ফার্স্ট হয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি। বাপের আমার দশটা ভেড়া আর পার্বত্য এলাকায় কাঠের বাড়িটুকু আছে। আব্বা কাঠের নকসার কাজ-করা মানুষ। রিজিয়ার বাপ তাকে স্বপ্ন দেখালেন আপনার ছেলের ভার দিন আমাকে, আমি তাকে বিলেতে পাঠাব।'

রউফ চুপ করে বসে রইল।

মুরগীর কাবাব আর সস্ দিয়ে গেল একজন কর্মচারী। স্কোয়াশ মদ বার করে এনে ঢালল রউফ। বলল, 'খান, ফলের কাৎ থেকে তৈরি, এ্যালকোহল আছে চব্বিশ পারসেণ্ট, নেশা হবে না।'

আপত্তি করল না সিরাজ। স্যুট আর জুতো পেয়ে মনটা তার ভাল আছে,

হঠাৎ মামীর কথা মনে হল। বেচারা বিষণ্ণ মনে দিন কাটাচ্ছে। বলল, 'তারপর ?'

রউফ বলল, 'তারপর আর কি ! সেই রাত্রেই সুইসাইড করল ছেলেটি।'

সিরাজ স্তব্ধ নির্বাক। রউফের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রউফ বলল, 'ছেলেটার নাম বোধহয় নাসির। তার বাপ এখন একমাত্র ছেলের শোকে পাগল আতুর হয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। রিজিয়ার বাপ পাকিস্তানের ভক্ত কিন্তু ওর ছেলে কাশেম খুব আপরাইট। থানায় টাকা ঢেলে জামাইয়ের সুইসাইডের ব্যাপারটা ধামা চাপা দিলেও রমজান তার বাপের তাড়নায় সরে গেল। এখন রিজিয়া কলেজ যায়, বেজায় ঘুরে বেড়ায় এর-তার সঙ্গে। বাগান-বাড়িতে নিয়ে যায় যাকে তাকে ! একদিন দেখলাম মুখে বসন্তর দাগ, রাফ রুক্ষ চেহারা, দক্ষিণ ভারতের একটা লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তাই নাকি !'

ফোনের ডায়াল ঘুরোতে লাগল রউফ :

'হ্যালো, পাপ্পী নাকি ? আমি রউফ বেগ বলছি—বেগ আবদুর রউফ ! উত্তর এলো, 'শালা, তুমি আবার একটা মানুষ ! চকচকে নতুন জুতোর আয়নায় তোমার মুখ দেখে দিন কাটে। এই ছেলেটা, কলকাতার সেই শিল্পী সিরাজ সাহেবকে না রিজিয়ার খুব পছন্দ, স্যাংগুইন সে ফ্যাঁদে ফেলবে। আহা বেচারী ! ওর এই রকম অন্য প্রদেশের ছেলে নাহলে গতি নেই।'

'সে গুড়ে বালি ! সিরাজ সাহেব কলকাতার লোক—ভয়ানক চতুর। তাছাড়া ওর মামা আলী হোসেন সাহেব শ্রীনগরে আছেন বহুকাল—সবই জানেন।'

সিরাজ ভাবল, তাই তো—মামা জানেন, তবে কেন বললেন, মেয়েটা ভাল, অনেক কিছু পেয়ে যাবি। মামা হয়তো বিষয়ের ওপরে দাঁড় করাতে চান তাকে।

'সিরাজ সাহেব কি নাইস দেখতে ! তবে যে শুনি বাঙালীরা তেমন দেখতে ভাল না। ভদ্দরলোকদের বিচিত্র চেহারা।'

'কেন রবীন্দ্রনাথকে দেখনি ?'

'আরও বলো।'

রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, নজরুল।'

'ইয়েস-ইয়েস। বাঙালী আর্টিস্ট কি চলে যাবেন আজ ?'

'কথা বলো ওঁর সঙ্গে।'

'হ্যালো'—ফোন ধরল সিরাজ।

'আপনি ওখানে বসে আছেন? স্যরি, আমি জানি না। রউফ এমন ব্লানডার করে।'

'তুমি বিকেলে এসো, আমাকে কাশ্মীর দেখাও, রউফ সাহেব বললে, তুমি নাকি খুব ওস্তাদ মেয়ে—অর্থাৎ শিখিয়ে-জানিয়ে দিতে পারবে।'

'বিকেলে কেন, এখনি তাহলে বেরুতে হবে। দুপুরে। কোথায় যাবেন, শ্রীনগর তো দেখেছেন। শিকারায় গেছেন? যান নি? পহেল গাঁও, গুলমার্গ, জম্মু, লাডাক এসব অঞ্চল দেখতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। থেকে যান আরো কয়েকদিন।'

'তুমি এসো, তারপর বিবেচনা করা যাবে।'

'আচ্ছা, আসছি।'

মামার দোকানের ঠিকানা বলে দিল সিরাজ। ফোন ছেড়ে দিল। সে উঠতে রউফও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওর মামার দোকান পর্যন্ত এলো। তারপর আদাব জানিয়ে চলে গেল।

সিরাজের নতুন বেশ দেখে দোকানের সবাই খুশী।

সিরাজ বলল, 'মামু, আমি আরো কদিন থাকছি। নানান জেলায় ঘুরে বেড়াব।'

'কার সঙ্গে, রিজিয়া যাবে?'

'না।'

'তবে?'

'পাক্কী বলে একটি মেয়ে।'

'ইসমৎ পাক্কীওয়ালা। ওর বাপ একজন বিখ্যাত মোটর ব্যবসায়ী আর ফিল্ম প্রডিউসার। আমার খদ্দের। রিজিয়ার সম্বন্ধে আমার আরো কিছু কথা বলার আছে। তোর যদি ভাল লাগে অবশ্য অন্য কথা। মেয়েটার দুর্ভাগ্য ঘটেছে।'

'শুনেছি মামু। আপনি ওর সম্বন্ধে কিছু ভাববেন না। পাক্কী সম্বন্ধে কিছু বলবেন?'

'ওকে আমি দেখেছি, খুব অস্থির, ছেলেদের সঙ্গে মারামারিও করে।'

'হাসল সিরাজ। বলল, 'ও আসবে এখনি। তাহলে, আচ্ছা মামা, আমাকে কি কি নিতে হবে?'

'পাক্কী এসে কি বলে দেখ।'

আধঘণ্টা পরেই পাক্কী এসে গেল ছেলেদের মতো প্যাণ্ট আর মোটা গেঞ্জি গায়ে, পিঠে একটা মোটা কার্পেটের ব্যাগ।

সিরাজ ওকে ভেতরে বসতে দিতে ও একটুক্ষণ বসে তারপর বেরিয়ে এসে পা ছড়িয়ে গুছোনো কম্বলের ওপর বসল।

সিরাজ নিজের ব্যাগ-ব্যাগেজ ঠিক করে নিল। মামা সাহায্য করলেন।

বেরুবার সময় বললেন, 'দেখো মা পাখী, সমতল ভূমির মানুষ সিরাজ, পর্বতে তুলে যেন পা ফুলিয়ে জ্বরে ফেলে দিও না।'

'ঠিক আছে, আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে যাচ্ছি, আর ফেরত দেব না।' বলে পাখী সিরাজের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছুটে চলল। সুন্দর ডিলাক্স বাস। ঝকঝকে পথ। জানালার ধারে জায়গা পেল সিরাজ। অপরূপ নিসর্গ চিত্র চারদিকে।

ঝিলমের তীরে উঠলে পপলার বৃক্ষের সারি। ছোট ছোট ঢেউ ওঠা নদীতে স্টীম বোট সংলগ্ন স্কি ছুটিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে পরীর মতো ছুটছে সোনা রঙের মেয়ে। বুকে আর জঙ্ঘায় সামান্য লজ্জাবস্ত্র। পেটে বাঁধা লাইফ বেল্ট।

ইসমৎ বলল, 'ডাল লেকের হাউস বোটের একটা হোটেলে আমরা খেয়ে নেবো—আসুন নেমে যাই।'

লগেজটা পিঠে নিয়ে নেমে পড়ল সিরাজ।

চমৎকার একটা হাউস বোটে উঠল এসে তারা। বারান্দায় দাঁড়ালে রাজ্যের পদ্মপাতা ভাসা লেকের জল।

ইসমৎ বলল, 'ডাল লেক আসলে তিনটে লেক জুড়ে একটা। গ্যাগ্রিবল, লকুর ডাল, বাদ ডাল।'

পৃথিবীর নানান দেশের মানুষদের এখানে দেখা যায়।

হোটেলে তেমন ভিড় নেই।

সুদৃশ্য মনোরম চেম্বার। জানালা দিয়ে লেক তার গাছপালা ভাসমান চলন্ত শিকারা আর বিচিত্রবর্ণ আকাশ চোখে পড়ে।

মেনু না দেখেই মোরগ পোলাওয়ের অর্ডার দিল ইসমৎ। সবই তো তার জানা।

প্লেট, গ্লাস, কাঁটা, চামচ, বাটি সব কিছু সুদৃশ্য এবং নকসাদার।

খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ। পেশোয়ারী দেরাদুন চালের পোলাও। জাফরান দেওয়া। কিসমিস, আলু-বোখরা, পেস্তা, বাদাম, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপাতা, দই, চিনি, দুধ, ঘি দিয়ে তৈরি পোলাও। তার মধ্যে গোটা আলু, পিঁয়াজ এবং তরতাজা গোটা মুরগী। অন্য পাত্রে রেখে ভেঙে রানগুলো ছাড়িয়ে

নিয়ে খেতে লাগল দুজনে। সালাতের মধ্যে দেখা গেল আলুবোখরা, টম্যাটো, শশা, লেটুস, কাঁচা পিঁয়াজ, ভিনিগার। আহারের পর ফলার, আপেলের চাটনি, পাঁপর ভাজা দিয়ে গেল বয়।

উত্তম আহার সমাধা করার পর বারন্দার কোচে বসে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। সিগারেট ধরাল সিরাজ। ভেতরে ভেতরে সে ঘামছিল। কত না জানি বিলটা হবে। আসার সময় মামা অবশ্য পাঁচখানা একশো টাকার নোট পকেটে গুঁজে দিয়েছেন। সে দ্বিধা করতে বললেন, 'আরে নে, কাছে রাখ, দরকার হবে। শোব মামীর একটা ছবি এঁকে দিস।'

হোটেল থেকে বেরুবার সময় ইসমৎ নিজেই বিল মিটিয়ে দিল। সিরাজ দিতে গেলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বলল, 'যখন কলকাতায় যাব তখন আপনি দেবেন।'

'কলকাতায় আমরা কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী কফি হাউসে জুটলে চাঁদা করে খাই।'

হাসল ইসমত, চলতে চলতে 'বলল, এটা কাশ্মীর, ভূস্বর্গ, এখানে গরিব আছে বটে তবে কম। ট্যুরিস্টদের কল্যাণে আর ফল, গালিচা, কারুকার্য খচিত আসবাব, পশমী বস্ত্রের দৌলতে কাশ্মীরবাসীরা প্রায় অভাব মুক্ত। এখানে দু' বিঘে জমি থাকলে ফলের বাগান করে মেষ পেলে গম চাষ করে কাটের কাজ করিয়ে চাষী হলেও বেশ অবস্থাপন্ন। শুনেছি কলকাতা শহর নাকি মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। সেখানের গাড়িতে ওঠা যায় না, ধাক্কাধাক্কি, চাপাচাপি, তার মধ্যে আবার পকেটমার। আর পথে পথে ফকির। রাস্তার দুধারে মানুষের পেছনে পেছনে ভিখারীরা ছোটে। আমার ফাদার এসব বলেছেন, পথে নাকি এত দুর্গন্ধ আবর্জনা যে বমি হয়ে যায়। কলকাতা নাকি পৃথিবীর আস্তাকুড়?'

সিরাজ বলল, 'তোমার বাবার পেছনে যেমন ভিখারীরা ছোটে তেমনি মন্ত্রীরা যখন পথে বের হন তাদের পিছনেও ওই রকম করে সাধারণ মানুষরা ছোটে— কারণ তাঁর কৃপায় যদি কিছু আখের গুছানো যায়।'

মোগল গার্ডেনে নিয়ে গেল ইসমৎ। প্রায় চারশো বছরের বাগান। চমৎকার ফোয়ারা। ফুল বাগান। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই আসফ খান এখানে থাকতেন। সম্রাজ্ঞীর সম্মানে এই বাগন তৈরি করা হয়।

হরি পর্বত, হজরত বাল, শংকরাচার্য হিল দেখতে দেখতে বেলা গেল। সিরাজকে ক্লান্ত মনে হল। ট্যাক্সি করে নাগিন লেক, উলার লেক, মানসবাল লেক,

আচ্ছাবাগান, অবন্তীপুর দেখিয়ে ক্ষীর ভবানীতে এলো যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল অবন্তীপুরের গ্রীক অনুকরণের মন্দির স্থাপত্য দেখল সিরাজ।

একটা রেষ্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নিল দুজনে। ইসমত বলল, 'আপনি কি খু ক্লান্তি বোধ করছেন? এখানেই কি থাকবেন না পহেল গাঁও যাবেন? সেখানে গ্রাম অঞ্চল। টুরিষ্ট লজ, বাংলো তাঁবু যেখানে খুশী থাকা যাবে।'

'তাঁবুতে বাস করা, আরে বাপ, খুব মজা হবে।'

তাহলে চলুন, ওই ডিলাক্স বাস এসে গেছে।'

দুজনে বাসে উঠে পড়ল ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে। ভয়ংকর চড়াই ওৎরাই পথ। উঁচুতে বাস উঠছে আবার নিচু পথে নেমে যাচ্ছে। কোনো কারণে যদি গাড়ি উল্টে পড়ে তো চার পাঁচশো ফুট নিচে পড়ে গিয়ে সব কিছু চুরমার হয়ে যাবে।

পহেল গাঁও আসতে বেশ রাত হল। অনেক ঘোড়া আর সাধারণ মানুষের ভিড় এখানে। অনেক তাঁবু।

একটু মাঝারী গোছের সুন্দর তাঁবুতে তারা আশ্রয় নিল। বেশ জমাটি ঠাণ্ডা এখানে।

মোমের আলো জ্বলছে। মশাল জ্বলছে চারদিকে। অনেক তাঁবু পাশাপাশি। অন্ধকারেও পর্বতটা দেখা যায় আকাশের পটে। ধোঁয়াটে আকাশ। বরফ পড়ছে।

তাঁবুতে গদি পাতা বিছানা আছে।

মাংসের কাবাব আর রুটি দিয়ে গেল একটি আফগানি ধরনের লোক। ইসমৎ ওদের ভাষা বোঝে।

খাবার শেষে এক বোতল মদ দিয়ে গেল লোকটা। ইসমৎ চেয়েছিল নাকি।

পা ছড়িয়ে বসে সে মদ খেতে লাগল। বলল, 'আপনি খাবেন না?'

'না।'

'একটু খান। শরীর গরম থাকবে'—গ্লাস এগিয়ে দিতে ইসমতের হাত ঠেলে দিল।

ইসমৎ ভাবল তাহলে তো তাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবেন ভদ্রলোক। তাই সে হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে মুখে গ্লাস চেপে ধরল।

ঘট ঘট করে গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করে গা হাত ঝাঁকাল। বলল, 'কি এটা?'

ইসমৎ হাসল। 'ভদ্‌কো বা চুল্লুর মতো, এখানেই তৈরি হয়, পারসেন্টেজ বাঁধা নেই। হঠাৎ মারা পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

'তাই নাকি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ইসমৎ। বলল, 'হুঁ হুঁ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধরেছে, চমৎকার মাথা ঘুরছে, সারাদিনের ক্লান্তি কেটে গেল।'

সিরাজ একটু উঠল। বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল, দুজন লোক আড়াল থেকে ইসমৎকে দেখছিল। তাকে দেখে হঠাৎ কিছু না দেখার ভান করল। মিথ্যে খৈনী ডলার ভঙ্গি করে একজন অন্যজনকে তা দান করল।

টেণ্টের মুখের পর্দাটা ফেলে দিল সিরাজ। তাঁবুওলা আসতে তাকে বলল লোক দুজনের কথা। তাঁবুওলা বলল, 'ওরাও মেহমান, বাইরের লোক শ্রীনগরে যাবে। আমাদের পাহারাদার আছে। কিছু ঘটলে জানাবেন। পুলিসে দিয়ে দোব।'

লোক দুটো তাদের তাঁবুতে চলে গেল।

ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কে যেন তারের বাজনা বাজাচ্ছে।

ভেতরে এসে দেখল ইসমৎ পোষাক ছাড়ছে। মাথায় ওর সোনালী চুল, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি কাটা। এ্যাংলো টাইপের মেয়ে। পেটে মেদ নেই, নিটোল বক্ষচূড়া। নাভিটা ওর গভীর দীপাধার।

সিরাজ বলল, 'ঠাণ্ডা লাগবে না এত কম পোষাকে?'

ইসমৎ বলল, 'লাডাকে গেলে দেখবেন আমি তুষারের ওপর দিয়ে কি রকম স্কিটিং করি। তখন স্কিটিং ড্রেস ছাড়া আর কি থাকে? আমার খুব ঠাণ্ডা সহ্য হয়।'

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ইসমৎ।

একটাই বিছানা। সিরাজ ইতস্তত করতে লাগল। তাঁবুর পর্দা এঁটে দিয়ে এসে সিগারেট ধরাল।

ইসমৎ বলল, 'শুয়ে পড়ুন, বেশ রাত হয়েছে।'

'তোমার পাশেই শোব?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বেশি ঠাণ্ডা লাগলে দুজনে কম্বল তুলে এক জায়গায়, একসঙ্গে শোব।'

লজ্জা পেল সিরাজ। তার হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে টানতে লাগল ইসমৎ।

'তোমার জন্যে কেউ ভাববেন না?'

'কে, মা-বাপ!' হুঁস্ হুঁস্ করে সিরাজের মুখে ধোঁয়া ছাড়ল ইসমৎ।

বলল, 'আমি ফ্রি, যা ইচ্ছা করি, যেখানে ইচ্ছে যাই। আমি ইংল্যাণ্ডে এক বছর, আমেরিকায় ছ'মাস একাই কাটিয়ে এসেছি।'

সিরাজ শেষপর্যন্ত শুয়ে পড়ল।

ইসমৎ বলল, 'রিজিয়াকে এন্‌জয় করেছেন?'

'না তো!'

'করা উচিত ছিল, আপনি ভীষণ সাই, না?'

কিছু বলল না সিরাজ।

ইসমৎ গান করতে আরম্ভ করল, হঠাৎ উঠে বসল, সিরাজের বুকের ওপরে পড়ে ওকে কিস করতে লাগল। বলল, 'আই এ্যাম আনবনডেজ, আই ডু নট ক্লেম, আই ওয়াণ্ট ফ্রি লাভ।'

সিরাজ আড়ষ্ট দেখে ইসমৎ ওকে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করল। খুব হাসতে লাগল সিরাজ, কম্বল খুলে নিল তার ইসমৎ। নেশায় তখন তার চোখ ঢুলুঢুলু। বলল, 'প্রিয়তম শিল্পী, আপনাকে কাছে পেয়েও যদি না পাই, বদনাম কি যাবে একসঙ্গে রাত্রিবাসের? এটা তাঁবু নয়—এটা যে বাসর!'

সিরাজ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলল। ইসমতের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হল। দেখল তাকে মোমের আলোয়।

তারা আদিম হয়ে গেল।

এতেও এক রকমের চরম আনন্দ। ইসমৎ হাসল কাঁদল। বলল, 'শিল্পী, যখনি তোমাকে দেখেছি, মাথায় ঘুরছিল কি করে তোমাকে পাওয়া যায়। দু'হাজার টাকা এনেছি—তোমার পেছনে সব খরচ করব। যখন চলে যাবে, কোনো অভিযোগ করব না। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলব।'

'এ রকম কত দীর্ঘশ্বাস তোমার পড়েছে?'

কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইসমৎ। তারপর সে পাগলের মতো অশ্লীল কথা বলে এমন উত্তেজিত হয়ে সিরাজকে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল যেন মনে হল সে বন্য মানবী।

যখন সে তৃপ্তিতে আবেশে ডুবে গেল তার হুস ছিল না। অনেকটা বেলা পর্যন্ত ইসমৎ ঘুমোল। চা দিয়ে যেতে তাকে ডেকে তুলল সিরাজ।

ইসমৎ হাসল। শরীর ঢাকল। মুখ ধুয়ে এসে সিরাজের কোলে মাথা রেখে চা খেল।

তারপর একটু বেলা হতে তারা দুজনে দুটো ঘোড়ায় চড়ে পহেল গাঁয়ের ার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আর একটা দিন পহেল গাঁয়ে থাকল ওরা। ছিপ ফেলে মাছ ধরে আনন্দ পল। স্বচ্ছ ঝর্ণাধারায় মাছের খেলা দেখল।

তারপর লাডাকের পথে পাড়ি দিল।

আশ্চর্য মেয়ে ইসমৎ। লাডাকের তুষারাঞ্চলের ঢেউ খেলানো ভূমির ওপর দয়ে স্কিটিং খেলল সে। ট্যুরিস্ট লজে তার সঙ্গে রাত কাটাল।

এবার ফেরার পালা। শ্রীনগরে ফিরে ডালহ্রদের স্বচ্ছ জলেব ভেতরে মাছের খলা দেখতে দেখতে তারা শিকারায় বিদায় ভ্রমণ সারল।

পরস্পরকে চুম্বন করল হাউস বোটের মধ্যে আহারাদির পর।

তারপর ইসমৎ চলে গেল।

মামার বাসায় ফিরে এলো সিরাজ।

॥ ১০ ॥

কিছুই ভাল লাগছিল না—একা একাই পল্লীর পথে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরছিল সিরাজ। ইসমতের কথা মনে পডতে মনে হল মেয়েটা খুবই খেলোয়াড। অনেকখানি তার ভেতরে কৃত্রিমতা। সে এর আগে অনেক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে। অকপটেই মেলামেশা করে।

সিরাজ হাত ওলাটালো। না, তাকে আর তার প্রয়োজন নেই।

রিজিয়ার জন্যে ভাল ছেলেটা আত্মহত্যা করল। ছেলেটার বাপ পাগল হয়ে গেছে। পথে পথে এখন ভিক্ষা করে।

একটা পল্লীতে ঢুকেছিল সিরাজ। চারদিকে ফলের গাছ। সুন্দর কটেজ। গালিচা তৈরি করছে ক'জন মানুষ। একজন বুড়ো লোক, গলাটা লম্বা, মাথার চাঁদিতে ছোট্ট টুপি, লম্বা আলখাল্লা গায়ে, তার ওপরে ফুচকে ওয়েস্ট কোট, নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। এই চেহারার কথা শুনেছিল লায়লার কাছে, লোকটি নাকি তার নানা অর্থাৎ মাতামহ।

তাকে বসতে একটা কুরশি দিয়েছিল। নকসাদার পেয়ালায় কিছু আঙুর-আপেল দিল ওরা। গালিচা বোনার কাজ দেখতে এসেছে জানাতে বুড়োটা

বলতে লাগল, 'এই যে গালিচাখানা আমরা বুনছি দু'বছর ধরে, এর দাম এক লাখ টাকা। আমরা গরিব মজুর, দৈনিক চার-পাঁচ টাকা রোজে কাজ করি। মহাজন এটা তৈরি করছেন, তিনি বেঁচে দেবেন পাইকারী দরে কোন মাড়োয়ারী, গুজরাটি অথবা কাশ্মীরী ব্যবসাদারকে। ওঁরা ক্রোড়পতি। বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতায় এঁদের দোকান আছে। এঁদের দোকান থেকে মাল কেনে বড় বড কোম্পানী অথবা ভারত সরকার। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি, সেনাপতি এঁদের কামরায় এই গালিচা শোভা পায়। আমরা শকুনের মতো মাথা গুঁজে বসে বসে বুনেই যাই। ঘাড় কনকন করে, পেটের ক্ষুধা দূর হয় না, আল্লা যার কপালে যেমন সুখ রেখেছে।'

'আপনার বাড়িটা কোথায় ?'

'উত্তরে, মাইল দুয়েক দূরে।'

'আপনার কে কে আছে ?'

'ওহো ! আমার ছেলেমেয়ে অনেক ! বাড়িটাকে মাদ্রাসা করে দিয়েছি। তারাই আমার ছেলেমেয়ে। একটা মেয়ে আছে, সেও বিধবা, জামাই যুদ্ধে গিয়ে মরল। তার একটা মেয়ে আছে, ভেড়া চরায়, মেয়েকে বলি লায়লাকে এনে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দাও। তা সে শোনে না। নিজের উপায়ে নিজে দাঁড়াতে চায়। তাছাড়া আমার অভাব আল্লা দূর করতে পারবে না। পেছনে শয়তান লেগে আছে। যা উপায় করে নিয়ে যাই পথে গরিব অভাবী লোকরা কেউ পিছু লেগে হাত পাতে। রাখতে পারি না। একটা পাগলা লোক এসে রোজ জ্বালাতন করে। আহা রে ! বেচারার বাড়ি ছিল, ছোট্ট ক্ষেত ছিল, ভেড়া-ছাগল ছিল, একমাত্র ছেলে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হল, তারপর এক বড়লোকের মেয়েকে সাদী করল, সেটাই হল তার কাল—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ছেলেটাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল তার সমস্ত খরচ দিয়ে পড়িয়ে পরে বিলেতে পাঠানো হবে—কিন্তু হায়রে ! ধনী ব্যবসায়ী ! কাকাতুয়া পাখিটা যে ময়লা আহার করত সেটার সে প্রতিবাদ করল—তাতেই তার পিঠে চাবুক পড়ল—আর ছেলেটা বোকার মত আত্মহত্যা করল।'

'বুড়ো পাগলটাকে আমাকে দেখাবেন ? বলল সিরাজ। তাকে দেখার আমার খুব আগ্রহ। হতভাগ্য ছেলেটার কথা আমি শুনেছি। যে তার বউ হয়েছিল, এখন কলেজে পড়ে, ছবি আঁকা শেখে—আমিও তো ছবি আঁকি—তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল—মেয়েটার নাম রিজিয়া—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ রিজিয়া। আর আমাদেরও দুর্ভাগ্য এই দু'বছর পরিশ্রম করে চার পাঁচজন লোক যে গালিচাটা বুনছি সেটা মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে নিয়ে যাবে ঐ রিজিয়ার বাপ লোকটা। কুড়ি হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে গেছে আমাদের বড় মহাজন আজিম ওসমানকে।'

'আপনার নাতনী লায়লাকেও আমি জানি।'

'তাই নাকি? তারা কেমন আছে সাহেব?'

'মেয়েটার গায়ে তেমন ভাল জামা-কাপড নেই—শীতে বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। মেষ চরায় মাঠে মাঠে। আর ওর মা গম কাটে, ছোলা পাছডায়, কী অপূর্ব সুন্দর তাকে দেখতে—'

'মেয়েটার আবার বিয়ে করা উচিত ছিল—'

বুড়ো বলতে বলতে অন্যমনস্ক হল—পাশের লোকটাকে কাজ দেখাতে লাগল—'ওভাবে ছুঁচ চালাবি না, ট্যারা বাঁকা হবে—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দেখা হলে লায়লাকে বলো তো সাহেব, আমার বাড়ি আসতে। একটা মোরগ রেখেছি, মোরগ পোলাও খাব বলে…'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সোনাব থালা সূর্যটা পর্বতের আড়ালে চলে গেছে। এখন এমন একটা সময় যখন দিনও নয়, রাতও নয়। চমৎকাব আলো ছায়া হিমেল ভাব।

খোঁজ নিয়ে জানল অল্প কিছু দূরেই নিশান গাঁও। সম্মোহিতের মতো চলতে লাগল সিরাজ।

সে অনুভব করতে লাগল কোনো কিছু যেন তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে।

ছোট মতো একটা বাজার দেখে সে কয়েকটা আপেল আর পীয়ার কিনে নিল। ঝোলার মধ্যে পুরে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

এই হল নিশান গাঁও। বীর শহীদ আবদুল হামিদের পদধুলিতে যে জায়গা আজ ধন্য। হায়! তার অনাথ পরিবারকে আজ কেউ দেখছে না—বরং উলটে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় গোঁড়াপন্থী মানুষরা।

একটা ছেলে, লায়লারা যেখানে থাকে দেখিয়ে দিল। আঙুর লতায় ঢাকা পুরোনো একতলা বাড়ি। বাড়ির মধ্যে থেকে ভেড়ার ডাক শোনা যায়।

কাঠের দোরটার কাছে এসে ডাকল সিরাজ, 'লায়লা আছ নাকি, ও' লায়লা?

'কে !' লায়লা সাড়া দিলে। ছুটে এলো সে বাইরের দিকে। দেখে বলল, 'ও মা, তুমি !' বলেই সে আবার তার মায়ের কাছে চলে গেল।

তার মা শুধোলে, 'কে র‍্যা খুকী ?'

'ও মা, সেই লোকটা গো ! যে আমাকে সেদিন খাবার খাইয়েছিল। ডাকব মা ?'

বাড়িঅলী বুড়ী ছাগলের চাটুনী সুখের কাতুকুতু খেতে খেতে শুধোলে 'কে লা ?'

'একজন বাঙালী বাবু, আমাদের মুসলমান। ছবি আঁকার কাজ করে, খুব দয়া লোকটার, ডেকে আনব দাদী ?'

'আন।' বলল বুড়ী।

লায়লা এসে ডাকল, 'এসো।'

সিরাজ ভেতরে এলো। অন্ধ বারান্দায় পাকা-চুল-ঝোলা বুড়ীকে দেখে সে আদাব জানাল। কাছে তার বড় বড দুটো পাটনাই ছাগল। বড় বড় কান। গলায় ঘণ্টা। ছাগলের ভারী পালান—বাঁটগুলো মাটিতে ঠেকব ঠেকব করছে। মনে হচ্ছে অনেক দুধ হয়। বুড়ী খুশী হয়ে বলল, 'লাইলী, বসতে দে মানুষকে।'

লায়লা একটা মাদুর পেতে তার ওপরে পুরোনো নকশাদার একটা ছোট্ট গালিচা পেতে দিল।

বসল সিরাজ। পেতলের পিদিম জ্বলছে। পিদিমটা কি বড। সোনার মতো চকচক করছে।

লায়লার মা কালো বোরখা পরা—তার সঙ্গে মেয়ে লায়লা কি যেন যুক্তি করছে। সম্ভবত অতিথিকে কি নাস্তা দেবে তা নিয়েই তাদের ভাবনা-চিন্তা।

বেশ শীত পড়েছে। সিগারেট ধরাল সিরাজ। বুড়ীর বাঘছাবা বিড়ালটা এসে গলা ঘড়ঘড়িয়ে বার কয়েক ল্যাজ মেরে গেল।

লায়লাদের ঘরে সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি মারা। বাজারের ঠোঙা থেকে কেটে নিয়ে মেরেছে বোধহয় লায়লা।

লায়লাকে একটা পাত্র হাতে নিয়ে কোথাও যেতে দেখে বাধা দিল সিরাজ। বলল, 'কোথাও যেতে হবে না, শোনো, এদিকে এসো—এইগুলো নাও—এসো, ধরো। চা আনবে তো ? আমি চা খাই না।'

ফলগুলো নিয়ে গেল লায়লা। ওর মা সামনে আসছে না। বাড়িতে কোনো

পুরুষ নেই, অস্বস্তি লাগছে একা বসে থাকতে। কেন এসেছে সে—কিসের ধান্ধায়, এইটাই যেন প্রকট হয়ে উঠছে।

বুড়ী স্থির চোখে তাকিযে আছে, শুধোলে, 'কোন মুল্লুকে বাড়ি ভাই ?'

'পশ্চিম বাংলা।'

'সে কোনদিকে ?'

'হাজার দুই মাইল পুবদিকে।'

'কি করা হয় ?'

'এমন কিছু নয়, ছবি আঁকি। শ্রীনগরে মামার গাল্‌চে দোকান আছে। আমি কলকাতায থাকি, খুকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তা কালই দেশে চলে যাচ্ছি—হ্যাঁ, শোনো লায়লা, তোমার নানাজীর সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। যেমন তুমি বলেছিলে, সেই রকম চেহারা। ভারি ভালো লোক। খালিচা বুনছেন চোখে চশমা দিয়ে মহাজনেব কাবখানায়। তোমাদের যেতে বললেন।'

লায়লা পিরিচে করে কাটা ফল নিয়ে এসে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'নানার সঙ্গে তোমার আলাপ হযেছে ? আমরা যাব একদিন।'

লাযলাকে ডাকল সিরাজ, 'এসো, তুমিও নাও, আমাকে সব দিলে কেন ?'

'তুমি খাও।'

'এসো, এখানে এসো।'

লাযলা খানিকটা দূবে থামের পাশে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে হাসতে লাগল। ওব মা ইঙ্গিত করল—'যা—নে না।'

লায়লা হাত পেতে কযেক কুঁচো ফল নিল। বুড়ীকে কিছুটা দিতে বলল।

বুড়ীকে ফল দিতে আশ্চর্য হয়ে সিরাজ দেখল ফলেব ফালিগুলো বুড়ী নিজে না খেয়ে তার ছাগল ছুটোকে খাইয়ে দিচ্ছে।

'ঐ এক ঢং!' বলে লায়লা মুখ ঝাপটা মারল।

বুড়ী বলতে লাগল, 'মামার বাড়ি যাও আর যেথা যাও, গত তিন মাসের ধর ভাড়া ফেলে দিয়ে যেও। আমি খাব কি ? আমার কি মদ্দ-মানুষ আছে ? গতর পড়েছে আমার—না ভাড়া দিতে পার—সরে পড়ো—আমি অন্য ভাড়াটে রাখি—' বলতে বলতে বুড়ী ঘরের মধ্যে উঠে গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গিয়ে।

লায়লার মা কাছে আসছে না কেন ? একেবারে লজ্জায় বিবি হয়ে গেল! এই মেয়েই যে মাঠে ঘাটে ক্ষেতে-খামারে কাজ করে এখন তা কে বলবে!

তার এই গোপনতা কেন? বুড়ী যদি কিছু রটায় তার ভয়ে? নাকি তাকে সন্দেহ করছে।

চুলোয় যাক।

সিরাজ বলল, 'চলি আমি লায়লা—কাল তো আমি দেশে চলে যাব।'

'কালই?'

'হ্যাঁ।'

'মা একটু বসতে বলছে—পায়েস রান্না হচ্ছে—একটু খেয়ে যাবে।'

'না না আর কেন? তোমরা খেও।' 'সিরাজ উঠতে গেলে লায়লা এসে কাঁধে হাত চেপে বসিয়ে দিল।

বসে রইল সিরাজ। ঝোলা থেকে ছবি বার করল। পিদিমটা কাছে এনে বসল লায়লা। ছবি দেখতে লাগল। নিসর্গ চিত্র। একটা ছবি দেখে সে স্থির হয়ে গেল। তার মায়ের ছবি। গম কাটতে কাটতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে কাস্তে, অন্য হাতে একগোছা গম। মুখ চোখ সবই স্পষ্ট।

ছবিটা সট্ করে টেনে নিয়ে সে উঠে পালাল—দেখাল তার মাকে।

মা অবাক হয়ে দেখল। মেয়ের মুখের দিকে হাসি ভরা চোখে তাকাল। বলল, 'আমার ছবি, না?'

'হ্যাঁ মা, ঠিক অবিকল তোমারই।'

'লোকটা পাগল দেখছি।—যা পায়েসটা দে।'

পায়েস আনল লায়লা। বলল, 'আমার মায়ের ঐ ছবিটা দেব না।'

'ওটা তোমার মায়ের ছবি নাকি?—আমি তা তো জানি না। ও-তো একটা গম কাটা মেয়ে।'

হাসল লায়লা। তার হাসিতে প্রকাশ হল, মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে, সেদিন না বললে তোমার মাকে দেখেছি!

খেতে খেতে বলল, 'আমি ঐ ছবিটা অনেক টাকায় বিক্রি করব যে!'

'তাতে আমরা কি পাব?'

'দেব, তোমাদের সবটা!'

'তুমি তো দেশে চলে যাচ্ছ।'

লায়লার মা সামনে এলো। তেমনি বোরখা মুড়ি দেওয়া। একখানা ফটো নিয়ে এগিয়ে ধরল লায়লার দিকে। বলল, 'এই ওর বাপের ফটো।'

ফটোটা দেখল সিরাজ। বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেই যুদ্ধের সময় কাগজে

দেখেছি। হাবিলদার আবদুল হামিদের ছবি। ছবিখানা আমাকে দিলে আমি বড় করে এঁকে দিতে পারি।'

লায়লার মা রাজি হল না, বলল, 'এইটাই আমার কাছে সম্বল। হারালে আর কোথায় পাব? তাই এখানের মোল্লা-মৌলবীরা বলে, আমি নাকি 'বোত-পরস্তি' করি। আমার স্বামীর ছবিকে পুজো করি। এ ছবি পুড়িয়ে দিতে বলেছে। আমি পোড়াইনি বলে সবে-বরাতের দিনে আমার বাড়ি মোল্লা আর কারআন পড়তে আসে নি। আমার মেয়ের সাদি দিতে দেবে না। আমি মরলে নাকি কবর দেবে না। আমার স্বামী কাফেরদের রাজ্য রক্ষার জন্য নাকি প্রাণ দিয়ে 'শয়তান' হয়ে মরেছে।'

'আসলে ওরা কি চায় আমি জানি। ওরা চায় আমাকে। কোনো মৌলবী-মোল্লার বউ হয়ে আমি যদি ঘরকন্যা করি, পুরোনো স্বামীর কথা ভুলে যাই, তাহলেই বেহেস্ত পাব। বুড়ো মোল্লাদের যেমন চেহারা, তেমনি ধরণ। ঝাড়ু মারো মুখে।'

লায়লার মা ঘরের মধ্যে চলে গেল। মুখের নেকাব খুলল না।

সিরাজ এবার উঠল। ঝোলাটা কাঁধে নিল। ছবিটা আর ফেরত দিল না। ফেরত চাইতে লায়লাকে তার মা বলল, 'থাক না, দিলে আবার এখানের কোনো কাগজে হয়তো ছাপিয়ে দেবে আর লোকে দেখে আমাদের জ্বালাবে—লোকটা আবার বাড়িতেও এলো।'

সিরাজ চলতে আরম্ভ করতে লায়লা তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটো জলে ছলছল হয়ে উঠল। পিছনে পিছনে এলো। গেটের কাছে এসে সিরাজ যখন তার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'আর হয়তো দেখা হবে না লায়লা'—তখন হঠাৎ লায়লা বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! বলতে লাগল, 'না, যাবে না তুমি—আমি যেতে দেবো না—তুমি থাকো—আমরা কি করে বাঁচব—'

'লায়লা'—পিছন থেকে লায়লার মায়ের ডাক শোনা গেল।

মুখটা বুকে চেপে মাথায় চুমু খেয়ে পিঠ থাবড়ে দিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট নিয়ে লায়লার হাতে গুঁজে দিল সিরাজ। বলল, 'খোদা তোমাদের দেখবে—তোমরা সৎপথে থেকো। আবার আমি আসব।'

সিরাজ চলে এলো। কয়েক পা আসার পর সে পিছন ফিরে যখন তাকাল আলো অন্ধকারে দেখল, লায়লারা মা-মেয়ে গেটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের মুখের নেকাব খোলা। কিন্তু স্পষ্ট চোখ দুটো দেখা যায় না। সিরাজ

টলতে টলতে চলল। লায়লার চোখের জল এখনো তার বুকের ওপরে লেগে আছে। বেচারা অনাথ মেয়ে। ওর বাপটা যদি থাকতেন। নানাটাও গরিব ওদের ঘর ভাড়া বাকি।

॥ ১১ ॥

কলকাতায় ফেরাব পর কয়েকদিন জ্বরে পড়ল সিরাজ। রুমার মা যথেষ্ট করল তার জন্য।

পাবলিশারদের লোকজন আসছে, বাকি কাজগুলো কোনো ক্রমে সেরে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেল সে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গেল।

ভাগচাষীরা জমি-জমা দখল করে নেবে, সরকার তাদের পক্ষে। যদিও খুব বিশ্বাসী লোকদের হাতে সিরাজদেব কয়েক বিঘে জমি ভাগ চাষে দেওয়া আছে কিন্তু তবুও দিন কাল ভাল নয়—বিশ্বাসী লোকদেরও অবিশ্বাসী করে দেবার লোক আছে।

গ্রামে ফিরে যে তিনজন লোকের কাছে জমি ছিল দেখা কবার পর তারা প্রত্যেকেই জানাল আধাআধি ধান খড বা অন্য ফসল তারা দিতে পারবে না। জমি আইনত এখন তাদের।

সিরাজ বলল, 'সেরকম তো কথা ছিল না। তোমরা বিশ্বাস রাখবে বলে খোদার নামে, কোরআনের নামে কশম খেয়েছিলে—এখন কি সব ভুলে গেলে? দেখো শাজাহান, আমার তো আরো পঞ্চাশ বিঘে জমি নেই যে দু-চার বিঘে গরিব চাষীরা দখল করলে দুঃখের হবে না। তোমরা যদি হাত ধরে অনুনয়-বিনয় না করতে আমি নিজেই চাষ করতাম। এখন আমার চাইতেও তোমার অবস্থা ভাল। আমরা একই পার্টি করি—তাহলে সম্পূর্ণ ঠকাবার মতলব হল কেন?'

শাজাহান বলল, 'আমাদের জমি লেখাতে বাধ্য করা হয়েছে। না লেখালে পার্টির ছেলেরা বলেছে—তাহলে আমরা বুঝব তোমরা আমাদের মার্কসবাদী দলের নয়। আমরাও জব্দ করব। কি করব বলো?'

'তোমরা ধর্ম মানো না?'

কোনো উত্তর নেই!

'তোমাদের ইমান নেই ?'

নিরুত্তর।

'স্বার্থের লোভে অন্তের ফুসলানিতে পরের পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ দখল করবে ? বালবাচ্চাদের পরের হক্ মেরে খাইয়ে বড় করবে ? বরং তোমরা এক কাজ করো—আমি বিক্রি দলিল করে দিচ্ছি—তোমরা কিছু কম করে টাকা-পয়সা দাও—নইলে আমিও ছাড়ব না।'

এরসাদ বলল, 'কি করবে তুমি ?'

'রক্তপাত ঘটতে পারে। বিচার বসতে পারে। মামলা হতে পারে।' বুড়ো রশীদ মিয়া বলে ফেলল, 'না বাবা, অত দরকার নেই—তুমি আমার কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে যাও।'

সিরাজ রশীদ মিয়ার বাড়িতে গেল।

খেয়ে দেয়ে রাত্রে ফিরল নিজেদের বাড়িতে। মাসতুতো ভাই থাকত তাদের দোতলা মেটে বাড়িতে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। তারা সিরাজকে আসতে দেখে আদর-আপ্যায়ন করল। বউটি বিছানাপত্র করে দিল। খাবার কথা বলল। বলল, এবার একটা বউ করে এনে সংসার পত্তর করো ভাই।'

সিরাজ বলল, 'বউ করে এনে খাওয়াব কি ? দু' বিঘে ধান জমি, দু' বিঘে বাগান আর বাড়িঘর পুকুর ডোবা আছে এবার তোমরাও দখল করে নাও—আমি পথের ভিখারী হয়ে ঝোলা কাঁধে নিয়ে চলে যাই।'

জিভ কাটল আমিন। 'তা কখনো হতে পারে ?' আমিন নামাজ পড়ে, ধর্ম মানে—সে পরের হক্ মারতে চায় না। কিছুটা লেখাপড়াও সে জানে। বাগানের ফল ফসল বেচে সে হাজার পাঁচেক টাকা জমিয়েছিল—সবই এনে দিল।

সিরাজ খুশী হয়ে বলল, 'আমি যদি খুব বিপদে না পড়ি তবে আর তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। তুমি এবার থেকে ভোগ দখল করবে, তোমার নামে আমি সব লিখে দিয়ে যাব।'

আমিন খুশী হল না। বলল, 'ভোগ-দখলের তক্দীর আল্লার হাতে। আল্লা না চাইলে পেয়েও মানুষ কি ভোগ দখল করতে পারে ?'

ইশার নামাজ পড়ার পর আমিন আবার এলো। বলল, 'আচ্ছা সিরাজ, আমি তো রাজনীতির কিছু বুঝি না—কিন্তু এটা কি রকম নীতি—যেখানে সমস্ত জমি-জায়গা সরকারের জাতীয়করণ করার কথা সেখানে কমিউনিস্টরা কেন ছোট ছোট চাষীদের ভাগচাষের জমি দখল করাচ্ছে ? এ জমি কদিন তারা ভোগ-

দখল করবে? আর যার জমি গেল সে তো নির্ধন হল। ধরো, কোনো গরিব বিধবা পয়সার অভাবে তার পাঁচ বিঘে জমি চষতে না পেরে কাউকে ভাগে দিত। সেই জমির আয়ে তাদের খোরাকী হতো। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করত। ভাগচাষী দখল করার পর এই বিধবার সংসারটার কি অবস্থা হবে?'

সিরাজ বলল, 'উদ্দেশ্য পুঁজি ভেঙে ফেলা। খাটো খাও। শ্রমিকে পরিণত হও। পার্টিতে এসো। সমস্ত জমি জাতীয়করণ যতদিন না হয় ততদিন ভোট পাবার স্বার্থে। গরিবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আমি গরিব লোক জানা সত্ত্বেও পার্টির লোকরা আমায় হয়ে টানবে না কারণ আমি শিক্ষিত, শিল্পী, অন্যভাবে আমি উপায় করে খেতে পারব। তারপর আমি ঠিক পার্টির মেম্বার নয়, মস্তক বাঁধা দিইনি। তাই আমার প্রতি ওদের প্রেম নেই। শিল্পে ছকবাঁধা ধ্যানধারণা চলে না। ভাব-রস-কল্পনা বাদ দিয়ে শুধু বস্তুবাদ বা বাস্তব কিংবা জান্তব জীবনে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এটাও ঠিক যে এতদিন যে পুঁজিবাদীরা পৃথিবীকে ভোগ দখল করছিল, গরিব মেহনতি মানুষরা জুটে তা ভেঙে ফেলা দরকার। হয়তো তাতে আমরাও বলি হয়ে যাই। পার্টির উচিত আমাদের মতো শিল্পীদেরও সম্মানজনক আশ্রয় দান করা। কিন্তু কঠোরপন্থী নিরস রাজনীতিবাগীশ লোকেরা তা বুঝবে না।'

রাত্রে ভাল ঘুম হল সিরাজের।

সকালে শাজাহান এলো। তার মতান্তর ঘটেছে। সেও টাকা দেবে। লোককে বলতে পারবে আমি জমি কিনে নিয়েছি, পরের ধন মারি নি।

শেষে এরসাদও রাজি হল।

তিনজনকেই বিক্রি দলিল করে দিল সিরাজ মাত্র অর্ধেক দামে। আমিন দলিল করতে চাইল না।

হপ্তাখানেক আরামে কাটল সিরাজের। হাজার দশেক টাকা সংগ্রহ করতে পারল সে। বাঁশ আর নারকেল, কলা বেচে আরো এক হাজার টাকা দিয়েছে আমিন। বলেছিল, পুকুরের মাছও বেচে দেবে, কিন্তু সিরাজ তা করতে দিল না। কেননা আমিনের বড় মেয়ে সাজেদা বিয়ের যোগ্য হয়ে গেছে—বিয়েতে তার মাছের খরচ আছে। দুটো খাসী আর কয়েকটি মোরগমুরগী পেলেছে সাজেদার মা। জমির ধান আছে। কিন্তু মেয়েকে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ানোর পর নাকি বিপদ হয়েছে—বি এ পাস ছেলে একটা দরকার—তার ব্যবসা বা চাকরি থাকা চাই কিন্তু তা পেতে গেলে হিন্দুদের মতো নগদ টাকা আর কয়েকভরি সোনা ব্যয় করতে হবে।

সাজেদার মায়ের মতলব ছিল জমানো টাকাগুলো আর সিরাজকে না দিয়ে মেয়ের বিয়েতে খরচ করা। কিন্তু আমিন রাজি না। সে বলে, 'যে পাতে খাব সেই পাত ছিঁড়ব? মনে আছে দুঃখের কথা? তখন দিনান্তে ভাত হত না। খালু মারা যাবার পর সিরাজ যেন বিরাগী হয়ে আমার হাতে সব দিয়ে কলকাতায় চলে গেল।'

'সাজেদার জন্যে একটা ছেলে দেখে দাওনা ভাই'—সাজেদার মা বলল দুপুরে খাওয়ানোর সময়। আজ সিরাজ চলে যাবে—তাই মাছ-মাংসের যোগাড় হয়েছিল।

সিরাজ বলল, 'তোমরাই দেখ, হয়ে যাবে যেথা হোক—আমি তো বেশিদিন কলকাতায় থাকছি না। কাশ্মীরে চলে যাব। এখানের পার্টির ছেলেরা আমাকে এড়িয়ে চলছে কারণ ভাগচাষীদের কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি বিক্রি দলিল করে। চাষীদেরও ওরা নিন্দে করেছে নাকি। কলকাতায় কতকগুলো বিশেষ বিশেষ কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের আমি কাজ করে দিই বলে পার্টির লোকেরা ব্যাজার। আমি সব মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে চাই।'

আমিন বলল, 'কাশ্মীরে কি মামার কাছে থাকবে?'

'ভাবছি ওখানে একটা স্টুডিও করব, মামা যদি সাহায্য করে ভাল।'

'গিয়ে চিঠি দিও, ঠিকানা পেলে আমিও মাঝে মধ্যে কিছু কিছু মনিঅর্ডার করে পাঠাব।'

সিরাজ বলল, 'না, তার আর দরকার নেই। আমি ওখানে ছবি আঁকলে অনেক টাকা পাব। হয়তো তোমাদের চেয়েও ওখানে আর একটা দুঃস্থ পরিবারের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে।'

সিরাজ গ্রাম থেকে চলে এলো। আমিন এলো তার ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বাস স্টপেজ পর্যন্ত।

কলকাতায় এসে শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল সিরাজ। বিখ্যাত প্রকাশক ভানুবাবু এখন আবার নতুন শিল্পীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন কম টাকায়। বলছেন, 'নতুনদের তো সুযোগ দিতে হবে।'

তার মানে সিরাজ যে বলেছিল, 'আপনি এতদিন একটা প্রকাশনী সংস্থা চালাচ্ছেন অথচ আর্ট বোঝেন না, এটাই আশ্চর্য! তাই ভদ্রলোক মনে মনে চটেছেন। অন্য প্রকাশকদেরও টিপে দিয়েছেন। তার মানে কলকাতার জীবনে সিরাজ এবার অবাঞ্ছিত জীব। এখানে পুঁজিপতিরা ভগবান তুল্য। তারা সমালোচনা সহ্য করে না। তোয়াজ ভালোবাসে। কান-পাতলা লোক।

ধুত্তোর! তেল দেবার লোক নয় সিরাজ। অন্য সব কোম্পানীর কিছু কিছু কাজ করল সে। শীতকালটা চলে গেল।

হঠাৎ একদিন সে অবোর ব্যাঙ্কের সব টাকা কড়ি তুলে নিয়ে বাসাটা বিলি করে দিয়ে ট্রেনে উঠে বসল।

কাশ্মীরে চলে যাচ্ছে সে। কলকাতায় যারা তাকে খুঁজবে—হয়তো কম লোকই—তারা তাকে পাবে না। তবে দেনা রেখে আসে নি। বরং কত মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা পায়।

রুমার মা ফ্ল্যাটটা রেখে দিল। বলেছিল, 'তুমি অস্থির মন নিয়ে পালাচ্ছ, যদি ফেরো, রেখে দিলাম! বাড়িওয়ালাকে আমরাই ভাড়াটা দিয়ে দেবো, বলব যে সিরাজ সাহেব ফ্ল্যাট ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছে।'

রুমার মা দিদির মতো হয়ে গেছিল। মেয়েটি স্নেহপরায়ণ। সংসারে সবাই খারাপ নয়। রুমা আর ছোটন ঠোঁট ফোলাতে লাগল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিরাজ। রুমার বাবা গ্রামোফোন কোম্পানীর বড়কর্তা। ভাল উপায়। নানান গায়ক-গায়িকার খেয়াল খুশীর কথা গল্প করতেন। তিনি মদ খেলে আর কথা বলতেন না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন আর দুলতেন।

সময় আর কাটতে চায় না।

শেষ পর্যন্ত শ্রীনগরে এসে হাজির হল সিরাজ। ভাবল সে মামার বাসায় উঠবে কি না।

চারটি জায়গা তার জন্য খোলা আছে। হোটেল, মামার বাসা, মামীমার বাবা উকিল জামসেদ আনোয়ারের বাড়ি আর গরিব পরোপকারী লায়লার নানা কলন্দর সাহেবের সেই কাঠের বাড়ি—যার নিচে ওদিকে মাদ্রাসা বসে। বাড়িটা পুরোনো হলেও প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যের দিক থেকে পুরোপুরি অকৃত্রিম। দূরে পর্বত, নিচে বনভূমি, পশ্চিমে ভগ্নস্তূপ—তার ওপরে পরিত্যক্ত মন্দির, সামনে জলাশয়, খ্যাড়া গাছপালা, ধোঁয়াটে আকাশ।

একরাত হোটেলে কাটানোর পর সকালে বুড়ো কলন্দরের বাড়িতে গিয়ে উঠল সিরাজ।

তিনি উদার হাত মেলে বললেন, 'আইয়ে জনাব। ফজিরেই দেখা, কী দরাজ নসীব। আপনি আজ আমার মেহমান।'

'শুধু আজ কেন?'

'তবে, দুই ভাইয়ে থাকব নাকি চিরকাল?'

'আপনার কাছে আমি আপনার ছেলের মতোও তো থাকতে পারি।'

'ছেলে! আর আমার হৃদয়টা দুর্বল করো না। একটা ছেলেকে কত সাহায্য করে মানুষ করলাম, সে বড় হবার ধাক্কায় বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে মেয়ের বাপের চাবুক খেয়ে আত্মহত্যা করল। জামাইটা যুদ্ধে মরল। মেয়েটা নির্বোধ—গতর খাটিয়ে খাচ্ছে, স্বামীর ভাড়াটে লজঝড় বাড়িটা ছাড়তে পারছে না। আবার তুমি এসে মায়া বাড়াবে?'

সিরাজ বলল, 'শ্রীনগরে আমার থাকার অভাব নেই, মামার প্রাসাদ আছে, মামীর আব্বা বৃদ্ধ উকিল একা থাকেন, সেখানে থাকতে পারি কিন্তু আমি শিল্পী—একা একটু থাকতে চাই—ভব্যতা, ভদ্রতা, সামাজিকতার বিড়ম্বনা প্রতিপদে যদি মানুষকে আবদ্ধ করে রাখে তবে সহজ প্রকাশশক্তিটা তার আহত হয়।'

'ঠিক। আমিও—এই তো আমার জামা-কাপড়—এই তো ছিরি!':

'অথচ গোটা কাশ্মীরে গালিচা শিল্পে বোধহয় আপনার জুড়ি নেই, তাই না?'

'এটা তুমি বাড়িয়ে বলছ। তবে আমার নাম আছে! কিন্তু গরিব হলে শিল্পীর পারিশ্রমিক সস্তা দরেই বিক্রি হয়ে যায়।'

'আপনার কি এর জন্য মনস্তাপ আছে?'

'না না, কিছু মাত্র না। যদি ভাবি আমার যা প্রতিভা, যা ক্ষমতা তার যোগ্য সমাদর হল না, তবে মনস্তাপ বেড়ে যায়—ফলে জীবনটা আরো দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।'

কথা বলতে বলতে কলন্দর বুড়ো সিরাজের ব্যাগ-ব্যাগেজ টেনে নিয়ে গেল। দোতলার একটা বন্ধ ঘরের তালা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকে সিরাজ আশ্চর্য হল। চমৎকার সাজানো ঘর। সুন্দর গালিচা পাতা। মখমলের বিছানা। দামী আসবাবপত্র।

সিরাজ বলল, 'বাঃ! চমৎকার। এই ঘরে কে থাকত?'

'জামাই এলে থাকত। আমার যৌবনকালে থাকতাম। বাবার সাজানো ঘর। কেউ শরীফ-ঘরের মেহমান এলে খুলে দিই।'

'কিন্তু আমি অনেকদিন থাকব।'

'বেশ তো।'

'ভাড়া নিতে হবে।'

'না। তাহলে অন্য জায়গায় থাকতে হবে। আমি এই বাড়িতে একটা সাধারণ ঘরে পড়ে থাকি। মনের কষ্টে এখানে থাকি না। মেয়েটা যে কি একগুঁয়ে বোঝা যায় না।'

একটা রাঙা মতো বুড়ো'লোক চা এনে দিল। তাকে সিরাজের জন্যও রান্না করতে বলল কলন্দর।

সিরাজ গোছগাছ হয়ে বসল।

কলন্দর দশটার পর কাজে চলে গেল টাঙ্গায় চড়ে। মালিক এটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

লায়লার সঙ্গে আজ দেখা করবে কিনা ভাবতে লাগল সিরাজ। হঠাৎ সে গেল না।

সন্ধ্যায় কলন্দর ফিরে এলো।

তাকে নিয়ে বারান্দায় চা খেতে বসল। পুরোনো কালের কথা বলতে লাগল। তার যৌবনকালের কথা যেহেতু সিরাজ ছেলের মতো বলেছে, তাই বুড়ো রেখে ঢেকে কথা বলতে লাগল।

বুড়ো চাকরটার সঙ্গে যখন কাশ্মীরী ভাষায় কথা বলে বুঝতে পারে না কিন্তু তার মামা কি করে ভাষাটা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এক সময় সিরাজ বলে, 'লায়লাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।'

'ওরা আসে না তো।'

'আপনি নিজে আনতে গেছেন, জোর দিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন?'

'না।'

'তবে? ওরা হয়তো ভাবে আপনার কষ্ট হবে।'

'তা বটে। এটাও একটা দিক।'

'মেয়ে যখন স্বামীহারা হয়ে এসে বাপের ঘরে ওঠে তখন তাকে সবাই অনাথ অসহায় ভাবে—তাতে একটা লজ্জা আছে। আত্মসম্মানের লজ্জা।'

'আছে কি? আমি তো তা ভাবি না। আমি ভাবি বাপের কাছে মেয়ে সব সময়ই আসতে পারে। আর বাপ হিসাবে আমি তো খুব নিষ্ঠুর বা কঠোর প্রকৃতিরও নই। আমি মদ খাই না। মামলা মোকদ্দমা করি না। বরং যুবতী মেয়ে একা থাকে বলে আমার ভয় হয়। আর সবাই জানে আমার মেয়ে যেমন রূপবতী তেমনি সতীও।'

'হ্যাঁ।' বলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে লাগল সিরাজ।

বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। দাঁতের গোড়া ফুলেছে বুড়ো কলন্দরের। তাই আটটার পরই খেয়ে নিয়ে শুতে চলে গেল।

বুড়ো চাকরটা বারান্দায় বসে বসে অনেকক্ষণ তামাক টানল আর মাঝে মাঝে খাঁকশিয়ালের মতো চেরাস্বরে কাশতে লাগল।

রাত্রে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে গরম ওমের মধ্যে বিসর্পিল কত ভাবনায় তলিয়ে গেল সিরাজ। কাশ্মীরের দূর এক গ্রামে কিসের আশায় এসে পড়ে আছে সে?

ভাগ্যের হাতে সে যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

॥ ১২ ॥

দিন তিনেক পরে বেড়াতে বেড়াতে একটা মেলায় এসে হাজির হল সে। বেশ লোকের ভিড়। নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক। দোকানীরা বসেছে বেশির ভাগ। গ্রামের লোকের আনাগোনা।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একেবারে সামনা-সামনি চোখাচোখি হয়ে গেল লায়লার মায়ের সঙ্গে। স্থির চোখে দুজনে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লায়লার মা মিষ্টি একটু হেসে মাথা নামাল। লায়লাকে দেখল নাগরদোলার ওপর ঘুরপাক খেতে।

দোলা থামলে লায়লা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। বলল, 'কবে এলে বাবুজী?'

'হ্যাঁ, দিন তিনেক হবে। তোমার আম্মাও এসেছেন!'

হেসে খুশী হয়ে মায়ের হাত ধরল লায়লা।

মেয়েরা সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে মুখের নেকাব তুলে পুতুলনাচ দেখছিল। লায়লার মাও সেদিকে তাকিয়েছিল। যুবক ছেলে-ছোকরাগুলো লায়লার মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। পিছনে পিছনে তারা ভিড় করছিল।

'চলো, ওদিকে যাই'—বলল লায়লার মা। এগোতে লাগল সে।

লায়লা বলল, 'চুড়ি কিনব মা, একটা হাত আয়না, কাঁচের বকটা কি সুন্দর!'

জিনিসগুলো কিনে দিল সিরাজ। লায়লা খুব খুশী।

লায়লার মা কাঠের বেলুনী, রুটি বেলা গোল পিঁড়ে, পেতলের লম্প, দুটো কাঁচের গ্লাসের দামদস্তুর করল। বলল, 'বড্ড বেশী দাম।'

'নিয়ে যান, ভাল জিনিসের একটু বেশি দাম তো হবেই।'

সিরাজ লায়লার মায়ের মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'নেবেন?'

ঠোঁট টিপে হাসল লায়লার মা। সারা মুখে রক্ত ছড়িয়ে গেছে। গণ্ড দুটোয় রক্তিম আভা। অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটিতে নম্র মধুর লজ্জা।

লায়লার কানে কানে সে কি বলল।

লায়লা বলল, 'অন্যদিন নেবে বলছে মা—আজ অত পয়সা-কড়ি নেই।'

'নিয়ে নাও লায়লা—কত দাম দোকানদার?'

কুড়ি টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিল সিরাজ।

সব জিনিসগুলো নেওয়ার জন্য প্লাসটিকের একটা ঝোলাও কিনে দিল।

লায়লার মা মৃদুস্বরে তিরস্কার করল, 'আপনি এত খরচ করছেন কেন?'

'আরো করব। চলো লায়লা হাতী দেখবে, বাঘ দেখবে, সার্কাস দেখবে নাকি? তার আগে এস কিছু খেয়ে নিই।'

লায়লার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সিরাজ। একটা আধুনিক ধরনের রেস্টুরেন্টের মধ্যে। কাজেই লায়লার মাও গেল। পর্দাঘেরা একটা চেম্বারের মধ্যে ওরা তিনজনে বসল। সিন্ধি আর পাঞ্জাবী ছেলেমেয়েগুলো কলেজ পালিয়ে গ্রামের মেলায় এসে হৈহল্লা করে বেড়াতে বেড়াতে এসে ঢুকল রেস্টুরেন্টের অন্যসব খোপগুলোতে।

লায়লা আর সিরাজ একদিকে—সিরাজ বলল, কি খাবে বলো, লজ্জা করবে না, যা খেতে চাও যত টাকার খেতে পার।'

লায়লার মা মাথা থেকে বোরখার টোপ নামিয়ে দিয়েছিল। মসৃণ নিখুঁত সুন্দর নাকের ডগায় তার স্ফটিক স্বচ্ছ ঘামের দানা ফুটে উঠেছে! কালো মেঘের মত বিস্তর চুল ওর মাথায়। হাতগুলো কি সুন্দর; সুডৌল আর লাবণ্য-ভরা। গলা ঘাড় আর বুকের ওপরটা এক লহমা দেখতে পেল সিরাজ—মনে হল সেসব যেন রুপোর পেয়ালা, সোনার জলে ধোয়া।

'উঃ! আমার মাথা ঘুরছে, একটা লবঙ্গ চিবিয়েছিলাম, একটু পানি খাব, ভীষণ ঘাম হচ্ছে।'

মায়ের ক্লান্ত বিহ্বল অবস্থা দেখে ভয় পেল লায়লা।

সিরাজ বলল, 'এই পানি দাও তাড়াতাড়ি, লায়লা তোমার মাকে ধরো, বোরখাটা খুলে দাও—মুখে হাওয়া দাও।'

কিন্তু লায়লা হঠাৎ চোখ উলটে ঢলে-পড়া ভাব দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করল।

সিরাজ ওর পাশে বসে ঘাড়ে হাত দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরের ভারটাকে ধরে রইল।

বুক আর মুখটাকে অনেকখানি খুলে দিল। ফুঁ দিতে লাগল মুখে আর বুকে লায়লাকে জলের ঝাপটা মারতে বলল মুখে।

লায়লা জলের জন্তে খোপটার মুখোমুখি এসে চেঁচাল, 'তাড়াতাড়ি পানি দাও—আমার মা কেমন হয়ে গেছে।'

সিরাজ স্ফুরিত কম্পিত দুটি অধরে আঙুল বুলোলো। ভ্রূ দুটো আঁকল। বুকে হাত রাখল একটু। কোমল দৃঢ়তা সেখানে।

মুখটা শুঁকে দেখলে, লবঙ্গর গন্ধে ভরা। সুগন্ধ রুমাল বার করে মুখটা মুছে দিলে।

জল এনে ছিটে মারতে লাগল লায়লা।

দোরগোড়ায় তখন ভিড় জমে গেছে।

বুড়ো পাঞ্জাবী রেস্টুরেণ্টওয়ালা লোকজনদের সরিয়ে দিল। আঁচে হাওয়া মারার পাখাটা এনে হাওয়া করতে লাগল।

মিনিট দশেক পরে ভ্রম কাটল লায়লার মায়ের। চোখ মেলে তাকাল। নিজেকে সিরাজের আলিঙ্গনের মধ্যে দেখে লজ্জা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে উঠে বসল। জল খেল এক গ্লাস। তারপর গায়ে মাথায় কাপড় দিলে।

'এখন সুস্থবোধ করছেন একটু?' শুধোল পাঞ্জাবী বুড়োটা।

লায়লার মা মাথা নাড়ল সম্মতিসূচক।

সিরাজ বলল, 'খালি পেটে পান, লবঙ্গ, তামাক জাতীয় উত্তেজক জিনিস খেলে হঠাৎ এরকম উত্তেজনা বা ভ্রম আসতে পারে—কিছু খেয়ে ফেলুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কখনো এরকম হয়েছে?'

'না।'

সিরাজ বাইরে এসে বুড়ো পাঞ্জাবীর কাছে জানতে চাইল কি খাবার আছে আর কিই বা খেতে দেওয়া উচিত।

বুড়ো বলল, 'ফিরনী, ফল্লার মেঠাই খেতে দিন। মাংস ওরা আমাদের দোকানে খাবে না।'

ফিরনী-ফল্লার-মেঠাই আনা হল।

লায়লা খাবার দেখে খুশী।

তার মা তখনো স্থির হয়ে বসে আছে। সারা মুখটা লাল হয়ে আছে এখনো। উঠে মুখে চোখে জল দিল সে।

লায়লাকে বলল, 'তুই খেয়ে নে।'

'খান আপনি, লজ্জা করবেন না। আপনারা মা মেয়েতে এক পাশে বসে খান—আমি না হয় এদিকে ঘুরে বসছি।'

মৃদু হাসল লায়লার মা। চামচ নিয়ে সহজভাবেই খেতে আরম্ভ করল।

সিরাজ বলল, 'আপনার আব্বা কলন্দর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

লায়লার মা সজাগ চাহনি তুলল, মৃদুস্বরে শুধোল, 'কেমন আছে আব্বা?'

'ভালই। তবে অভিমান করে বলছিলেন আপনারা নাকি যাচ্ছেন না তার কাছে।'

লায়লা বলল, নানার কষ্ট হবে বলে মা যেতে চায় না। কিন্তু বুড়ীটা যা জ্বালাচ্ছে তিন মাসের বাকি ভাড়ার জন্যে—

'লায়লা!' ধমক দিল লায়লার মা।

'ভাড়াটা না মিটিয়ে দিলে বুড়ীই বা আসতে দেবে কেন?' বলল সিরাজ। তোমাদের কাঁথা-কম্বল কেড়ে নেবে না?'

হাসল লায়লার মা।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা বের হল।

সিরাজ বলল, 'লায়লা, আজ আর সার্কাস দেখে কাজ নেই, অন্য এক দিন এসো—আজ তোমার মায়ের শরীর ভাল নেই, বাড়ি চলো।'

নিশান গাঁয়ের কয়েকটা ছেলে তাদের দেখল।

সিরাজ অবশ্য সুট পরেছিল, বাঙালী বলে তাকে চেনাও যায় না।

অকস্মাৎ সিরাজ দেখল তার মামা আর মামীমা মেলা দেখতে এসেছেন। সূর্য তখন নদীর ওপারে অস্তপাটে বসেছে।

মামা আলী হোসেন সবিস্ময়ে বললেন, 'সিরাজ তুই! কবে এলি?'

'দিন তিনেক হল।'

'তবে কোথায় আছিস? আমাদের বাড়ি যাসনি কেন?'

'আছি সেই শাহী গাঁয়ে—বিখ্যাত গালিচা শিল্পী কলন্দর সাহেবের বাড়িতে।'

মহব্বতপুর আর কলন্দর সাহেব শব্দ দুটি লায়লার মাকে সচকিত করল। সিরাজের দিকে তাকাল একটু। তারপর বলল, 'চলি আমরা আদাব আরজ।'

লায়লা হাত তুলে আদাব জানিয়ে চলে গেল।

মামী মুখ টিপে হাসল।

মামা বললেন, 'আমরা সার্কাস দেখছি, ছ'টার শো আরম্ভ হচ্ছে—তুই যাস তাহলে—'

'ও-কে!' সিরাজ হাত তুলল।

মামাও হাসলেন।

নদীর চরে এসে একাই বসে রইল সিরাজ। মেলায় আলো জ্বলতে লাগল। নানা রকম চিৎকার। চেঁচামেচি। কোলাহল। নদীর জলে মর্মর শব্দ। সব ছাপিয়ে কিছুক্ষণ আগের ঘটনাগুলোকে রোমন্থন করতে লাগল সিরাজ।

লায়লা একটা ফুটোন্মুখ গোলাপ আর ওর মা শত দল-মেলে-ফুটে-থাকা-চির-অম্লান একটা পদ্ম। চারদিকে তার অথৈ জল।

সিরাজ উঠল। অন্ধকার পথ। লোকজন চলাচল করছে। তাদের সঙ্গেই চলল। নিশান গাঁয়ের সেইসব ছোঁড়ার দল মনে হচ্ছে। ওরা লেখাপড়া জানে না। জানলেও খুব অল্প-স্বল্প। ভেতরে ভীতু ভীতু ভাব থাকলেও মস্তান ধরনের প্রকাশভঙ্গি।

একজন বলল, 'এই যে রে—সেই বাঙালী লোকটা—'

'ওরা কোথায় গেল?'

'পাখি উড়ে গেছে—'

'বাড়াবাড়ি দেখলে নাক ফাটিয়ে দেব মেরে!'

হঠাৎ রউফ আর ইসমৎ আলোর দিক থেকে এগিয়ে এসে সিরাজের সামনা-সামনি হয়ে গেল।

রউফ বলল, 'আরে বাপ! আপনি যে হঠাৎ—কবে এলেন?'

'এই তো'—ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকাল সিরাজ।

তারা কেটে পড়ল সিরাজের কটমটে চোখের দৃষ্টি দেখে। মৃদু হাসল সে। মামা বলেন, কাশ্মীরীরা বাঙালীদের সমীহ করে—জানে ওরা বেশি লেখাপড়া জানে, চতুর আর বিচক্ষণ। অনেক ডাক্তার উকিল এখানে বাঙালী।

ইসমৎ হাত ধরল, 'চলুন মেলায় যাই, সারকাস দেখব।'

'প্লিজ! দেখেছি, আজ আর নয়।' সিরাজ হাত ছাড়িয়ে গর্জমান বাসে এসে বসল। সামনে বসে দাঁড়িয়ে আছে ছোঁড়াগুলো। সামনের দিকের সিটে বসে আছে লায়লারা মা-মেয়েতে। এতক্ষণ তাহলে ওরা কোথায় ছিল? জেনে দেখল বাস নাকি এক ঘণ্টা পরে পরে ছাড়ে।

বাস চলতে আরম্ভ করল।

কণ্ডাকটরকে নিশান গাও পর্যন্ত আরো দুটো ভাড়া মিটিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আসার পর সে নেমে গেল। এখান থেকে মহব্বতপুর কম রাস্তা।

॥ ১৩ ॥

কলন্দর সাহেব খুব খুশী। সিরাজকে তার পছন্দ হয়েছে। দিন তো ফুরিয়ে এলো—হঠাৎ যদি একদিন মারা যায় তো এই বাড়িঘর বাগান কে দেখবে? মেয়ে আর নাতনী আছে ঠিকই কিন্তু যারা তার এই বুড়ো কালটায় দেখলে না তাদের ওপরে মনভরা আশীর্বাদ রেখে যাবে কি করে?

কলন্দর বলে, জানো বাবা সিরাজ, পৃথিবীতে কে কার অবলম্বন হয় বলা কঠিন। তুমি পৃথিবীতে কোন প্রান্তে ছিলে, এসে পড়েছ এই হতভাগ্য বুড়োর কাছে। তা তুমি শ্রীনগর শহরে স্টুডিয়ো ঘর করবে কেন? আমার এখানেই করো। অবশ্য শহরে হলে তাড়াতাড়ি পরিচিতিটা ছড়িয়ে পড়ে। তা একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও কাগজে, মহব্বতপুর তো মাত্র তিন মাইল দূর শ্রীনগর থেকে। প্রধান সড়ক আছে—আসারও অসুবিধা নেই। এখানের নির্জন নিরিবিলিতে তুমি তোমার আঁকা-জোকার কাজও করতে পারবে। শুধু ফটোগ্রাফার তো তুমি নও যে স্টুডিয়ো করে কে কখন ফটো তুলতে আসবে তার ভরসায় বসে থাকবে। তা ছাড়া তুমি যে হাজার দশেক টাকা এনেছ জমি জায়গা বেচে কাশ্মীরে বসবাস করবে বলে, টাকা তো সবই ফুরিয়ে যাবে রাজধানী-শহরের ছোট একটা দোকান কিনতে।'

'হয়তো আমার মামাকে বললে সে-জায়গাটা করে দেবেন,'—বলল সিরাজ।

কলন্দর সাহেব তার বাঁকা খাড়া নাক কোঁচকাল। বলল, 'জানি না তোমার মামা মামী কেমন লোক, যদি মদ খায় আর উত্তরাধিকারী না থাকে তবে তাদের ভেতরে একটা হতাশা বা শূন্যতার আগুন জ্বলছে।'

'আপনার ভেতরেও তো তা খানিকটা জ্বলতে পারে?'

পিঠে চাপড় মারল বুড়ো কলন্দর তিরস্কারের ভঙ্গিতে। বলল, 'আমি মদ খাই না বা একেবারে উত্তরাধিকারশূন্য নই। ওরা মায়-বেটিতে আসবে একদিন।'

'কাল ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। মেলায় লায়লাকে চুড়ি, আয়না, কাঁচের বক কিনে দিলাম। বেলুনী পিঁড়ে, লঙ্কা, কাঁচের গ্লাস কিনল আপনার মেয়ে। তারপর কি কাণ্ড! ওদের খাওয়াতে নিয়ে গেলাম একটা পাঞ্জাবী রেস্টুরেণ্টে। আপনার মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ঘাম হতে লাগল তার।

ভ্রম এসে গেল। সে লবঙ্গ চিবিয়ে ঘিঁটে ফেলেছিল—আমি ধরে বসেছিলাম—তারপর মুখে পানির ঝাপটা মারতে হুঁশ হল। পানি খেলে। খালি পেটে ছিল বোধহয়। তারপর ফিরনী ফল্যার, মেঠাই খাওলাম। লায়লার আর সার্কাস দেখা হল না। সন্ধ্যার সময় ওরা বাড়ি গেল।'

কলন্দর সাহেব নখ কাটছিল। চুপ করে বসে রইল।

'তুমি এখানে আছ, বলেছ?'

'না। তবে মেলায় মামা মামীর সঙ্গে দেখা হতে কোথা আছি শুধোতে বাংলায় তাদের বলেছিলাম আপনার এখানের কথা—শাহী গাঁও আর কলন্দর সাহেব শব্দ দুটো শুনে আপনার মেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—জানি না, বুঝতে পেরেছে কিনা। জানেন ওদের তিন মাসের ভাড়া বাকি—না মেটালে বুড়ীটা আসতেও দেবে না।'

'ভাড়া-ফাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওদের আমি আনব একদিন কিন্তু সময় পাই না যে। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেছে তাহলে?'

'ঐ আপনার নাতনীর সঙ্গে। সে একদিন মার খেয়ে অনাহারে মাঠে পড়েছিল মেষ চরাতে গিয়ে, আমি খাবার এনে দিয়েছিলাম সেই থেকেই পরিচয়।'

'আমার মেয়ে তহুরা সাধারণত কারো সঙ্গে তার মেয়েকে মিশতে দেয় না, বা কারো কাছ থেকে এমনি কিছু নিতে দেয় না যদি বোঝে খারাপ উদ্দেশ্য আছে। আর খারাপ উদ্দেশ্য তো অনেক লোকেরই থাকে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক ধনীর ছেলে বা ধনীরা সর্বনাশ করে।'

'আমার উদ্দেশ্য কিন্তু সে রকম ছিল না। লায়লা প্রথমে খাবার কিছুতেই নিতে চায় নি। পরে যখন কথা দিলাম এর বিনিময়ে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না বা কোনো কিছু দাবিও করব না—তখন সে খেলে। আমাকে সে খুব ভাল লোক বলেই জানে।'

'তহুরাও সে রিপোর্ট মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছে, নইলে তোমার দিকে আর এগুতে দিত না, এড়িয়ে চলত ওরা। যাক ওসব কথা, যে চেনার গাছটা বুড়ো হয়ে মারা গেছে—করাত করে ইচ্ছে মতো একটা স্টুডিয়ো বানাও। যদি এখানে তোমার না চলে তবে পরে স্টুডিয়ো তুলে নিয়ে যেও শহরে। নতুন নতুন ডিজাইন এঁকে দাও গালিচার জন্যে আমি বড় বড় খদ্দের মহাজন যোগাড় করে দোব। অনেক শিল্পী এই কাজ করে জীবন চালায়—অবশ্য তাদের কোনো ব্যাপক পরিচিতি নেই।'

বুড়ো কলন্দর বেলা দশটার সময় মহাজনের কারখানার কাজে চলে গেল।

দোতলার ঘরটিতে বসে সামনের সবুজ বন ঢাকা পর্বতটার পাদদেশের শোভা দেখে সিরাজ।• গাছে গাছে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটেছে।

আকাশের গাঢ় নীল রঙের ওপরে পর্বতের সাদা মাথাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

আঁকার কাজ শুরু করে সে। এবার কাশ্মীরের জীবন। বুড়ো কলন্দর সাহেব গালিচা বুনছে—যে গালিচার দাম লাখ টাকা—তার নতুন নকশা।

সপ্তাহখানেক কাজ করার পর সে রউফ আর ইসমৎকে নিয়ে কতকগুলো কাগজের অফিসে গেল, বিশেষ করে একটি বিখ্যাত আর্ট জার্নাল।

এরা নাকি ভাল পয়সা-কড়ি দেয়। বম্বে আর দিল্লীর কাগজগুলোতে ছবি পাঠাল।

কলন্দর বুড়ো গাছ কাটিয়ে করাত করে স্টুডিয়ো বানাতে ব্যস্ত সকাল সন্ধ্যায়। সিরাজও নির্দেশ দেয় মিস্ত্রিদের।

মাদ্রাসার ওস্তাদজীও কাজ দেখেন। ভদ্রলোক ভাল ফরাসী আর আরবী জানেন। সুন্দর বয়েৎ আবৃত্তি করেন। তার ব্যাখ্যা করে দেন উর্দুতে। তিনি ভাষা শিক্ষার একটি বই দিয়ে মাঝে মধ্যে সিরাজকে কাশ্মীরী শেখান।

এক সপ্তা পরে যখন স্টুডিয়ো সাজানো নিয়ে ব্যস্ত সিরাজ নানান পত্র পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়ে বেরুল।

ছবি আঁকিয়ে ছেলেমেয়েরা আসতে লাগল।

স্টুডিয়ো ডল্স হতে না হতেই তার সংবাদ বেরিয়ে গেল।

কর্মব্যস্ত সৈয়দ সিরাজের ছবি : কাশ্মীরে তিনি আজীবন বসবাস করবেন বলে স্থির করেছেন। কলকাতার তিনি একজন নামজাদা শিল্পী। মাত্র আটাশ বছর বয়স। সুন্দর দেখতে, ভদ্র রুচিশীল, অমায়িক। এম. এ পাস। কাশ্মীরের জনজীবনের ওপরে কাজ করবেন। যদিও তিনি আধুনিক শিল্পী তবুও কাশ্মীরী শিল্পের ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করার পক্ষপাতী। তাকে কেন্দ্র করে একটি আর্ট সোসাইটি গড়ে উঠবে। দেশের সর্বশ্রেণীর শিল্পী কলাকুশলীদের কাছে তাঁর আবেদন যেন তারা পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এর সঙ্গে তিনি আবেদন করেছেন শিল্পপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে তারা তাঁকে যেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি মনে না করেন।

সিরাজ ইংরেজী কাগজটায় এই বয়ান পড়ে খুশীই হলো। বলল, 'এসব কে লিখে দিয়েছে?'

ইসমৎ দেখাল রউফের দিকে। বলল, রউফ 'কলকাতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, তাই ওর ওপরে আমরা ভার দিয়েছিলাম।'

কিন্তু শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের কাছে আমি অবাঞ্ছিত নয় বলে করুণা প্রার্থনা করতে যাব কেন?'

'চুপ!' ইসমৎ ঠোঁটে আঙুল দিল। আদৌ এসব উচ্চারণ করবেন না। কাশ্মীর ভূ স্বর্গ এখানে কোনো লোক দরিদ্র নেই! আমার বাবা আপনাকে বেশ কিছু টাকার কাজ দেবেন। আপনার ছবি বা চেহারা দেখে তাঁর পছন্দ হয়েছে। জানেন তো, চেহারা বা দর্শনটাও অনেকখানি। যদিও তার সঙ্গে প্রতিভা বা কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। কুৎসিত দর্শন খুব বড় শিল্পীও আমাদের দেশে বেশী সমাদর পান না। দেখতে ভাল আর অবস্থা ভাল হলে নিচুমানের সাধারণ শিল্পীও প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় বসে থাকে।'

হেঁয়ালি শুরু করল সিরাজ, 'কেন এটা হয়, জনসাধারণ যদিও শুয়োরের পাল, তবু তাদের গণদেবতা বলা হয় কি শুধু পিটুনি খাবার ভয়ে? আর ইচ্ছায় কে চলে? ধনীদের ক্রীড়নক আমরা হব কেন? অথবা দরিদ্রদের সেবা করার নামে তাদের ঘাড়ে পা দিয়ে দেবতাই বা হতে যাব কেন?'

'সংসারে কি আমাদের কোন সৎ কাজ নেই?' যোগ করে দিল রউফ।

ইসমৎ বলল, 'নিশ্চই আছে, জুতো বেচ তোমরা, পদসেবা করো—এখানে ধনী দরিদ্র সবাই আসবে।'

কলন্দর সাহেব, 'মার হাবা'—বলে চেঁচিয়ে উঠল। আজ রবিবারে তার কাজের ছুটির দিন। খানাপিনার আসর বসবে দুপুরে।

একে একে সবাই এসে পড়ল। প্রত্যেকেই সঙ্গে করে ফুল আর খাবার-দাবার বা মাছ-মাংস দুধ-ঘি চাল-ডাল এনেছে।

ফুলের গুচ্ছগুলো সিরাজের হাতে দেয় সকলে।

দশটার মধ্যে যে যা এনেছিল সব তুলে নিয়ে গিয়ে বুড়ো চাকরসহ কলন্দর যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত হঠাৎ লায়লা এসে হাজির হল।

বুড়ো তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ আদর আপ্যায়ন করার পর টেনে আনল সিরাজের কাছে। বলল, 'এই দেখ সিরাজ, তোমার সেই মেষচরানী এসেছে আজ!'

লায়লা আড় চোখে সিরাজকে দেখল। সে তখন আটপৌরে বেশে মিস্ত্রিদের কাজের নির্দেশ দিয়ে নক্শায় কাঠটা কেমন করে বসাবে দেখাচ্ছিল।

বেশি লোকজন দেখে লায়লা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। কাছে এলো সিরাজ। বলল, 'কি খবর। আজ কি তোমার ছুটি নাকি?'

'হ্যাঁ, আজ থেকে ছুটি। আমি আর মেষ চরাব না! আম্মা নিষেধ করেছে।'

'তোমার আম্মা কি আসবে?'

'না। আমাকে পাঠালে। দাদুর শরীর নাকি ভাল নেই, তাই দেখতে এলুম। তুমি এখানে থাকো?'

'থাকি তো! জানো না?'

'কই বললে সেদিন?'

সিরাজ কথা বলতে বলতে লায়লাকে নিয়ে বাড়িতে এলো। নিজের কামরায় আনল। বলল, 'বেশ হয়েছে এসেছো—আজ এখানে অনেক খাবার যোগাড় হয়েছে—তুমি খেয়ে যাবে আর তোমার মায়ের জন্যেও কিছু নিয়ে যাবে, কেমন?'

'হ্যাঁ। এবার আমরা এখানে চলে আসব।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তোমাদের বাড়িভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে তোমার দাদু একদিন তোমাদের নিয়ে আসবে, কথা হয়েছে।'

'কি সুন্দর এই ঘরটা! এটাতে নাকি আমার আব্বা থাকত।'

লায়লা নতুন জামা পরেছে। মানিয়েছে বেশ ওকে। দাদু এসে বলল, 'আয় লাইলী, কিছু খাবি আয়।'

'হ্যাঁ চলো।' সিরাজও বেরিয়ে এলো। লায়লার চুল ধরে হাত ধরে খানিকটা হুড়োহুড়ি করে আদর করল। লায়লা হেসেই খুন। বলল, 'মা কি লজ্জা পেয়েছে, তুমি তাকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলে!'

'ওঃ!' উড়িয়ে দিল প্রসঙ্গটা। সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে বলল, তোমার মা এত লাজুক তো ক্ষেত-খামারে কাজ করে কি করে?'

মোটেই না, আমার মা লাজুক? তাহলে মোল্লা-মৌলবীদের দলের লোকদের সঙ্গে তার লড়াই দেখো নি। আব্বার সেই বড় তরোয়ালটা নিয়ে বেরিয়েছিল। চিৎকার করে, আয় বেটারা, কজন আসবি আয়, এগিয়ে এলে ধড় থেকে তোদের মুণ্ডু নাবিয়ে দোব—সব তখন ভীমরুল দৌড়।'

'কেন ওরকম হয়েছিল?'

'মাকে নিকে করতে চেয়েছিল আজম মৌলবী। তার আরো ছুটো বউ

আছে। তল্লাটের সে জাঁদরেল মৌলবী। তার লোকজন জমি-জিরেত আছে। মাকে পয়লা বেশী রোজ দিয়ে কাজ করাতে চেয়েছিল।'

'চাষী গোলাম নবী কেমন লোক ?'

'সে খুব ভাল। তবে সেও নাকি বলে, নাতবৌ, তোমার চোখ দেখলে রাজারও মাথা ঘুরে যায়।' বলে লায়লা হাসল।

তার রক্তিম গালে একটা টোকা মারল সিরাজ।

কলন্দর সাহেব তাদের দুজনকে খাবার দিল। দুজনে মোড়ায় বসে খেতে লাগল। রাজ্যের খাবার আয়োজন তাদের সামনে। মাছ-মুরগী, ভেড়ার মাংস, আলু, ডাল, লেটুস, গাজর, স্কোয়াস, ফল, বিস্কুট, পাউরুটি কত কি।

সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েই সিরাজ চলে এলো স্টুডিয়োতে।

ওরা সবাই রোদ্দুরে বসে আছে একদল প্রজাপতির মতো। আর্টের বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে।

রিজিয়া এসে নামল টাঙ্গা থেকে। সঙ্গে তার ফুল ফল আহার্য—অনেক রকম সওদা।

ফুলের তোড়া এনে হাতে দিল সিরাজের। বলল, 'আমাদের পরম ভাগ্য যে আপনি শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে থাকার সংকল্প নিলেন। স্টুডিয়ো ভক্স, নামটা আমার ভীষণ পছন্দ।

সিরাজ হাসি মুখে ওর ফুল নিল।

রউফ ওর জিনিসপত্রগুলো পৌঁছে দিয়ে এলো।

কলন্দর সাহেব সংবাদ পেয়ে গজগজ করতে লাগল, ওই হারামজাদীটা আবার আমার এখানে কি করতে এসেছে ? দেখো একটি রত্নের মাথা খেয়েছে আবার সিরাজকেও ফাঁদে ফেলবে নাকি ?'

রউফ বলল, 'না চাচা, ওসব বিষয়ে সিরাজ সাহেব খুব সজাগ মানুষ। ধনীদের ওপরে ওর একটা অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ আছে মনে হয়। যাক-গে, তুমি কিন্তু রিজিয়া সম্বন্ধে তেমন কোনো কড়া মন্তব্য করো না। মানুষকে তার ভুল সংশোধন করার সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া এখানে শিল্পীর কাছে বিচিত্র ধরনের সব লোক আসবে।

'শোনো শোনো, সংশোধন ওদের হয় না, ওরা ধনের অহংকারে সব ভুলে যায়। ইচ্ছে করছে ওকে ঘাড় ধরে এখান থেকে তাড়িয়ে দিই। সিরাজ সাহেবকে জানিয়ে দিও ওর সব কথা।'

'উনি জানেন। এবং সময় মতো উনিই ওর বিবাহিত জীবনের ট্র্যাজিডির কথা তুলে মুখোশটা খুলে দেবেন।'

'আমি ওর স্বামীকে খরচপত্র দিয়ে যে মানুষ করেছিলাম—সেকথা কি ওর অজানা আছে! ওর লজ্জা থাকলে এখানে আসে! ভেবেছিলাম ছেলেটার সঙ্গে আমার মেয়ের সাদি দোব। ছেলেটা উচ্চাশায় ছুটে গেল। তার বাপও গোত্তী—সে শালা বুড়ো কিবরিয়া এখন ছেলের শোকে পাগল, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। একে-ওকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করে আমার নাসিরকে দেখেছ? সে ফার্স্ট হয়েছিল বলে নাকি তার মাথা হিন্দু সরকার কিনে নিয়ে গেছে। কলন্দর বলে, 'সে বিলেতে পড়তে গেছে।'

রউফ একটা আখ চিবুতে চিবুতে স্টুডিয়োর সামনের ছেলে-মেয়েদের কাছে এলো।

শান্তিনাথ দেউশঙ্কর নামে একটি সুন্দর চেহারার কৃষ্ণকায় তরুণ এসেছিল ইসমতের সঙ্গে। সঙ্গে তার অ্যাকর্ডিয়ন। একটার পর একটা সিগারেট খায়। রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি-হাসি মুখে এখন সে বাজাতে আর গাইতে আরম্ভ করল।

তাম্বুরা বাজাতে লাগল ইসমৎ।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো। রাস্তার লোকজন দাঁড়িয়ে গেল। সাধারণ গ্রামবাসীরা অ্যাকর্ডিয়ন বাজানো শোনে নি কখনো। একই সঙ্গে জোয়ালো সুর।

হিন্দীগান বেশ চমৎকার গায় শান্তিনাথ।

লায়লা এসে একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে শান্তিনাথ আর তার বাদ্যযন্ত্রীকে দেখতে লাগল। দেখতে লাগল দুলে দুলে তালে তাল দিয়ে তামবুরা-বাজাতে-থাকা ইসমৎকে।

রিজিয়া চুপচাপ বসে থাকে।

রমজান বদমায়েশী ভঙ্গীতে নাচ শুরু করেছিল কিন্তু রউফ আর সিরাজ একযোগে তাকে নিষেধ করল। বুড়ো কলন্দর আসছে—ইঙ্গিতে দেখালে।

রমজান বসে পড়ল।

কলন্দর বলল, 'আমি একটা কাওয়ালী গাইব।'

আসর জমে উঠল। তালি বাজাতে লাগল রমজান। সিরাজ নম্র চোখে তাকিয়ে রইল কলন্দরের দিকে।

কিন্তু সবাই শান্তিনাথের হিন্দী গান শুনতে চাইল। শান্তিনাথ আবার গাইতে শুরু করল।

কলন্দর যেন এতদিনে গ্রামের লোকদের কাছে একটা রাজকীয় সম্মান পেয়ে গেছে।

দুপুর পর্যন্ত হৈহুল্লোড় করে কাটল।

তারপর খানাপিনার আসর বসল কলন্দরের বাড়ির লম্বা-দৌড় বারান্দায়।

বিরানী পোলাও আর নানান রকম তরকারী পরিবেশন করল কলন্দর। লায়লাও তাকে সাহায্য করতে লাগল।

সবাই তারিফ করল চাকর মাহমুদ রাঁধে ভাল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে এসে দোতলায় সিরাজের ঘরে আর বারান্দায় বসল।

সিরাজ অ্যাকর্ডিয়নটা নিয়ে খানিকটা সময় এলোমেলো রিড টিপে দেখল।

হঠাৎ সে পরিচিত একটি হিন্দী গানের গৎ বাজাতে শান্তিনাথ বলে উঠল, 'আরে, আপনি তো ওস্তাদ আছেন দেখছি—বাজান বাজান।'

সিরাজ লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল। বলল, 'না না, আমি ওস্তাদ নই, এমনি একটু শিখেছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে। অবশ্য বাংলা গান দু'চারটে গাইতে পারি কিন্তু এত চাপ খেয়েছি যে বসতে পারছি না। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি শুলাম একটু।'

সিরাজ শুয়ে পড়ার পর আসর আর তেমন জমল না।

শান্তিনাথ আর ইসমৎ জানাল এখন তারা চলে যাবে।

রউফ ঘড়ি দেখে বলল, 'আমিও চললাম সিরাজভাই।'

'আচ্ছা।' সিরাজ হাত নেড়ে জানাল। তন্দ্রা এসেছিল অর চোখে।

সবশেষে রিজিয়া কাছে এলো। হেঁট হয়ে পড়ে বলল, 'আমিও যাচ্ছি কিন্তু।'

সিরাজ পাশ ফিরে শুলো। বলল, 'আমি যে বাড়িতে আছি সে বাড়ির কর্তার ইচ্ছা বা রুচির সঙ্গে আমার সব সময় যে মিল হবে এমন কথা নয়. তবে তাঁকে সমীহ করে চলাও আমার উচিত। তিনি পছন্দ করেন না যে তুমি তাঁর বাড়িতে আস। কেননা তাঁর কাছে তুমি একটা প্রচণ্ডতম দুঃখের কারণ হয়ে আছ।'

'কিন্তু আপনি একতরফা বিচার করবেন না—আশা করি সব কথা আপনি একদিন আমার কাছে শুনবেন।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে স্টুডিয়ো ক্লাসে কি আমি এরপরে কখনো আসতে পারব না?'

'কি আমি বলব বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আমি চললাম।' রাগভরে রিজিয়া কাঠের পাটাতনে তার জুতোর শব্দ তুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙল সিরাজের।

লায়লা তার পা ধরে নাড়া দিয়ে ডাকছে। লায়লা উচ্ছল খুশী ওর মোটা চাদরখানার দিকে তাকিয়ে—ওটা বোধ হয় ওর নানা দিয়েছে।

লায়লা বলল, 'নানা অনেক খানা বেঁধে দিয়েছে—বুড়ী বাড়িউলীকেও দিতে বলল। তুমি কবে যাবে আমাদের বাড়ি?'

'না যাব না, তোমাদের বাড়ি তো সেটা নয়—এইটাই তোমাদের বাড়ি—এখানেই তোমাদের আসতে হবে।'

বুড়ো-আঙুল দেখাল লায়লা।

সে চলে যেতে গেলে সিরাজ বলল, 'বুড়ীর তিনমাসের বাকি ভাড়াটা যদি নিয়ে যেতে চাও, দিতে পারি।'

'মা যদি মারে!'

'মারুক-না দু'এক ঘা! টাকা বার করে দিল সিরাজ।

'যদি না নিতে চায় তবে বলো আমি খুব রাগ করব, আর দেখা হলেও, কথা বলব না।'

'আচ্ছা বলব! বলব যে পরে দিয়ে দিতে বলেছে।' বলেই লায়লা পালিয়ে গেল।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল সিরাজ। কলন্দব লায়লার সঙ্গে বাগানটা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবার এসে শুয়ে পড়ল সিরাজ।

॥ ১৪ ॥

লায়লা বাড়িতে ফিরে দেখল তার মা তহুরা বিবি তেমনি বসে বসেই রিপুর কাজ করছে। এক শালকরের দোকান থেকে লায়লা। গরম কাপড়-চোপড়গুলো এনে দেয়। ছেঁড়া-কাটা জায়গাগুলো রিপু করে দিলে যা মজুরি পায় তাও প্রায় চাষে কাজ করার সমান।

ঘরের কোণে ঠাণ্ডায় বসে জমে যেতে হয় বলে এই কাজ তেমন পছন্দ করে না তহুরা। বাইরের মাঠের কাজে গায়ে রোদ লাগে ঘাম হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

কিন্তু চাষী গোলাম নবীর এখন আর তেমন কোনো কাজ নেই। গম আর ছোলা ঝাড়াই-মাড়াই শেষ হয়ে গেছে।

আগে গম ভাঙা হত হামান দিস্তার মতো বড় একটা পাত্রে। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। গোলাম নবীর বাড়ির মেয়েরাও সে কাজ করত। তহুরা বিবি ছিল তাদের সঙ্গী।

নতুন বিধবা হবার পর বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তাকে কোমরে দড়ি দিয়ে যখন গম পেষাই করাত শারীরিক যন্ত্রণায় সে এতই কষ্ট পেত যে মাঝে মাঝে কাঁদত। রাত্রে আর ঘুমোতে পারত না বুক পিঠ কোমর হাতের যন্ত্রণায়। জ্বর হত তার। হাবিলদার আবদুল হামিদের ছবিটা মোমের আলোয় ধরে কাঁদত: 'তুমি আমাকে এইভাবে রেখে গেলে……তুমি ছিলে গরিবের ছেলে, মেষ চরাতে আমার সঙ্গে মাঠে মাঠে। বনজঙ্গল থেকে ফল পেড়ে দিতে—পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যেতে, ছাগলের দুধ দুয়ে খেতাম দুজনে।'…

আমাদের প্রেম-ভালবাসার কথা যখন লোক জানল আমাকে আমার বাপ ঘরে বন্দী করল। তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর, আর তোমার আঠারো। তোমার বাপ তোমাকে জুতো দিয়ে মারল। তুমি মনের ধিক্কারে সংসার ছেড়ে চলে গেলে।…তারপর সৈন্য বিভাগে নাম লেখালে। এক বছর পরে ফিরে এসে সোজা আমার বাপের কাছে দাবি জানালে আমাকে বিয়ে করার জন্য। আমার আব্বা প্রথমে রাজি হয় নি। একজন সৈন্যকে সে মেয়ে দেবে। কিন্তু তুমি যখন বললে, কত সোলজারের বউ আছে, তারা বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। কেউ বা ছুটি পেলে বাড়িতে আসে জীবন ভরেও কখনো যুদ্ধ হয় না—কতলোকের

বউ বুড়ী হয়ে গেল। তখন আব্বাও বুঝেছিল তোমার দিকেই আমার মনের টান। আর কাঁচা বয়সে যাকে একবার ভালবেসে ফেলে মেয়েরা তাকে আর সহজে মন থেকে সরাতে পারে না। মনের মধ্যে প্রথম প্রেমের স্মৃতি থেকে যায়। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে তুমি আব্বাকে পিস্তল দেখালে। আব্বা ভয় পেল। বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। আমাদের বিয়ের পর আনন্দের দিনগুলো মনে পড়ে।'

'তুমি ছুটি নিয়ে এলে, বিয়ের পর একমাস রইলে। তারপর ক্যাম্পে নিয়ে গেলে।

তোমার পদের উন্নতি হতে লাগল। তারপর সীমান্ত এলাকায় যখন সংঘর্ষ বাধল। আমাকে ফেরত আনল।

আব্বার মেজাজ তখন খারাপ। যে ছেলেটাকে পড়িয়ে মানুষ করছিল সে বড়লোকের মেয়ে রিজিয়াকে বিয়ে করার পর আত্মহত্যা করেছে। আমাদের দেখে আব্বা বললে পরের বোঝা বয়ে কি লাভ। মেয়ে হল কলমের গাছ, অন্য জমিতে পুঁতে দিয়েছি, সেইখানেই ফুল-ফল ফলাক। হয় আমি আবার বিয়ে করব, না হয় বাড়িটাকে মাদ্রাসা বানাব।'

'হামিদ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো এই বুড়ীর বাড়িতে। বাড়িউলী নাকি তার দূর সম্পর্কের খালা আম্মা হত।'

বুড়ী বলল, 'থাক, তবে জানিস তো বাবা, আমারও ভাঙা কপাল, কে আমাকে দেখবে? হামিদ বলল, ঠিক আছে, তোমাকে মাসে কুড়িটাকা করে ভাড়া দোব। বুড়ী বলেছিল, কেন তোমাদের নিজের বাড়ি কি হল। ও বলল, না, সেখানে আর আমি কখনো যাব না। যে মেয়ের জন্যে জুতোর বাড়ি খেয়ে সংসার ছেড়ে গিয়ে সৈন্যবিভাগে নাম লেখালাম তাকে নিয়ে আর সেখানে ওঠা যায় না।'

'আবদুল হামিদ চলে গেল—সীমান্ত সংঘর্ষের পর সে হাবিলদার হল। মাস-খানেক ছুটি পেয়ে এলো আমার কাছে।'

'দেখলাম কি সুন্দর চেহারার হয়েছে। যেমন গোলগাল তেমনি তাজা। আর ময়ূরের পালক আমার মুখের ওপরে বুলোতে বুলোতে বলত, এত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি।...'

'সারারাত তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়। কি অপূর্ব সুন্দর তোমার চোখ, তোমার ভ্রূ, তোমার ঠোঁট। নাক, চুল, হাতগুলো...'

'হায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবদুল হামিদের ছবিটা বুকের ওপরে চেপে ধরেছে তহুরা বিবি।

আবার স্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে কখন।

রান্না করতে করতে বুড়ী খালা-আম্মা-বাড়িউলীকে বলেছে, হাবিলদার হবার পর লায়লা হল, তারপর সেই লোক যে গেল আর ফিরল না।'

'পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। সেই যুদ্ধ মারাত্মক রূপ ধারণ করল। প্যাটন ট্যাংকের যুদ্ধ। হঠাৎ সংবাদ এলো, আমার মাথায় বাজ পড়েছে! হাবিলদার আবদুল হামিদ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। প্যাটন ট্যাংক ধ্বংস করেছে সে একাই দুঃসাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে। কাগজে কাগজে তার ছবি বেরুল। আর আমি মাথা কুটে কুটে কাঁদলাম। আমার ঘরের মানুষ আর ফিরে এল না—

সে সব মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র হয়ে গেছে। সাহায্য এলো। টাকা খেতাব, ফটো, হাতে দিয়ে গেল সৈন্য-বিভাগের বড়কর্তারা।

কিন্তু একদিন মনে হয়, আমি তো সব চাইতে বড় সম্পদ পেয়েছি। আমার মাঠের রাখাল সারা দেশের বীর শহীদ বলে সম্মান শ্রদ্ধা পেয়েছে। আমার বুক খালি করে গেলেও বসুমতী তার বুকে ঘুম পাড়িয়েছে।'

তারপর পেট তো শোনে না। আমি কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুছতে মুছতে চাষী গোলাম নবীর বাড়ি কাজ করতে গেলাম। পাড়ার দুটো মেয়ে কাজ করতে যেত। তারাই সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মোল্লা পন্থীরা আমাকে দেখে ঠাট্টা করত। দেশের জন্য যে বীব শহীদ প্রাণ দিয়েছে তার বিধবা বউ এখন পরের জন খাটতে যাচ্ছে। পেনসনের ব্যবস্থা হল কিন্তু তাও যৎসামান্য। আব্বা এসে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু আমি গেলাম না। কি হবে গিয়ে, এখানে আমার স্বামীর স্মৃতি আছে। সে এখান থেকেই বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, যাবার আগে আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে একখানা তলোয়ার কিনে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল যদি না ফিরি—জানি তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে—কেউ এগুলে, তোমার অসম্মান করতে চাইলে, এই তলোয়ারটা ব্যবহার করবে।

বার বার একই স্মৃতি—বারবার একই স্মৃতি রোমন্থন। তার মধ্যে দিয়েই মেয়ে লায়লা বড় হয়ে উঠল। দুসরী কেতাব পর্যন্ত পড়ার পর তাকে মাদ্রাসা ছাড়িয়ে পেটের দায়ে মেষ চরাতে পাঠাতে হল।

মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে কোত্থেকে বাঙালী বাবু সিরাজ সাহেবটা এসে হাজির হল। সুন্দর ছবি আঁকে। খুব দয়ামায়া। আকলিমা বুড়ী যেদিন লায়লাকে মেরেছিল ঐ বাঙালী বাবুই খাইয়েছিল। এখন ওর সঙ্গে মাঠে ময়দানে দেখা করে—তার জীবনে যেমন প্রেম-প্রণয় ঘটে গিয়েছিল তেমনি যদি হয়? বদনাম

রটবে, বাঙালী লোকরাও তেমন বিশ্বাসী নয় নাকি—বিয়ে করে ছেলেমেয়ে রেখে পালায় কিন্তু সিরাজকে দেখে তা মনে হয় না। লোকটা যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি শিক্ষিত আর মার্জিত রুচির। সব বাঙালীই তো আর একরকম হতে পারে না। কাশ্মীরের সব মানুষ কি এক রকম।

তবু সাবধান হওয়া ভাল। তাছাড়া আকলিমা বুড়ী একেবারে জাঁহাবাজ। অত বড় মেয়ের চুল ধরে টানে। গাল মুচে দেয়। থাক আর ওর মেষ চরাতে গিয়ে কাজ নেই। বরং সেলাই ফোড়াইয়ের কাজ শিখবে।

কিন্তু সিরাজ দেশে চলে যাবার পর হঠাৎ যে আবার কাশ্মীরে এসে উদয় হবে আর মেলার মধ্যে এমনভাবে দেখা হয়ে যাবে তা কি ভেবেছিল কোনোদিন? খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে যা কাণ্ড হল!

ভাবতে গেলে লজ্জায় এখনো লাল হয়ে যায় তহুরা।

কিন্তু মেলার মধ্যে ওর পরিচিত বাঙালী এক দম্পতিকে শাহীগাঁও আর কলন্দর সাহেবের কথা কি যেন বলছিল না?

সিরাজ তার ছবি এঁকেছে! কি সুন্দর ছবিটা। তাকে কি এতই সুন্দর দেখতে?

চাষী গোলাম নবীর নাতিটা কলেজে পড়ে। সে গতকাল শহর থেকে একটা চকচকে কাগজের চওড়া মতো বই কিনে এনেছে—তাতে সুন্দরী তহুরার ছবি বেরিয়েছে। তহুরা বিবির নাম অবশ্য নেই। 'কাশ্মীরের এক কৃষাণ সুন্দরী'—এই নামে নাকি ছবিটা বেরিয়েছে। মেয়েরা সবাই হাতে হাতে দেখল। সবাই চিনল—এযে তহুরা বিবি।

আরো কতকগুলি ছবি ছাপা হয়েছে শিল্পীর নিজের ছবির সঙ্গে।

গোলাম নবী বুড়ো চোখে দড়ি বাঁধা ভারী ভারী লেন্সের চশমা চড়িয়ে পরখ করে দেখার পর বললে, হুম! এতো দেখছি সেই বেটা বাঙালী শিল্পীটা। তহুরার ছবিটা বেশ এঁকেছে কিন্তু। ছবিটার নাম 'হাবিলদার আবদুল হামিদের বউ দিলেই আরো ভাল হত।'

মেয়েরা সবাই ঠাট্টা করতে লাগল।

চাষী গোলাম নবীর আর কাজে যাওয়া যায় না।

লায়লা বলল, জানো মা, নানা অনেক খাবার দিয়েছে।'

লায়লাকে আসতে দেখে তহুরা ভাবান্তর কাটিয়ে মুখ তুলে তাকাল। রিপু-করতে-থাকা শালটা সরিয়ে রাখল।

'এই ছ্যাখো মা।'

তাড়াতাড়ি বড় আকারের পাত্রটা খুলে ফেলল লায়লা।

তহুরা দেখে খুশীতে বলে উঠল, 'সত্যিই তো রে লায়লী, এযে অনেক খাবার। মোরগের রান, ভেড়ার রান কতো মাছ-গোস্ত, কাবাব-ফল-মেঠাই!'

বয়ে আনতে আনতে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।'

'কেন হঠাৎ এত খাবারের ঘটা কেন? মিলাদ-উৎসব কিছু হয়েছিল নাকি?'

'না গো মা, গিয়ে দেখি ইলাহি কাণ্ড। নানার বাড়ি আছে সেই সিরাজ সাহেব! আব্বা যে ঘরটায় নাকি থাকত, সেইটাতে থাকে।'

'বিয়ের পর সপ্তাখানেক মোটে ঐ ঘরটায় আমরা ছিলাম।'

'তা শোনই না, বুড়ো না সেই মরা চেনার গাছটা কাটিয়ে করাত করে সিরাজ সাহেবের জন্য একটা দোকান ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। কত বন্ধু-বান্ধবীরা এসেছে। তারাই সব খাবার এনেছিল। গান বাজনা করলে। সবাই খানা খেলে। আমিও খুব খেয়েছি। জীবনে এত ভাল খাবার কক্ষনো এত পেট ভরে আমি খাইনি, আর জানো মা, সিরাজ সাহেব না নানার ওখানে বোধ হয় এবারে বরাবরের জন্যে থাকবে।'

তহুরা বলল, 'সেই বোধহয় খাবারগুলো দিতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ, না বললেও নানা দিত। আর এই টাকা।'

'টাকা! এতগুলো টাকা কিসের?'

'মা তুমি রাগ করে না, বাড়ি ভাড়াটা বুড়ীর দিয়ে দাও, সিরাজ সাহেব দিয়েছে। বলেছে, তোমার মা যদি না নেয়, রাগ করব, আর রাগ হলে বলেছে ওটা পরে ফেরত দিতে।'

'হুঁ!' বলে মেয়ের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে তহুরা একটা ডিশ এনে কিছু কিছু খাবার তুলে নিয়ে বুড়ীকে দিতে গেল।

বুড়ী যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল গলায়-দোলানো-ঘণ্টা-নিয়ে-জাবর-কাটতে-থাকা লালচে রঙের ছাগলটার পাশে।

সে জেগে উঠে বলল, 'কি বলিস লা? বাড়ি ভাড়াগুলো দিবি আজ? ভিখে করে কি খাবার আনলি মোর জন্তে? যা যা নিয়ে যা—তোরাই কি খাস তার ঠিক নেই।'

তহুরা বলল, 'খাও খালাআম্মা, আমার বাপ পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাদের জন্য আছে।'

'তোর বাপটা আবার একটা মনিষ্যি নাকি। আমাকেও যদি নিকে করত তার সংসারটা ভেসে যেত না।'

বুড়ীর মস্করায় হাসল তহুরা।

বুড়ী বলল, 'খাই তবে। লাইলী এক গেলাস পানি দিয়ে যা বুন।'

বুড়ী খুব খেল। দোয়া করল।

সারাদিন অভুক্ত ছিল তহুরা। রোজা করেছিল সে। লায়লার বাপের আজ জন্মদিন। লায়লাকে বলেছিল আজ আর রান্না হবে না, তোর নানার বাড়ি যা—শুনলাম তার শরীর নাকি ভাল নেই। তাছাড়া কাঠ কয়লাও তো কিছু নেই। চাটটি জ্বালানী কাঠ যোগাড় করবি এসে।

লায়লা একপায়ে খাড়া হয়ে ছিল—মা বলতেই নতুন জামাটা গায়ে গলিয়ে দিয়েই সে ছুট মারল।

তার নানা যে গায়ের চাদরটা দিয়েছে সেটাও দেখল তহুরা।

এফতার করার পর আলো জেলে খেতে বসে তহুরা বলল, ঐ চাদরটা তোর নানার নয়, তোর বাপের।'

'আমার বাপের।' চাদরটাকে চেপে ধরল লায়লা তার বুকের ওপর।

'হ্যাঁ, ওটাকে আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। যে কদিন বিয়ের পর ঘরটাতে ছিল ঐ চাদরটা মুড়ি দিয়ে থাকত। যেদিন আমরা গেলাম এ চাদরটাকে খুঁজে পাই নি। কোথায় ছিল ওটা?'

'কি জানি। নানা তোরঙ্গ খুলে বার করে দিল। দেখতে পাও না কি রকম বিষ কপূরের গন্ধ।' লম্বা করে ঘ্রাণ নিল লায়লা।

ঠাণ্ডা কনকনে আবহাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পুরোনো ময়লা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। লায়লা তার গা থেকে তার বাপের চাদরটা খুলল না।

লায়লা বলল, 'মা তুমি আমার পেটে সুরা ইয়াসিন পড়ে ফুক্ দাও নইলে যা খাওয়া খেয়েছি হয়তো আজ মরেই যাব।'

তহুরা তার মেয়ের পেটে হাত বুলোতে লাগল। সুরা ইয়াসিন পড়ে তিনবার ফুক দিল। শুধোল, 'তোর নানা তাহলে কাল সন্ধ্যেয় আসবে বলেছে?'

'হ্যাঁ, আমাদের গোছগাছ করে তৈরি হয়ে থাকতে বলেছে। নানা আমাদের নিয়ে যাবে।'

তহুরা বলল, 'চলেই যাব এবার। ইখানে আর পড়ে থেকে কি করব।

গোলাম নবী বুড়োর বাড়ির কাজও তো গেল। ও রকম করে লোকটা আমার ছবি এঁকে ছেপে দিল কেন বলতো। লোকটা খারাপ।'

লায়লা জোর প্রতিবাদ করল। 'উঃ! বলো না আর। অমন ভাল লোক আর হয় না। কক্ষনো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। দোতলার ঘরে তো নিয়ে গেল হাত ধরে—আমার বুকের ভেতরে খালি ধড়াস ধড়াস কচ্ছিল। কী ভয় হচ্ছিল! কিন্তু লোকটা ভাল। আমাকে বসিয়ে দেখাতে লাগল, এই তার ঘর। আর নিজে সে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। এমন লজ্জা করতে লাগল। জানো মা, সিরাজ সাহেব আমারও ছবি এঁকেছে।'

তহুরা আর কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল দুজনের।

তহুরা যখন সিরাজের চোখ দুটোর বিহ্বল চাহনির কথা ভাবল সে নিজেও যেন ভেতর থেকে নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। ভাবল, লোকটা তাকালে আমিও কেমন হয়ে যাই—মনের বল হারিয়ে ফেলি। বলল, 'ওর টাকা ফেরত দোব কেমন করে? আগেও তো তোকে দিয়েছে একবার পাঁচ টাকা, আবার দশ টাকা মেলায়, কত কিছু কিনে দিলে, খাওয়ালে, গাড়ির ভাড়া দিলে। ঠিক আছে ওর জন্তে যদি আমাদের কাজ-কাম বন্ধ হয় তবে ঘর ভাড়াটা দিয়েছে যখন নিয়ে বুড়ীকে ফেলে দিয়ে চল কাল এখান থেকে চলে যাই। আল্লা যা রেখেছে ভাগ্যে তাই তো হবে।'

লায়লা বললে, 'কচু হবে! নানা তো আছে।'

তোর সঙ্গে যদি তোর নানা ঐ সিরাজ সাহেবের সাদী দিতে চায়?'

'ইস্। আমার বয়স চোদ্দ আর ওনার বয়স বুঝি তিরিশ—ডবলেরও বেশি।'

'তাতে কি। মেয়ের চেয়ে ছেলেদের বয়স ১০।১৫ বছর বেশি থাকলে ক্ষতি নেই।'

'ইঃ!' জিব বার করে ভেংচি কাটল লায়লা। বলল, 'তুমি বিয়ে করো গিয়ে!'

তহুরা বলল, 'আমি বিয়ে করব? শোনো মেয়ের কথা!'

'কেন তুমি বুড়ী হয়ে গেছ?'

'জানিস আমার কত বয়স?'

'জানি, আটাশ। ঐ বয়সে ভদ্দর লোকদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়।'

'তবে তোর মায়ের আবার বিয়ে দে—আবার তোর একটা বাপ তৈরী কর।'

'করবই তো।'

মেয়ের গালে আদরের ঠোনা মারতে লাগল তহুরা। বলল, 'আমার আর বিয়ে সাদী করার ইচ্ছে নেই—তোর বিয়ে দিয়ে জ মাই করে একটা পেটের ভাতটা কোনো রকমে জুটিয়ে নেব বাপের ভিটেয় পড়ে থেকে। তোর নানাও তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লায়লা ঘুমিয়ে পড়ল। তহুরার চোখে কিন্তু ঘুম এলো না।

তার স্বামীর স্মৃতির ওপরে সিরাজের উপস্থিতিটা কেবলই ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া পানার মতো আবার জলের দিগন্ত জুড়ে ঢেকে আসতে লাগল।

একি জ্বালা।

সকালেই বাকি ভাড়াটা মিটিয়ে দিল তহুরা। এবং বলে দিল তারা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আজ কিংবা কাল। বুড়ী বাড়িউলী এখন নতুন ভাড়াটে রাখতে পারে।

বুড়ী বাকি ভাড়াগুলো পেয়ে খুশী হলেও বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গে হঠাৎ যেন চুপসে গেল। বলল, 'থাকবি না কেন, বুড়ো লোকটার ঘাড়ে যেয়ে চাপবি।'

বুড়ীর কোনো কথার উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে মা মেয়েতে 'কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে শ্রীনগর শহরে যাবার জন্তে তৈরি হল। আজ তহুরার উইডো পেনসন ড্র করার দিন। বাৎসবিক পেনসন রিন্যু হবার জন্য তিনমাস বাকি পড়েছে—সেগুলো আজ এক সঙ্গেই পাবে।

পথের মোড়ে এসেই তারা বাস পেয়ে গেল।

পাশাপাশি বসল মা-মেয়েতে? বোরখা মুড়ি দিয়ে আরো কয়েকজন মহিলা চলেছে পেনসনের জন্তে। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের বিধবা পত্নী আছে কয়েকজন। সোনামার্গে এসে গাড়ি থামল। আরো কিছু লোকজন উঠে এলে গাড়ি ভরে গেল।

শ্রীনগর শহরের দক্ষিণাঞ্চলেই ঘন বসতি। সেদিকেই কোর্ট-কাছারী দোকান-পাট বেশি। শহর ছেড়েও দক্ষিণে জম্মুর দিকে এই বসতি বেড়ে চলেছে। দক্ষিণে গম আর উত্তরাঞ্চলে যা ধান হয় কাশ্মীরবাসীদের তাতে চলে না। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ থেকে খাদ্যাদি আসে।

ট্রেজারি থেকে টাকা তুলতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

তারপর তারা বাস ধরে আবার বাসায় ফিরতে বিকেল।

তহুরা বলল, 'এখন আর রান্নার ঝামেলা করে কাজ নেই লায়লী—তোর নানা আসবে তো সন্ধ্যেবেলা। গোছগাছ করতে সময় লাগবে। তুই কাল যেসব ফল এনেছিলি সেইগুলো কুঁচো, আর না হয় চারখানা রুটি গড়ে নে। আটা বার কর।'

'তার চেয়ে পাউরুটি কিনে আনি—পয়সা দাও।'

'তাই কর কিন্তু গা-হাত ধোয়ার জন্যে পানি তো গরম করতেই হবে—চুলো যখন জ্বালতেই হচ্ছে তখন আর পাউরুটি কিনতে যেয়ে লাভ নেই। ক্যাসিয়ার বাবুটা হারামি আছে, খালি খালি বসিয়ে রাখবে—বলে এখনো অ্যাডভাইস আসে নি। পাস বইয়ের সঙ্গে আমার ছবির মিল আছে কিনা দেখবার সময় বোরখার নেকাব তুললে লোভী কুত্তার মতন তাকিয়ে থাকে। বলে, আহা! এমন কাঁচা কচি মুখ, এমন সুন্দর চোখ—তোমার বিধবা বেশ সাজে না। তহুরা বিবি আবার তুমি সংসার করো—ফুলের মতন এমন জীবনটা নষ্ট করো না। আধবুড়ো লোকটার গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে। নেকাব ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গোমরাই। কেন এই ছবির সঙ্গে মেয়েদের মিলিয়ে দেখার জন্যে কোনো-মেয়েকে রাখা যায় না? আমার এই রূপটাই হয়েছে কাল। উনুন জ্বেলে জল গরম করে নিয়ে বারান্দার একপাশে গিয়ে গা হাত পা মুখ মাজতে লাগল তহুরা।

লায়লা ততক্ষণে রুটি গড়ে নিয়ে সেকতে আরম্ভ করেছে।

স্নান করার সময় সে আড়ে আড়ে মায়ের দিকে তাকায়। মায়ের দেহে এখনো পরিপূর্ণ যৌবন। ঐ বয়সেই বোধহয় মেয়েরা ভর-ভরাট সুন্দরী হয়ে ওঠে। শিল্পী ঐ বয়সেরই ছাব আঁকে, মূর্তি গড়ে।

লায়লা বলে, জানো মা, মুখে-বসন্তর-দাগওলা সেই যুবতী বিধবা মেয়েটা বলছিল, তোমার মায়ের চেহারা দেখে মনে হয় না যে কখনো কোন ছেলেমেয়ে হয়েছে। তুমি ওর পেটের মেয়ে কে বিশ্বাস করবে?'

তহুরা গায়ের জামা খুলে ফেলে তুঙ্গ নধর সাদা বুকের ওপরে গরম জল ঢালতে ঢালতে উষ্ণতার স্বস্তিতে উঃ আ শব্দ করে। মা উঠে দাঁড়ায়—পুরোপুরি অষ্টাদশী যেন সে। একটুও টোল খায়নি শরীরে। একটা গামছা পরে শালোয়ারটা ছেড়ে রেখেছিল আগে। মায়ের উরুদেশগুলো যেমন ভরাট তেমনি সুডোল। বিশেষ করে পাছাটা। সবচেয়ে আশ্চর্য তলপেটের চারপাশে গর্ভস্ফীতির জন্য যে সব চিড় খাওয়া দাগ ফোটে তাও নিশ্চিহ্ন।

লায়লার নানী নাকি জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতে দিয়েছিল। তার নানা মাঝ বয়সেই মারা গিয়েছে শুধু মেয়েকে দুর্ভাগ্যের হাতে পড়তে দেখে। বুড়োর সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করত আর সময়ে খেত না, ঘুমোত না। নানী যখন মারা গেল তখন সে বছর তিনেকের। মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল। মা খুব কাঁদল। নানা অনেক অনুনয় বিনয় করে থাকতে বলা সত্ত্বেও তার মা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে এলো। মায়ের ধারণা পরে নানা নাকি নানীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল।

এখন সে কথা তুললে মা বলে, তোর নানীকে সহ্য করাও কঠিন ছিল। রেগে গেলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকত না। তোর নানাকে কুকুর, শূয়োর, চাকর নফর বলে গাল দিত। তোর নানা কতবার গলা টিপে ধরে শূন্যে চাগিয়ে ধরেছে। এতবড় জিব বেরিয়ে যেত। ছেড়ে দেবার পর আবার গাল দিত। বাড়িতে ঐ সব অশান্তি দেখে আমি মাঠে মেষ চরাতে চলে যেতাম।'

লায়লা গোসল করতে না চাইলেও জোর করে তার গায়ের কাপড় জামা খুলে ফেলে বেশ করে ঘষে ঘষে স্নান করিয়ে দিল।

মা-মেয়েতে ঘরের কপাট দিয়ে আচ্ছা করে তেল মাখল সারা গায়ে। মাথার চুল আঁচড়াল।

তারপর দুজনে খেতে বসল।

দোরে চাবি দিয়ে বাড়িওলী গেটের দ্রাক্ষাকুঞ্জটার পাশে রোদে বসেছিল।

বাঁধাছাঁদা সব গোছগাছ করে নিতে লাগল মা মেয়েতে।

কিইবা এমন আছে তাদের সংসারে?

সন্ধ্যার পর বুড়ো কলন্দর এসে হাজির হল গাড়ি নিয়ে। কলন্দর যে বাড়ির গালিচা কারখানায় কাজ করে তাঁদেরই জিপগাড়ি এনেছে। পেট্রলের দামটাই যা দিতে হবে তাকে। মালিক না-চাইলেও কলন্দর সেটা খুশী হয়েই দেবে বলেছে। আসলে সে জানাতে চেয়েছে তার মেয়ে-নাতনীর সঙ্গে আদৌ অসদ্ভাব নেই।

জিনিসপত্র সবকিছু গাড়িতে তোলা হল।

যদিও সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে সন্ধ্যার সময়েই তবু একটা মশাল জ্বালে কলন্দর পাঁচিলের গায়ে।

বুড়ী বাড়িওলী গজগজ করতে লাগল, 'এ্যাদ্দিন পরে বুড়ো মিনসের মেয়ে-নাতনীর কথা খেয়াল হল। সুখে দুঃখে এত বছর মেয়ের আমার কাটল। তহরার মতন সতীলক্ষ্মী বৌ আমার বোনপোর কপালে সইল না। যাও তোমরা, সুখে থাকো।'

বুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি চলল হিমঘেরা জ্যোছনা রাতে।

লায়লা উলটো দিকে দাদুর পাশে বসে আছে।

তহুরা একদিকে একা।

সেইসব ধানক্ষেত গমক্ষেত পড়ে রইল পথের দুপাশে। চেনার, আখরোট, ন্যাসপাতি, আপেল গাছের চেনা বাগানগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণেরই বা পথ!

কলন্দর নেমে পড়ল গাড়ি দোরগোড়ায় এসে পৌছতে।

জিনিসপত্রগুলো চাকরটা নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল।

ওরা এসে গেছে দেখে সিরাজ দোতলার ঘর থেকে নেমে এলো। সিঁড়ির শেষ ধাপে যখন সে হঠাৎ সামনে দেখল লায়লার মা তহুরাকে। বোরখা গায়ে থাকলেও মাথাটা সম্পূর্ণ খোলা। মুখ তুলে তাকাল। হাসল একটু। সিরাজও হাসল। তহুরা চলে গেল অন্য ঘরটার দিকে।

সিরাজ নেমে গিয়ে বাইরের বারাণ্ডায় দাঁড়াল। লায়লা মাথায় মোট নিয়ে এলো। পেছনে কলন্দরের ঘাড়ে একটা ভারী ব্যাগ। নামিয়ে নিল সিরাজ। কলন্দর একটা তলোয়ার দিল হাতে। বলল, 'এটা রাখো।'

তলোয়ারটা নিয়ে দেখতে লাগল সিরাজ।

তহুরা এগিয়ে এসে ব্যাগটা নেবার পর তলোয়ারটার জন্তে হাত বাড়াল।

সিরাজ বলল, 'থাক না এটা আমার কাছে।'

তহুরা হাত নামিয়ে নীরবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল—অর্থাৎ তলোয়ারটা না নেওয়া পর্যন্ত সে বোধ হয় নড়বে না।

সিরাজ দিয়ে দিল তলোয়ারটা। কিন্তু তার মনের ভেতরে অদ্ভুত একটা ভাব এলো। সে ওদের মধ্যে আর গেলো না। ওদের মনে মনে মান-অভিমানের অনেক কথা জমে আছে—সেসব কিছুক্ষণ ওরা প্রাণ খুলে বলাবলি করুক—ওখানে এখন তার না যাওয়াই ভাল।

সিরাজ উঠে এলো আবার দোতলায়। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল এখানে এখন বোধহয় সে অবাঞ্ছিত জীব। যারা প্রকৃত অধিকারী তারা এসে গেছে। কেন সে ঐ একটা বিধবা মেয়ের বা তার কন্যার রূপ সৌন্দর্যের আকর্ষণে বা তাদের অসহায়তার সাহায্য করার অজুহাতে বসে থাকবে?

এমনও তো হতে পারে তহুরার নামে কলঙ্ক রটার ভয়ে সে তাকে এখানে অবাঞ্ছিত মনে করবে অথবা সে যদি ধর্মপ্রবণতার সামাজিক ভান করে তবে

নিজের জীবন-যৌবনকে স্বামীর স্মৃতিরক্ষায় উৎসর্গ করার মহত্ত্ব দেখিয়ে কন্যাকে দান করতে আগ্রহী হবে।

কিন্তু শিল্পের প্রকৃত সংজ্ঞাটি তার মনে পড়ল। যে সৌন্দর্যকে ধরা-ছোঁয়া যায় না—দূর থেকে শুধু ধরার আকুতিতে মন ভরে থাকে, তাইতো প্রেম।

সিরাজের মনে হল গমক্ষেতের সেই সুন্দরী, ঘরোয়া সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মারা যাবে। মেষ চরানো লায়লা হারিয়ে যাবে যদি তাকে মাজা-ঘষা করে আধুনিকা বানানো হয়ে থাকে।

আর সত্যি যদি তাই হয়—কলন্দর তার স্ত্রীকে সহ্য করতে না পেরে গলা টিপে মেরে ফেলে তাহলে একদিন না একদিন ঐ স্টুডিয়ো নিয়ে নির্দয় চরিত্র বুড়োর সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তার চাইতে ওটা কিনে নেওয়াই ভাল। কত টাকা চাইতে পারে কলন্দর? পাঁচ হাজার। কিন্তু যদি বলে দশ হাজার টাকা?, সর্বস্ব হারাবে সে এখানের ঐ স্টুডিয়োটার জন্যে? তার চাইতে তার মামাকে বললে তার খুদে প্রাসাদের নিচের তলাটায় হয়তো স্টুডিয়ো তৈরি করতে দিতেন অথবা শহরের রাজপথের ওপরেই।

নানান ধরনের উল্টো-পাল্টা চিন্তায় সিরাজের মন আচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ মনে হল রিজিয়াকে তার তাড়ানো উচিত হয়নি। অপরিণত বয়সে সে কি একটা ভুল করে ফেলেছে আর জন্যে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া যায় না। ওর কথাও শোনা উচিত। এমনও তো হতে পারে ওর স্বামী ছোকরাটি ছিল সন্দেহপরায়ণ আবেগপ্রবণ, ঈর্ষাকাতর আর রক্ষণশীল।

॥ ১৫ ॥

আশ্চর্য ব্যাপার ফিরিঙ্গী স্বভাবের ইসমতের স্বৈরাচারকে মানুষ সহজে হজম করে কিন্তু রিজিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সহ্য করতে চায় না কেন? রিজিয়ার সামাজিক বেষ্টনীটা ছোট বলে কি? না, রিজিয়ার বাপের চাইতে ইসমতের বাপের খ্যাতি, অর্থ, শিক্ষা, সম্মান বেশি বলে? কিন্তু কলন্দরকে শুধোলে সে হয়তো বলবে, 'তা নয়, রিজিয়া তো মুসলমান মেয়ে, ইসমৎ তা নয়, সেই জন্যে রিজিয়াকে বুঝে-সুঝে চলতে হবে। তার চারপাশে সমাজ আছে। সেই সমাজের কোলে সে যেমন লালিত পালিত হয়েছে—সর্বদায়েও উদ্ধার পেতে একদিন মরতে হবে, অই

তাকে বাধ্য হতে হবে কতকগুলো ন্যায়-নীতির বাঁধা পথে চলতে। নচেৎ কটাক্ষ করা হবে।'

ধুত্তোর! রিজিয়ার কথাই বা এতো ভাবছে কেন সে?

ব্যাপারটা হচ্ছে তার স্টুডিয়োটাকে নিয়ে। যা হয়েছে হয়েছে—ওটাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না সিরাজ। কলন্দরও তো বলেছিল এখানে স্টুডিয়ো না চলে শহরে গিয়ে বসবে। সেই জন্যেই বোধহয় জ্ঞানীরা বলেন, যা করবে ভেবে-চিন্তে করো, হঠাৎ কিছু করো না। কিন্তু যাঁরা বেশি ভাবনা চিন্তা করেন তাঁরা কি বেশি কাজ করেন? আর সংসারে যারা বেশি কাজ করে তারা ভাবনা চিন্তার সময় পায় না বা ভাবতেও জানে না।

তাহলে কি সিরাজের বদনাম রটবে—অতবড় শিল্পী গাঁয়ে পড়ে রইল সামান্য একটা বিধবা মেয়ে অথবা মেষ চরানো বালিকার জন্যে?

নিজের মাথায় গাঁটটা মারল সিরাজ!

ক'টা বাজল? আটটা পঁয়তাল্লিশ, না, এখন আর মামার ওখানে যাওয়া যায় না। অবশ্য গেলে কিছু বলবেন না।

একসময় চাকর মাহমুদ এসে ডাকল নিচে খেতে যাবার জন্যে।

সিরাজ বলল, 'আমার খাবারটা এখানে দিয়ে যাও—আমি একটু দরকারী কাজে ব্যস্ত আছি। শ্রীনগরে খুব শিগগীরি একটা প্রদর্শনী করব—তার ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত।

মাহমুদ চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কেউ আসছে বুঝতে পেরে সে ইজেলের ওপরে তুলি টানতে শুরু করে দিল মিছিমিছি।

এলো লায়লা। বলল, 'তুমি খাবে না?'

'খাব না বলি নি তো। খাবারটা দিয়ে যেতে বলেছি।'

'মা কত কি খাবার করল, এখানে বয়ে আনবে সব? চলো তুমি খেতে যাবে।' লায়লা হাত ধরে টানল।

সিরাজ দৃঢ় হল। বলল, 'কাজের সময় বাধা দিও না—যাও এখন!'

লায়লা ঠোঁট ফুলিয়ে গোসা করে চলে এলো। মাকে বলল সে, সিরাজ সাহেব বকে দিল। 'বলল, কাজের সময় বাধা দিওনা—যাও এখন।'

কলন্দর তামাক টেনেই চলল কিছুক্ষণ। বলল, 'কাজ নিয়ে বসেছে যখন, খাবারটা নাহয় দিয়েই এসো।'

তহুরা বলল, 'রাগ হয়েছে।'

'কেন, রাগ হবে কেন?'

'তলোয়ারটা বোধহয় নিতে চেয়েছিল।'

'তো দিলেই পারতে। ওতো আর আমাদের কারো মুণ্ডু কেটে নিয়ে পালাবে না। তাছাড়া বাড়িতে যখন একজন জোয়ান পুরুষ আছে তার কাছেই তো তলোয়ারটা রাখা দরকার।'

তহুরা বলল, 'ওটা একটা স্মৃতির জিনিস আব্বা।'

কলন্দর বলল, 'স্মৃতি অতীত, তলোয়ারটাকে তুই পূজো করবি, না তোর শত্রুকে ওটা দিয়ে নাশ করবি? যদি শত্রুকে মারতে গিয়ে ওটা ভেঙেই যায় তবে তুই কাঁদবি নাকি? দিয়ে আয় তলোয়ারটা ওর ঘরে, আমি তো ওর হাতেই দিয়েছিলাম, আর খাবারটা দিয়ে আয় গিয়ে।'

বাপের এই সিদ্ধান্তে খুশী হল তহুরা।

খাবার সাজিয়ে নিয়ে সে উঠে এলো দোতলার ঘরে। এসে দেখল সিরাজ ছবি আঁকছে।

ছবিটাতে চোখ ফেলল তহুরা। দেখল একটি ময়ূর পেখম মেলে নাচছে আর তিন চারটে পেঁচা করতাল বাজিয়ে তার গুণকীর্তন করছে।

ছবি দেখে হাসল তহুরা।

খাবার নামিয়ে রেখে জল গড়িয়ে নিয়ে টেবিল চেয়ারে জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আসুন, খেয়ে নিন।'

সিরাজ ওর মুখের দিকে তাকাল। স্মিত হাসি ওর চোখে মুখে।

'খেয়ে নিন।' আদেশের সুরে যেন বলল তহুরা। তারপর বলল, 'আচ্ছা, তলোয়ারটা আপনাকে দিতে হবে?'

হালকাভাবে মস্করা করল সিরাজ। 'আমি তো আর হাবিলদার আবদুল হামিদ নই যে তলোয়ারটা কাজে লাগাতে পারব।'

ঠোঁট টিপে একটু হাসল তহুরা। চামচে করে তরকারী তুলে দিতে লাগল। বলল, 'আপনার ঐ ছবিটার অর্থ কি?'

সিরাজ বলল, 'অর্থ খুবই পরিষ্কার। সাধারণ মানুষ সৌন্দর্যের কিছু না বুঝেই করতালি দেয় আর যার সৌন্দর্য আছে সেও অন্ধ ভক্ত বা স্তাবকদের গুণগানে নাচতে থাকে।

তহুরা বলল, 'সৌন্দর্যবোধের জন্যও তো শিক্ষাগত আর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই কিন্তু সৌন্দর্য বোধের জন্য খুব উঁচুতলার মানুষ হতে হবে—এটাও ঠিক নয়—তবে সৌন্দর্য অযত্নের জিনিস নয়। দৈবাৎ কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে—কাল অতিক্রমও করে। কিন্তু তখন সেটা বিস্ময়ের হয়ে ওঠে—যেমন আপনি।'

'আমি! কি বলছেন?'

সিরাজ আর কিছু না বলে আহারাদি সাঙ্গ করল।

পরে বলল, 'শস্যক্ষেতের মধ্যে আপনার যে ছবিটা আমি এঁকেছিলাম সেটা বিখ্যাত একটি পত্রিকায় বার হয়ে গেছে—আপনি কি তা জানেন?'

দৃঢ়স্বরে বলল তহুরা, 'ভারি অন্যায় করেছেন। চাষী গোলাম নবীর ছেলেটা কলেজে পড়ে, সে একখানা পত্রিকা কিনে এনে ছবিটা সবাইকে দেখিয়েছে—তাতেই আমার কাজটা চলে গেল।'

'তাই নাকি! সবাই কি বুঝতে পারছে যে কাশ্মীরের ঐ কৃষক রমণীটি আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আর্ট তো ফটোগ্রাফী নয়—তাহলে আমার আঁকাটা অসার্থক। কিন্তু আয়নায় আপনার মুখটার সঙ্গে আমার আঁকা ছবিটা মিলিয়ে দেখবেন—তফাত আছে।'

স্থির চোখে তাকাল তহুরা। সিরাজ তার ভাব-বিহ্বল চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বলল, 'আপনার এই চোখের দৃষ্টির সঙ্গে সেই চোখের দৃষ্টির মিল নেই। তাতে আছে দারিদ্র্যের অভিশাপ। কিন্তু কঠিন একটা তীক্ষ্ণতা কিন্তু তার চারপাশে প্রচ্ছন্ন আছে স্বপ্ন।'

'সে স্বপ্নটা কি?'

'তা আমি জানি না?' বলে সিরাজ দূরে শহরের আলোভরা আকাশের ধূমান্বিত দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কলন্দর উঠে এলো সিঁড়িতে শব্দ তুলে তুলে।

বাসন-কোসনগুলো সাজিয়ে নিল তহুরা।

কলন্দর শুধোল, 'খেয়েছ তো—অভিমান করে অনাহারে থাকাটা বাঙালী লোকদের নাকি একটা রোগ—এ নিয়ে একটা মজার গল্প আছে!'

তহুরা নেমে চলে গেল।

বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আরাম করে বসে গল্প করতে বসল কলন্দর।

। ১৬ ।

সকালে ঘুম ভাঙার পর উঠে দেখল কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে। পথঘাট কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

নিচে নেমে এসে দেখল কেউ তখন ওঠে নি।

ফিরে এসে সে প্যান্ট কোট পবে টাই বেঁধে মাথায় টুপি লাগিযে হাতে দস্তানা এঁটে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিযে যাবার সময় হঠাৎ তহুবাকে একটু এলোমেলো পোশাকে দোর খুলে বেরিয়ে আসতে দেখল।

তহুরা হেসে লজ্জা পেয়ে গায়ে মাথায় কাপড দিল।

সিরাজ কোনো কিছু না বলেই চলে এলে। মনে হল সে যেন কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে। হাফিজের একটা লাইন তার মনে পড়ে গেল :

'তার নার্গিস চোখের চাহনি বুলবুলেব বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে।' সে আর বাসায় তিষ্ঠতে পারছে না। তহুরার চোখেও কি সেই দৃষ্টি।

কুয়াশা ভেদ করে বাসটা গর্জন তুলতে তুলতে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বাসে উঠে পড়ল সিরাজ। সবজি আনাজ ফল মাছের বাজরা নিয়ে গাড়িতে উঠছে দেহাতি লোকগুলো।

শ্রীনগরে পৌছনোর পর সূর্য দেখা দিল। পথে পথে রোদে বের হয়ে এসেছে মানুষরা? একটা চায়ের দোকানে ঢুকল সিরাজ। বিদেশী সাদা চামড়ার দুটি মেয়ে আর একটি পুরুষ চা খাচ্ছে। কম্বল মুড়ি দেওয়া কয়েকজন লোক রোদে বসে মগে করে চা খাচ্ছে দোকানের সামনে।

সিরাজকে মেয়ে দুটো দেখছিল। মন্তব্যও করল কিছু নিজেদের মধ্যে। ময়লা মোটাসোটা সাধারণ কাপড-চোপড ওদের গায়ে। কোথায় ওরা রাত কাটিয়েছে? একটা পুরুষ দুটো মেয়ে? কিন্তু দুটো পুরুষ একটা মেয়ে হলে কি মারামারি হত? ওরা কি জান্তব জীবন বেছে নিয়েছে?

চা-দোকান থেকে বেরিয়ে সিগারেট কিনে টানতে টানতে রোদভরা পথে মানুষের মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে লাগল। কোথায় যাবে এখন সে? কি জন্যই বা হঠাৎ এমন করে বেরিয়ে এলো! একটা বুক স্টলে দাঁড়িয়ে পত্র-পত্রিকাগুলো দেখতে লাগল। একটা ম্যাগাজিন কিনল।

একবার মনে করল মামীর কাছে যাবে—হঠাৎ তার সঙ্গে খুব প্রাণখোলা মেলামেশা করবে? নাকি রিজিয়ার কাছে যাবে? কিন্তু রিজিয়ার সঙ্গে অতি সহজেই সে ডুবে যেতে পারলেও, তাকে জড়াতে পারে। ইসমতের কথা মনে পড়ল। মামীর বাবা যে খ্রীষ্টান মেয়েটিকে রেখেছে সে মিষ্টি চোখে কেবল হাসে। উকিল বুড়ো ওকে নিয়ে বেশ মজায় আছেন।

তহুরা নিশ্চয়ই চা জলখাবার নিয়ে তার জন্যে ভাবেবে!

মামার দোকানে এসে হাজির হল সে।

আলী হোসেন বললেন, 'কি ব্যাপার রে খোকা! তুই কাশ্মীরে এসে আছিস অথচ আমার এখানে আসছিস না—তোর আবার কি মান অভিমান হল?'

সিরাজ বসল। বলল, 'কলকাতায় আর ভাল লাগল না। দেখি, এখানে কিছু করতে পারি কিনা। দোকানটা এবার বেশ সাজানো-গোছানো হয়েছে। আচ্ছা, মামা, কলন্দর বুড়োকে তুমি জানো?'

'জানি না আবার! হাবিলদার আবদুল হামিদের শ্বশুর তো? ওর ওখানে আছিস নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন মেলায় তোর সঙ্গে যে সুন্দরী মেয়েটাকে দেখলাম ঐ তো কলন্দরের মেয়ে, আর একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল সঙ্গে, এই বছর তেরো-চৌদ্দর হবে।' মামার চোখে চাপা কটাক্ষ।

সিরাজ একটু চাপা হাসি হাসল, কিছুই বলল না।

আলী হোসেন বললেন, 'কলন্দর লোক ভাল। পরোপকারী, ভাল নকশার কাজ জানে কিন্তু লোকটা নাকি বদরাগী। ওর খেয়াল মত কাজ করবে।'

'বুড়োর বাড়িটা বেশ নিভৃত পল্লীর মধ্যে, অথচ শহরে আসার গাড়ি ঘোড়া আছে, তাই ওর ওখানেই একটা স্টুডিও তৈরি করছি। কলন্দর একটা মরা শুকনো গাছ কেটে স্টুডিও বানিয়ে দিচ্ছে। বলেছে, এখানে যদি না জমে তবে কারবার তুলে পরে শহরে যেও।'

আলী হোসেন কিছুটা রাগ করলেন, বললেন, 'আমি বলে দিচ্ছি হলপ করে, ঐ বুড়োর সঙ্গে তোর বনিবনাও হবে না—হতে পারে যদি ওর নাতনীটাকে বিয়ে করিস।'

ঠোঁট ওল্টালো সিরাজ।

খাবার এলো। আলী হোসেনও খেতে বসলেন। সিরাজ খেতে আরম্ভ

করে বলল, 'জমিজমা সব বেচে চলে এসেছি। হাজার দশেক টাকা মাত্র আনতে পেরেছি।'

'টাকাগুলো কোথায় রেখে এসেছিস?' মামা যেন আতঙ্কিত।

সিরাজ বলল, 'এখনো কোনো ব্যাঙ্কে জমা দিই নি—ওদের বাসাতেই পড়ে আছে।'

'দূর বোকা ছেলে। মানুষকে হঠাৎ এভাবে বিশ্বাস করতে নেই। যদি সব টাকা খোয়া যায় তুই কি করবি?'

'কি আর করব, তুমি তো আছই।'

'তুই স্টুডিও করবি তো আমাকে বললি না কেন? আমার বাড়ির নিচেটাতে স্টুডিও বানিয়ে দিতাম।'

'পরে ওখানে না বনলে চলে আসব।'

'আমার শ্বশুরের বাড়িতেও তুই বসতে পারতিস—বুড়ো মানুষটা নিঃসঙ্গ কাল কাটাচ্ছেন।'

'নিঃসঙ্গ কেন, তার তো সুর', পুস্তক আর মেয় আছে।'

আলী হোসেন খুব হাসতে লাগলেন, 'তুই ধরেছিস ঠিক। পুরুষ হল সিংহের জাত। বুড়ো হলেও তার পৌরুষ যায় না। আমার শ্বশুর বেশ রসিক মানুষ। যা তোর মামীর সঙ্গে একবার দেখা করে আয়—দুপুরে খা আমার বাড়িতে।'

সিরাজ বলল, 'অন্য একদিন আসব।'

'আসিস। এখানে থাকবি আর আমাদের এড়িয়ে চলবি কেন? আমাদেরও তো একটা স্নেহ-মমতা আছে। তুই এসে নাহয় আমার ব্যবসায় বসে যা—ব্যবসাটাকে আরো বাড়াই। অথবা তুই স্বাধীন শিল্পী হিসাবে যা পারিস কর গিয়ে আগে।'

মামার কাছ থেকে চলে এলো সিরাজ। টাঙ্গায় চড়ে সোজা এল রিজিয়াদের বাড়িতে। পাশেই দেখল উকিল জামসেদ আনোয়ারের বাড়ি। বুড়ো ছাদের ওপর বসে আছেন—মেমটি চশমা এঁটে বই পড়ে শোনাচ্ছে।

কলিং বেল টেপার পর সবুজ কাঁচের দরজা খুলল রিজিয়া। সে একেবারে হতবাক। সিরাজ যে এখানে আসবে সে যেন কল্পনাও করতে পারছিল না। বলল, 'কি ভাগ্য আমার! আপনি যে হঠাৎ!'

'সেদিনের খাবারগুলো আছে তো? ওই সেই গম ক্ষেতের জায়গাটা না? গোলাম নবী চাষীর কাজে আর আসবে না তহুরা বিবি ··'

'আসছি—এক মিনিট—'

'আরে শোন শোন—হাত বাড়াল সিরাজ। রিজিয়া হাত দিতেই সিরাজ টান দিল একটু। রিজিয়া কোলের ওপরে এসে লুটিয়ে পড়ে যেন আশ্রয় খুঁজতে লাগল।

সিরাজ বলল, 'কি মিষ্টি মেয়ে তুমি, কি ভাল!'

রিজিয়া সহজ হল। আলগা দিল। বলল, 'আপনি রোজ আসবেন বলুন?'

'আসব আসব।'

'আমাকে আঁকাজোকা শেখাবেন?'

'হাঁা, কিন্তু দক্ষিণা কি দেবে?'

'যা চাইবেন, আমার যা আছে—যাবেন সেই বাগানে? সেখানে নির্জন জলটুঙ্গি আছে, চলুন, এক্ষুণি চলে যাই—রাজি?'

সিরাজ সম্মতি জানাতেই রিজিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কণ্ঠ বেড়ে চুম্বন করল এবং সিরাজও উত্তর দিল। এই মুহূর্তে তার মনে হল তহুরা বা লায়লা যেন কিছুই না। মনে হল যেন এক বেঘোরে তার দিন কাটছিল এতদিন। রিজিয়া ভেতরে চলে গেল। রিজিয়ার মা এসে অনুযোগ করে বললেন, সেদিন যে হঠাৎ চলে গেলে বাবা? রান্না খাবার সব পড়ে রইল। আজ কিন্তু যাবে না। মেয়ের সঙ্গে নাকি বাগান দেখতে যাবে? যাও বাবা, মেয়ে আমার খুব ভাল—ওর প্রাণে খুব দয়া। কত মজার ভিখারীদের ও ডেকে আনে!'

রিজিয়া ভেতর থেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। বেয়ারা খাবার দাবার এনে বসাল। কফিটা তুলে নিল সিরাজ।

রিজিয়া বলল, 'জানেন, সেদিন আপনার কাছ থেকে মন খাবাপ করে চলে আসছিলাম, হেঁট মাথায় চলছিলাম। মাঠের পথে এদিক ওদিকে গাছপালা, মাঝে মাঝে জাফরি কাটা রোদ, হঠাৎ নাটকীয় ভাবে একটা ভালুক আমার সামনে এসে নাচতে লাগল। আমাকে আঁকড়ে ধরল। তারপর কাঁধে করে তুলে নিয়ে সে ছুটতে লাগল। আমি জোর জবরদস্তি করলেও জন্তুটার গায়ে এত্তো জোর যে সে নড়তেই দিল না। সে আমাকে একটা পাহাড়ী উপত্যকার আড়ালে শস্যক্ষেতের মধ্যে এনে নামিয়ে ফেলে যখন আমার বুক চিরে রক্ত খাবার ভঙ্গী করতে গেল আমি দেখলাম সেই ভালুকটা আর কেউ নয় একটা মানুষ—আমারই শ্বশুর! ভালুকের মুখোশ পরেছিল। বুড়োটা পাগলা হয়ে গেছে নাকি ছেলের

শোকে। আমাকে বলল, এবার রাক্ষুসী তোর এই কলজের ভেতর থেকে আমার নসিবকে বার করব। তুই তোর এই বুকের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রেখেছিস।'

সিরাজ বললে, 'খুব রগড়! তুমি আগে টের পাও নি যে মানুষ?'

'না! তারপর আমি বললাম, থামো থামো, দোষ তোমার ছেলেকে কিন্তু বাছাধন, ভালুক তো কথা বলে না। হুঁ হুঁ—।'

সে বলল, 'তাইত! মহা ভুল হয়ে গেছে।'

বললাম, 'তাহলে? আমার হাতে তখন পিস্তল, ব্যাগ থেকে বার করে নিয়েছি, কলন্দরের বাড়িতে আসার ব্যাপারে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে ভেবেই সঙ্গে নিয়েছিলাম।'

'বুড়ো হঠাৎ ভয় পেল, বলল, তোমাদের হাতে ঐটাই তো আছে, ফেলে দাও। হঠাৎ আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম, বললাম, এদিকে কেউ নেই, কেউ দেখবে না, এই প্রেতাত্মাটাকে মেরে ফেললেও কেউ জানবে না—'

'তখন লোকটা হঠাৎ দৌড় দিল—পরনে তার ভালুকের পোশাক। আমি হাসতে হাসতে পালিয়ে এলাম। এখন মনে হচ্ছে আসলে ও পাগল নয়। ওর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বাবাকে বোধহয় কোনোদিন মারবার চেষ্টা করবে। আর কলন্দর—'

'আড়াল থেকে সে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে। কলন্দর কমিউনিস্ট। একটা পার্টি চালায়, মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওদের আন্দোলন। আমাদের গালিচা কারখানায় ঐ কলন্দরই দামকাড়ি বাড়াবার আন্দোলনকে জোরদার করে তুলছে। ওর মালিকের সঙ্গে শিয়ার বিজনেস আমার বাপের। যাকগে, হয়তো দুটো প্রাণীই একদিন মারা পড়বে।'

বিজিয়ার মা সাবধান করল! 'এসব কথা কারো সামনে বলা ঠিক নয়'

সিরাজ বলল, 'সত্যকার পুরুষ ভালুক যদি তোমাকে ধরত তো আর লোকালয়ে ফিরতে পারতে না। তোমাকে নিয়ে গিয়ে বউ করে রেখে দিত। হাতের পায়ের তলা চেটে চেটে এমন ঘা করে দিত যে একা থাকলেও তুমি পালিয়ে আসতে পারতে না। আর তোমাকে খুব মধু খাওয়াত, পিতৃস্নেহে কোলে বসিয়ে দোল দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াত, প্রাণী বিজ্ঞানীদের মতে কুকুর আর ভালুকের চাইতে নাকি দীর্ঘস্থায়ী যৌনসুখ কোনো প্রাণীই পায় না।

'ওসব ব্যাপার পরে শুনব. চলুন এখন আমরা কোথাও যাই।'

উঠে পড়ে চলতে আরম্ভ করে হঠাৎ সিরাজ বলল. 'পিস্তলটা নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ'—হেসে বলল রিজিয়া, 'তবে ওটা একটা ফল্‌স জিনিস!' হাসল দুজনে। মোটরে উঠে বসল, ড্রাইভার বাগান বাড়িতে দিয়ে আসতে চলল।

গাড়ি শ্রীনগরে আসার পর মামার দোকান পার হয়ে যখন রউফদের জুতো দোকানের সামনে দিয়ে চলছিল রউফ তাদের দেখতে পেয়ে হঠাৎ হাত তুলল।

ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল সিরাজ।

রউফ কাছে এলো। বলল, 'কোথায় চললেন, যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন তাহলে দু'মিনিট প্রাইভেট একটা কথা বলতাম।'

রিজিয়ার মুখের দিকে তাকাতে সে ভ্রূ কোঁচকাল—তারপর হাসি মুখে সম্মতি দিল।

রউফ তাব দোকানের মধ্যে এনে তার সুটকেস খুলে একটা অ্যালবাম দেখতে দিল। পাতা ওল্টাতে লাগল সিরাজ। রিজিয়ার নানান পোজের ছবি। তাদের বাগানবাড়িতে তোলা নানান দৃশ্য। কয়েকটি সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি। যখন সেগুলো, রউফ বলতে লাগল, 'এগুলো অবশ্য রমজানই আমাকে দিয়েছে অথবা তার অ্যালবাম থেকে আমিই সরিয়েছি। রিজিয়ার পেটে এখন বাচ্চা আছে, ও আপনাকে জড়াতে চাচ্ছে। ও নানান ছেঁড়ার সঙ্গে মেশে, আলালের ঘরেব দুলালী, সাবধান হোন, ওর সঙ্গে যাবেন না।'

সিরাজ বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা মনে থাকবে, ধন্যবাদ। তবু তোমার দ্বারা ওর সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি এটা ও যখন বুঝবে তোমার শত্রুতা করবে—আমি শেষটা দেখে নিই—কি চায় ও।'

'ওই ড্রাইভারটাও ওর প্রেমিক, ভয়ানক মেয়ে।'

'ঠিক আছে।' বেরিয়ে এসে আবার গাড়িতে বসল সিবাজ।

রিজিয়া বলল, 'বউফ আমার বিরুদ্ধে কিছু বলল বোধহয়?'

সিরাজ ওর হাত ধরে একটু চাপ দিল, বলল, 'আমি নাবালক নই, ও অন্য কথা বলছিল, স্টুডিও সম্বন্ধে—কতকগুলো কাজ যোগাড় করে দেবে।'

গাড়ি চলতে লাগল, শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো—দুপাশে মনোরম দৃশ্য। অপূর্ব সুন্দর ঝিলাম নদী ঝিলমিল করছে।'

'তোমার ড্রাইভারটার ভাল চেহারা।'

'পাঞ্জাবী লোক তো!'

'বলো, তোমার স্বামীর কথা, সে কোন অভিমানে আত্মহত্যা করে বসল?'

'জানেন ও ছোঁড়াটা ভীষণ কাঁচা গ্রাম্য আর মেয়েলী ভাবের ছিল, ঈর্ষা

কাতর। কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলেই বলত তুমি বেলেল্লাপনা করতে পারবে না। একদিন রমজানকে আমাদের বাড়ির মধ্যেই অপমান করল, মারামারি বেধে গেল দুজনের মধ্যে, ভাইয়া ছাড়িয়ে দিল। আমার হাজবেণ্ড বলল, ওর সঙ্গে যদি আর কোনো দিন দেখি তো আমি খুন করে ফেলব। কিন্তু আড়াল থেকে একদিন শিকারায় সে দেখল আমাদের—রমজান সেদিন আমাকে এমন অনুনয় বিনয় করে ধরল যে—'

সিরাজ বলল, 'থাক, ওসব কথা।'

রিজিয়া ওর হাতটা নিজের কোলের মধ্যে নিল, সিরাজ বাইরে তাকিয়ে ছিল। বাগানের মধ্যে গাড়ি এসে গেল। জলটুঙ্গিটা তো বেশ সুন্দর দেখতে। ড্রাইভার বসে রইল। জলটুঙ্গির মধ্যে সিরাজ যেতে চাইল না। বলল, 'চল ঐ মাঠের ওদিকে—পর্বতের পাদদেশে ঐ জঙ্গলটা, বড় চমৎকার তো।'

'যাবেন ওখানে—সুন্দর জায়গা, অনেকেই বেড়াতে যায়।'

পার্বত্য বনভূমির মধ্যে এলো দুজনে।

সরু ঝরণার পাশে বসল দুজনে। রোদে ঝলমল করা নাম না জানা কত রকম সুন্দর গাছ। কত রকম পাখি।

রিজিয়া কোলের ওপর ঢলে পড়ল। স্তিমিত চোখে বলল, 'আপনি কি সুন্দর। আপনাকে দেখার প্রথম দিন থেকে আমি আপনার জন্য পাগল হয়ে আছি।'

'তাই নাকি। তুমি তো সবায়ের জন্য পাগল! তোমার অনেক নগ্ন ছবি দেখেছি।'

'কে দেখাল?' সোজা হয়ে বসল রিজিয়া।

হাসল সিরাজ। বলল, 'আমি অবশ্য ওভাবে একটা মানুষের বিচার করি না। অতীতকে ভুলে যেতে হয়।'

'বলুন তো।' হাতটা জড়িয়ে ধরল রিজিয়া।

'কিন্তু বর্তমানকে তুমি কেমন করে বিদায় করছ? চলতে আরম্ভ করল সিরাজ। বলল, 'তুমি কাউকে বিয়ে করো রিজিয়া বুঝলে, তোমার শরীরটা এখন অন্য রকম—হাসপাতালে যাও—তোমাদের তো টাকার অভাব নেই—তাই যা ইচ্ছা করতে পার। গরীব কত ভাল মেয়ে সংসারে সংগ্রাম করছে অথচ আহার জোটে না তাদের—পোশাক পরিচ্ছদ নেই—তুমি যা খরচ করে ফেলেছ তা পাবে কেমন করে? রমজান তোমাকে বিয়ে করতে চায় না?'

'তার বউ আছে, একটা নয় দুটো। আগের বউকে রক্ষিতার মতো রাখত, সে তিনটি বাচ্চা নষ্ট করার পর লোকজনকে হাত করে বিয়ে করতে বাধ্য করল, পেটে তখন তার বাচ্চা—বিয়ের রাত্রে সে বউকে এমন মারল যে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হাসপাতাল থেকে বাচ্চাটা নষ্ট করে দিল। বলল, এরপর বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু আনে নি।. দুটো মেয়ে তার—ছোট ছোট। দেশের বাড়িতে ওর আর একটা দেহাতি তাগড়া চেহারার বউ আছে। তার একটা ছেলে আছে। রমজান ইলেকট্রিক অফিসের বড়বাবু। অনেক টাকা মাইনে পায়। ভীষণ বাজে লোক, গুণ্ডা প্রকৃতির—অথচ আর্টও বোঝে। ওকে তাড়াতে চাইলেও পারি না।'

'এখন কি করবে? তোমাকে কেউ বিয়ে করতে চায় না?'

না। আব্বা যেখান থেকে যত চেষ্টা করছে মোল্লা সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাংমালি দেয়। আপনি আমাকে রক্ষা করুন সিরাজ সাহেব!'

সিরাজ আশ্বাস দিল, যদিও সে এর মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করছিল এর জন্য কি তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছ? বলল, 'আজ চলো রিজিয়া, আমার বোধহয় জ্বর এসেছে—মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় খসে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি। বসুন না আমার কোলে মাথা রেখে—কপালটা টিপে দিই।'

'না, চলো। বাসায় সবকিছু খোলা মেলা অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছি।'

সিরাজ চলতে লাগল। রিজিয়া পেছনে পেছনে এলো কিছুক্ষণ। লোকটাকে সে আয়ত্তে আনতে পারছে না। হঠাৎ ছুটে আসে ও, আবার পেছিয়ে যায়।

এক সময় সে বলল, 'আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন শ্রীনগর শহরে বহু টাকার একটা স্টুডিয়ো করে দেবে আমার আব্বা।'

'ধন্যবাদ। আমি নিজেকে ঠকাতে চাই না। আমি মাটি ধরে সংগ্রাম করে উঠেছি, অর্থের লোভ আমার নেই। তার চাইতে সাধারণ একটা চাষীর ছেলেকে তুমি বিয়ে করো—আর সৎ হও—সুখী হবে।'

রিজিয়া আর কিছু বলল না। সিরাজকে তার শ্রদ্ধা হল। কথাটা বলেছে মন্দ না। এমন কথাও সে ভেবেছে অনেকবার। ভদ্রলোক শ্রেণীর বিশেষ করে অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলেদের সে আর বিশ্বাস করে না।

গাড়ি এবার ফিরে চলল।

চুপচাপ দুজনে। সত্যিই সিরাজের মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল।

কলন্দরের বাড়ির কাছে এসে নেমে পড়ল সে। সোজা উঠে এসে দোতলার ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়তে গেল, দেখল, তহুয়া একটা বাক্স খুলে তার আঁকা ছবি দেখছিল। সে যেন ধরা পড়ে গেছে, তবু স্থির হয়ে পিছন ফিরে ছবি দেখার ভান করেই রইল।

সিরাজ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার জ্বর উঠেছে।

তহুয়া কাছে এলো, বলল, 'সারা দিন কোথায় ছিলেন? আপনি কি অসুস্থ?'

'এপাশের স্টীল ট্রাঙ্কটার মধ্যে দশ হাজার টাকা আছে—ওটা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া দরকার।' টাকার কথা শুনে তহুয়া যেন চমকে উঠল একটু। তবু সে ঘাবড়াল না। একটু সরে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখল। বলল, 'খুব জ্বর যে।'

পকেট থেকে চাবিটা বার করে দিল সিরাজ। বলল, 'টাকাগুলো বার করে আনো তো—'

'কেন?'

'আনো আগে'—ধমকের স্বরে যেন বলল সিরাজ। মুখ টিপে হাসল তহুয়া। উঠে গিয়ে তোরঙ্গ খুলল। বই কাগজপত্র তোলার পর নোটের তাড়াগুলো বের হল। কাছে আনল সেগুলো।

'এগুলো তুমি নাও, তোমার জন্যেই এনেছি। দেশের জমিজমা বেচে দিয়ে এসেছি। এতে যদি তোমাদের কষ্ট যায়, যাক। মেয়েকে মানুষ করো, তার বিয়ে দাও—নাও এগুলো।'

তহুয়ার হাতে নোটের তাড়া গুঁজে দিতে সে বোকার মতো বলতে লাগল, 'না না, আমাকে দেবেন কেন? আপনি স্টুডিও বানাচ্ছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন, বিয়ে-সাদী করে সংসারী হবেন ··'

'বিয়ে করব? সারা ভারতে বুঝি তেমন সুন্দরী মেয়ে পাওয়া কঠিন, যাকে আমি বিয়ে করতে চাই। তবে আমি তার দেখা পেয়েছি, রাজবাড়িতে নয়, কৃষকের সবুজ শস্যক্ষেতে। তাকে আমি পাব কিনা জানি না—সৌন্দর্যের খনি সে। তার কাছে এলে অথবা সে কাছে এলে আমি বিহ্বল হয়ে যাই—প্লিজ, তুমি টাকাগুলো রাখো; উঃ অসহ্য মাথার যন্ত্রণা!'

'সারাদিন কোথায় পালিয়ে বেড়ালেন—নাওয়া-খাওয়া নেই, মাথায় রোদ লেগেছে, বাঙালীর ছেলে এসব সইবে কেন? আমি খাবার নিয়ে বসে রইলাম দুপুরে।'

'আমাকে ভিখারী হতে হবে—হাতে টাকা থাকলে আমার তুলি নড়ে না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আমাকে যেতে হবে। ফুলে ফলে শোভিত সুন্দর এই কাশ্মীর কিন্তু এর পিছনে অনেক দুঃখ অনেক কান্না।'

'আছে তো—'

'তোমার বাপকে যেন মনে হয় একজন ফেরেস্তা—রঙীন রসিক বৃদ্ধ—তাঁর ছবি আঁকব। উঃ! আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। নৌকো তীরে ভিড়বার আগে, তীর্থে পৌঁছবার সময়েই নাকি দুর্ভাগারা মরে"

শাড়ি পরে ছিল ওহুরা। বেশ দেখাচ্ছিল, তার আঁচলে নোটের তাড়াগুলো তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল সিরাজ।

ওহুরা স্টীল ট্রাঙ্কটার মধ্যে আবার সেগুলো রেখে চাবি দিল।

চাবিটা ফেরত দিতে চাইল ওহুরা। খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। লাল রঙের নরম কম্বলে ঢাকা সিরাজ। মুখ চাপা দিয়েছে সে, কাতরাচ্ছে। বললে, 'মনে হচ্ছে আমার মাথার ভেতরের শিরা ছিঁড়ে গেছে।'

'কাকে পাঠাই এখন ডাক্তারের কাছে—মেয়েটা মাঠে দাদুর মেষ-ছাগল চরাতে গেছে—এখনো ফেরেনি। দেখছি আমি—'

ওহুরা চলে গেলে সিরাজ ডাকলো, 'এই শোনো শোনো, বসো আমার কাছে!'

ওহুরার বুকের ভেতরে রক্তোচ্ছ্বাস ঘটল। দ্বিধা করতে লাগল। কিন্তু সিরাজের চোখ, নাক, নকশা, সুঠাম চেহারা তাকে আকর্ষণ করল: বিশেষ করে তার আঁকা ছবি দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছে। অনেকে তার কাছে এসেছে—অনেক বড় বড লোক—তখন আরো জৌলুস ছিল। আজাহার মৌলবীকে তলোয়ার নিয়ে তাড়া করার পর থেকে আর কোনো লোক বিয়ের প্রস্তাব আনতে সাহস পায়নি। কিন্তু বয়স তো তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। যার সুখের মুখ চেয়ে এতদিন নিজের যৌবন-জ্বালাকে ঢেকে রেখেছিল সেই লায়লাই এখন তাকে ঠকাতে চেষ্টা করছে?

ওহুরা ভাবান্তর কাটিয়ে ফেলে সিরাজের কাছে এলো।

সিরাজ ক্লান্ত বিহ্বল চোখে অনুনয় জানিয়ে বলল, 'বসো।'

খাটের পাশে বসল ওহুরা। কেমন যেন ভয়ে তার শরীর কাঁপছিল। মেলার স্মৃতিটা চকিতে মনের মধ্যে খেলে গেল।

সিরাজ তার বাঁ-হাতখানা ওহুরার হাতে রাখল। ওহুরা হাত ছাড়িয়ে নিল

না। তার হাতটা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। সিরাজ বলল, তোমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথায় আমি বাঁচব! বাধা দিও না আমার সোনার ভ্রমর। তোমার কোলে মাথা রেখেই আমি মরতে চাই।'

হঠাৎ সিরাজ দু'হাতে কোমর বেড় দিয়ে ধরে তহুরার কোলের মধ্যে মুখ চাপল। তারপর সে লম্বা করে শ্বাস টেনে ঘ্রাণ নিল। বলল, বলো তহুরা, তুমি আমার হবে—বলো বলো বলো—কথা বলো—'

তহুরা সিরাজের মাথায় আশ্বাসের হাত বুলোতেই হঠাৎ সে কাঁদতে লাগল। পাগলের মতো কান্না।

তহুরাও কাঁদতে লাগল। হেঁট হয়ে কপাল রাখল সিরাজের পিঠের ওপর।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর হঠাৎ তহুরার মনে হল তার কোলের মধ্যে গরম একটা কিছু তরল পদার্থ নামছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকিয়ে উঠছে সিরাজ। তহুরা হাত ছাড়িয়ে সিরাজের মুখটা সোজা করতেই দেখল তার নাক দিয়ে গড়গড করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সিরাজের জ্ঞান নেই।

॥ ১৭ ॥

বারান্দায় বেরিয়ে বুড়ো চাকরটাকে ডাকল তহুরা। এক বালতি জল আনতে বলল।

সিরাজকে বারান্দায় এনে তার মাথায় জল ঢালতে লাগল তহুরা। বুড়োকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনতে বলল।

'এত কাঁচা রক্ত নাক দিয়ে বেরুল আর কখনো তোমার এ রকম হয়েছে?' শুধোল তহুরা।

সিরাজ মাথা নাড়ল।

ঠাণ্ডা লাগার পর যন্ত্রণাটা যেন একটু কমল সিরাজের। তহুরা তাকে ধরে এনে শুইয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল সিরাজ। প্রচণ্ড জ্বরে তার যেন কেমন ঘোর এসে গেল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল তহুরা, নিজের কাপড়-চোপড়ে লাগা রক্তটায় চোখ পড়তে লাগল।

লায়লা এসে পড়তে তাকে ডাকল তহুরা। ছাগল ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ের

মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে লায়লা ছুটে এলো। মায়ের কাপড়ে রক্তের চিহ্ন দেখে সে যেন বোকা বনে গেল। আলো জ্বালল তহুরা। বলল, 'তোর সিরাজ চাচার নাক দিয়ে হঠাৎ এত রক্ত বের হল।'

'তা তোমার কাপড়ে লাগল কেমন করে?'

মেয়ের এই প্রশ্নে যেন লজ্জা পেল তহুরা। বলল, 'সারাদিনের পর এসে শুয়ে পড়ল। দেখি, বেঘোর জ্বর। কাছে ডাকল, পাশে বসে মাথায় হাত দিতে হঠাৎ মাথাটা তুলে দিল আমার কোলের ওপরে। তারপর নাক দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল।'

'ওকে আমি চাচা বলব হ্যাঁ মা?'

'হ্যাঁ।'

আড়ালে মুখ ভেংচাল লায়লা।

'দেখতে যাব?'

'যা এই আলোটা নিয়ে যা। কাছে বস গিয়ে। পানি খেতে চায় দিবি।'

লায়লা আলো নিয়ে ওপরে উঠে এসে দেখল সিরাজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু নাক থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে তখনো খুব ধীর গতিতে। এক টুকরো কাপড় এনে সে মুছে দিল। কপালে হাত দিয়ে দেখল খুব গরম।

কলন্দর এসেছে বোঝা গেল। মেয়ের কাছ থেকে সিরাজের অবস্থার কথা শুনল।

ডাক্তার নিয়ে এলো বুড়ো চাকর। সবাই এক সঙ্গে উঠে এলো।

বাঙালী বুড়ো ডাক্তার হরিপদ গাঙ্গুলী সিরাজের আচ্ছন্ন ভাবটা ভেঙে দিয়ে তার শরীরের তাপটা দেখলেন। বললেন, 'বাবে বাপ! জ্বর যে তিনের ওপরে। মাথায় বরফ দিতে হবে এখুনি। মদ-টদ খেয়ে ছিলেন? কদিন স্নান করেন নি?'

সিরাজ জানাল মদ সে খায় নি—তবে দিন তিনেক বোধ হয় স্নান করে নি।

কলন্দর নিজে গিয়ে বরফ আনল। আইস ব্যাগ বাড়িতেই ছিল—সেটা বার করে এনে তাতে গুঁড়ো করা বরফ ঢুকিয়ে পাশে বসে তহুরা মাথায় ধরল। বুকটায় যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সাবধান হয়ে বেশ করে চাপা দিতে বললেন হরিবাবু।

কলন্দর শুধোল, 'কেন এটা হঠাৎ হল হরিদা?'

নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নাসা জাতীয় রোগ থেকে হতে পারে—তবে আগে কখনো হয় নি যখন তখন নাসা নিশ্চয়ই নয়। ব্রেনের মধ্যে কোনো ইরাপশন ঘটেছে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় বা আকস্মিক কোনো অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে পড়লেও

হতে পারে অবশ্য তার সঙ্গে এ রকম জ্বরের উত্তাপ থাকা চাই। শরীর একটা বৃহৎ জগৎ, সময় লাগবে বুঝতে। ইঞ্জেকশন দিচ্ছি, দু'রকম ট্যাবলেট কিনে আনান আর আমি মিক্‌সচার করে দেবো, আনতে হবে ডিসপেনসারী থেকে, আশা করি সেরে যাবে।'

'উনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী, চমৎকার ছবি আঁকেন। একটু দেখবেন। ডাক্তার-দা, উনি এখানে প্রবাসী বাঙালী—আপনি বাঙালী।'

ওসব কথা বলবেন না, বাঙালী কাশ্মীরী আমি দেখি না। আমি রোগীকে দেখি—মানুষকে দেখি। একজন মেথরের যা ট্রিটমেণ্ট, একজন শিল্পীরও তাই।'

ভিজিট দেবার সময় কলন্দর দেখল তার হাতে তখন আদৌ টাকা নেই। কিছুক্ষণ আগে ছিল। তাদের গালিচা শিল্প ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদা দিয়ে এলো। তাছাড়াও একটা বড় অনুদান দিতে হচ্ছে সামনের মাসের আন্দোলন-প্রস্তুতির জন্য। সবটাই দিয়ে এসেছে।

কলন্দর কানে কানে বলল, 'মা তহুরা, আমার কাছে তো এখন টাকা নেই।'

তহুরা বলল, 'আমি দিচ্ছি আব্বা, কত?'

'হরিবাবু তো বড় ডাক্তার, ষোল টাকা ভিজিট। আবার ইঞ্জেকশন দিলেন, মিক্‌সচার দেবেন।'

লায়লাকে আইসব্যাগ ধরতে বলে নিচে নেমে এসে পঁচিশটা টাকা বার করে নিয়ে সিঁড়ির মুখে বাবার হাতে দিলে তহুরা।

কলন্দর দেখল তার মুখে চোখে তেমন বিরক্তি নেই। একটা ভয়ত্রাস মাখা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তহুরা তার রক্তাক্ত কাপড়-চোপড় ধুয়ে বদলে ফেলেছে—বাপকে সেটা জানায় নি। মেয়েটাকেও জানানো বোধহয় ঠিক হয়নি। কলন্দর হয়তো চাইবে এবং চাওয়া বোধহয় স্বাভাবিক যে সিরাজ তার নাতজামাই হোক আর লায়লাও তা খুশী মনে আকাঙ্ক্ষা করবে। মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখেও তাই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ তার সঙ্গে যে ভাবে সেতুবন্ধন হয়ে গেল এর কি কোনো রকম আলো ভরা সম্ভাবনা আছে?

আবদুল হামিদের অতীত স্মৃতির কবরখানা এখন তো ঘন কুয়াশা আর অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

কলন্দর ডাক্তারের সঙ্গে চলে গেল, রোগীর দিকে একটু নজর রাখতে বলে।

ওপরে উঠে এলো তহুরা। পায়ের শব্দ চেপে অত্যন্ত ধীর পায়ে সে ঘরের

দিকে এগোল। পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলতে দেখল লায়লা আইসব্যাগ ধরে আছে ঠিকই কিন্তু সিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ চোখে।

তহুরা ঘরে ঢুকতেই সে যেন চমকে উঠল। কিছু বলতে গেল কিন্তু তহুরা চুপ করতে ইশারা করে নিজে আইসব্যাগটা হাতে নিল। বলল, 'যা তুই, মামুদ বুড়োর সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজ কর গিয়ে। চা আর পাউরুটি ডিমের টোস্ট করে রাখ। বুড়োমানুষটা এসে খেতে পেল না।'

'তুমি যাও না মা, আমি তো বরফের ব্যাগ ধরছি।'

'অবাধ্য হবি না, যা বলছি শোন, কথা-ঘ্যাচড়া মেয়ে! বুকে ঠাণ্ডা লেগে গেলে যখন নিউমোনিয়া ধরে যাবে ডাক্তার কি বলবে না এরা একেবারে মূর্খ আনাড়ী।'

'জানি জানি!' স্বগতভাবে বলে মায়ের দৃষ্টির আড়ালে চোখ-মুখ বাঁকাল লায়লা। তারপর দুমদুম করে পায়ের শব্দ তুলে কাঠের পাটাতন আর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। রান্নাঘরে মাহমুদ বুড়োর কাছে আসতে সে খুশী হয়ে লাল মুখে নাচতে লাগল। বলল, 'এসো আমার পিয়ারের বিবিজান, তোমাকে কিছু করতে হবে না, এই মোড়ার ওপরে বিবি হয়ে বসো আর আমি তোমার রূপ দেখি।'

'তুমি তো একটা বুড়ো গাড়োল।'

'আহা রাগ করো কেন। খাও এই ফলের কেকটা, আমি নিজের হাতে বানিয়েছি।'

লায়লা কেক নিল না। বিরক্ত হয়ে মায়ের ঘরটাতে এসে বিছানার ওপরে সটান পড়ে রইল। মাথা কুটল বার দুয়েক। অস্ফুটে বলল, 'চাচা! চাচার মায়ের নিকুচি করেছে। তবে লোকটা মরুক…'

কিন্তু একদিন লোকটা কত আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখেছিল সেই মেষ চরানো পুবের মাঠে। ফেরেস্তার মতো এলো তার খাবার নিয়ে—তার ছবি আঁকল। হাসি দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, 'তোমার হাসিটি ঠিক আধফোটা গোলাপের হাসি যেন….'

লায়লা ছিলাকাটা ধনুকের মতন হঠাৎ ছিটকে উঠে পড়ল। ছুটে গেল সিঁড়ির কাছে। তারপর দুরুদুরু বুকে অতি ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সে। দেয়ালের কোল বেয়ে গিয়ে দোরের পর্দার পাশ দিয়ে উঁকি মারল। দেখল তার মা স্থবিরের মতো চুপচাপ বসে আছে—চোখের জল গণ্ডের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় টেবল ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে।

মায়ের চোখে জল কেন ?

আস্তে আস্তে সরে এলো লায়লা। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে রইল। জোনাকীগুলো অন্ধকার আপেল গাছটাকে আলোর মালায় ছেয়ে ফেলেছে।

অন্ধকারেই এলো কলন্দর.। লায়লাকে দেখে বলল, 'তুই এখানে আঁধারে একা দাঁড়িয়ে কেন রে—গায়ে কাপড় দে—ঠাণ্ডা লাগে না ?'

লায়লা ঘরের মধ্যে চলে গেল।

কলন্দর উঠে গেল ওপরে।

বাবার পায়ের শব্দ শুনে তহুরা তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে ফেলে নিচে নেমে টুলে বসল।

কলন্দর বলল, 'চব্বিশ টাকা লাগল মা—আরো দুটো টাকা ধার করে তবে ট্যাবলেট এনেছি। জ্বরটা একটু কমেছে বোধহয়, না ?'

তহুরা কোন মন্তব্য করল না। কলন্দর আইস ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বলল, 'এই বরফগুলো ফেলে দিয়ে নতুন বরফ দাও মা।'

আইস ব্যাগ নিয়ে নিচে নামল তহুরা। এসে দেখল মেয়ে শুয়ে আছে। তহুরা বলল, 'তোর আবার কি হল, জ্বর ধরল নাকি ? ওঠ, তোর নানার খাবার দে !'

লায়লা উঠল না।

ব্যাগ ভরে নিয়ে আবার উঠে গেল তহুরা। বলল, 'যাও আব্বা, তুমি চা খেয়ে নাও, কখন এসেছ, কিছু খাওয়া হয়নি।'

'আগে মিক্‌সচার তারপর ট্যাবলেট খাওয়াবি মা—একঘণ্টা ছাড়া। এখন জাগলে খাওয়া। আমি নিচে যাই। আমারো মাথাটা ধরে গেছে। ইউনিয়নে খানিকটা বকমবাজি করেছি। রিজিয়ার বাপ শয়তানটা আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্যে ঘুষ খাওয়াচ্ছে। ইউনিয়নের নেতাকে আমরা পালটে দোব। তার কথাবার্তার সুর অন্য রকম। বলছে, যে-রেট আমরা আদায় করবার জন্যে সামনে মাসের পয়লা তারিখ থেকে গোটা কাশ্মীরে লাগাতার ধর্মঘট করব গালিচা শিল্পীরা, সেটা নাকি বৈধ হচ্ছে না, আরো দেরি করা ভাল, শ্রমিকরা এখনো একজোট হচ্ছে না, আর রেটটা একটু বেশি হচ্ছে—লোকটা ঘুষখোর। একটা গালিচা তৈরি করতে যত খরচা পড়ে ঠিক তার চারগুণ দামে বিক্রি করে মালিকরা। এসব চলবে না। আমাকেই এখন সবাই নেতা করতে চায়। সবাই বলে, তুমিই তো এক নম্বরের গালিচা শিল্পী। বাইরের শিক্ষিত লোককে আমরা নেতা করতে চাই না। দেখা যাক, কি হয়।'

সিরাজ স্পষ্ট কথাগুলো শুনল—কলন্দর চলে যাবার পর যখন তহুরা এসে তার পাশে বসে মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরল। সিরাজ হাত তুলে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরতে গেল। তাড়াতাড়ি তহুরা হাতটা নামিয়ে দিয়ে শাসনের সুরে বলল, 'এখন বাড়াবাড়ি নয়—তাহলে আবার রক্ত বার হবে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ পড়ে রইল সিরাজ। মিক্সচারটা খাইয়ে দিল তহুরা। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দিল।

কিছুক্ষণ সিরাজ চোখ মেলে তহুরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'তোমার চোখ দুটো ভয়ঙ্কর সুন্দর!'

লজ্জা পেল তহুরা। বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'এর চেয়ে আরো সুন্দর চোখ তো থাকতে পারে।'

'দেখিনি আমি কখনো।'

'ছবিতেও না?'

'না। হায় বুলবুল, তোমার বাসা পুড়ে গেছে প্রিয়তমার নার্গিস চাহনির আগুনে। তুমি আর বাসায় তিষ্ঠতে পারছ না।'

'লক্ষ্মীটি, তুমি এখন ওসব ভেবো না।'

'তোমার কোলে মাথা রেখে আমার মরণ হলে তার চাইতে আর কোনো সুখের কল্পনা করব না। একটা কথা এখন আমি শুধু শুনতে চাই, তাহলেই শান্তি পাব, তৃপ্তিতে ঘুমোতে পারব, শুধু জানতে চাই, তুমি আমার হবে কিনা।'

তহুরা কিছু বলল না। আরক্ত হল। বাপ আছে তার! কন্যা আছে—আর এতদিন হয়ে গেল যখন···হাবিলদার আবদুল হামিদের কথা মনে পড়ল—তবু সিরাজের আর্তি। আর তার যৌবনভরা···পরিপূর্ণ মুখাবয়বের ছবি তাকে বিভ্রান্ত করল।

হাত চেপে ধরে ক্রমাগত অনুনয় করতে লাগল সিরাজ, 'বলো তহুরা, পার না তুমি, আবার নতুন করে বাঁচতে? মেয়ের কথা ভাবছ ঠিকই, কিন্তু তুমি তো তাতে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

'চুপ করো, আমাকে ভাবতে দাও। আমি তোমার কাছে থাকলে রোগ কমা যেমন তেমন বেড়ে যাবে দেখছি! আমার কথা ভাবতে গিয়ে বোধহয় তোমার মাথার ভেতরে রক্তপাত ঘটে গেল! আমি আসছি এখন!'

'দোহাই, তুমি যেও না!'

'আমি কি সারারাত তোমার কাছে বসে থাকতে পারি। লোকে কি ভাববে?'

'লোকভয়ই মানুষকে সৎ করে রাখে, তাই না ?'

'না, আমি তা বলছি না। একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে। আমার মেয়ে বড় হয়েছে।'

'ওটা সত্যিই কি তোমার মেয়ে, না পালিতা মেয়ে ?'

'হাসালে দেখছি।'

রাত্রে কলন্দর নিজে সিরাজকে দেখা-শোনা করার কথা জানিয়ে ক্যাম্পখাট এনে বিছানা পাতল।

জ্বর কিছুটা কমলেও সিরাজের কেমন যেন একটা বেঘোর অবস্থার মধ্যে কাটল সারারাত। মাথাটা আদৌ তুলতে পারছে না, এমন ভার ভার।

রাত্রে বার দুই এসে ঘুমন্ত বাবাকে ডেকে তুলে সিরাজকে ওষুধ খাইয়ে গেল তহুরা।

কলন্দরের ভীষণ নাক ডাকে।

যতক্ষণ জেগেছিল খুবই বিরক্ত হয়েছে সিরাজ। বুঝতে পেরেছে সে, আসলে বুড়োটা চৌকিদারী করছে কিন্তু রোগের সময় তার এই অহেতুক দুর্ভোগ !

তহুরা বলেওছিল, 'আব্বা, তোমার এত নাক ডাকে, হয়তো উনি বিরক্ত হবেন।'

কিন্তু কলন্দর স্বীকারই করল না যে তার নাক ডাকতে পারে। তাছাড়া তার তেমন ঘুমই হয় না। ইউনিয়নের ভাবনাটা তার মাথায় এমন পাকিয়ে বসেছে যে ঘুম হবার কথাই নয়।

সকালে ঘুম ভাংতে বেলা হল তহুরার। কলন্দরও ওঠেনি।

কার যেন ডাকে লায়লা বাইরে বেরিয়ে দেখল রোদ উঠেছে চারদিকে। সিরাজের খোঁজে এসেছে একটা লোক, তাকে আগেও আসতে দেখেছে সে।

বলল, 'সিরাজ সাহেবের খুব অসুখ। ওপরে উঠে যাও। নানা আছে।'

রউফ এসেছিল সিরাজের খোঁজে। উপরে উঠে গিয়ে দোরে আঘাত করে কলন্দরকে জাগাল।

ভেতরে গিয়ে যখন সিরাজকে দেখল রউফ, বলল, 'সেকি ! ইনি তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। প্রচণ্ড জ্বর।'

কলন্দর ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলো। ভয় পেল যেন। বলল, 'তাইত ! জ্ঞান নেই। লায়লা—তাড়াতাড়ি পানি আন, সিরাজ অজ্ঞান হয়ে গেছে।' বারান্দায় এসে হেঁকে বলল কলন্দর।

তহুরা এলো এক বালতি জল নিয়ে, সিরাজের মাথা ধোয়াতে লাগল রউফ আর তহুরা।

কলন্দর চাদরটা মুড়ি দিয়ে ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে।

কিছুক্ষণ পরেই হরিবাবু এসে পড়লেন। টেম্পারেচার সমান আছে দেখে তিনি বিভ্রান্ত হলেন। ভাবলেন, টায়ফয়েড নয়তো? তাহলে মস্তক থেকে রক্ত ক্ষরণটা হল কেন? সিরাজকে ডেকেও তেমন কোনো সাড়া পেলেন না ডাক্তার। বললেন, 'কলন্দর ভাই, রোগীকে হাসপাতালে পাঠান—রাত্রে এর সেবা শুশ্রূষা ঠিক মতো হয়নি।'

তহুরা বাবার দিকে ক্ষোভভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

রউফ বলল, 'এনকেফেলাইটিস নয়তো ডাক্তারবাবু, নতুন এই রোগে প্রচণ্ড জ্বর উঠে মানুষ মারা যাচ্ছে।'

'সেইজন্যেই তো হাসপাতালে দিতে বলছি। সেখানে রক্তটা পরীক্ষা করে দেখবে।'

রউফ বলল, 'আমি ওর মামা আলী হোসেন সাহেবকে খবর দিচ্ছি—তিনি অবস্থাপন্ন লোক, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না।'

কলন্দর বলল, 'তাই কারো বাপ। আমি গরিব লোক, দেখাশোনার লোকের অভাব।'

বাবার এই কথা শুনে তহুরা রীতিমতো রাগল। বালতিটা হাতে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রউফও চলে গেল তাড়াতাড়ি। ঘণ্টা দুয়েক পরে ট্যাক্সি নিয়ে এলেন আলী হোসেন।

কলন্দরের সঙ্গে করমর্দন করলেন। উপরে উঠে গিয়ে সিরাজকে দেখলেন। বললেন, 'আমাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে, এখন আর দেরি নয়, রউফ ধরো, নিচে নামিয়ে নিয়ে যাই।'

সকলে ধরাধরি করে নামিয়ে এনে মোটরে শুইয়ে দেবার পর আলী হোসেন বললেন, 'ওঁর বাক্স-প্যাটরাগুলোও নিয়ে যাওয়া দরকার—কখন কি লাগে ওর!'

কলন্দর একটু দ্বিধা করল। এই দুঃসময়ে একেবারে বিদায় দেওয়াটাও তো ঠিক হবে না, তবু পরের মাল আটকাবার অভিযোগ আসার আশঙ্কা, বলল, 'হ্যাঁ, তা নিয়ে যেতে চান—যান।'

যখন বাক্স-প্যাট্রা পোষাক-আষাক ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল তহুরা মড়ার মতন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠলে তহুরা নেমে এসে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে একচোখে সিরাজের দিকে তাকাল, তারপর চাবিটা বাড়িয়ে দিল আলী হোসেনের দিকে।

আলী হোসেন চাবিটা নেবার সময় দেখল তহুরার মুখটা। মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে তহুরার প্রতি যেন সহানুভূতি জানালেন।

গাড়ি এবার ছুটতে লাগল গ্রামের পথ অতিক্রম করে। রউফ পাশে বসে সিরাজকে ধরে রইল।

শ্রীনগরে পৌঁছে সিরাজকে বিখ্যাত একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করালেন আলী হোসেন। ট্যাক্সি থেকে যেসব বাক্স প্যাট্রা নামানো হয়েছিল সেগুলো আর একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে রেখে এলেন। স্ত্রীকে জানালেন সিরাজের অবস্থার কথা।

দোকানে আসার পর অস্থির মনে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল সিরাজের বাক্সর চাবিটার কথা। পকেটের মধ্যেই পেলেন সেটা। কলন্দর একবার এলোও না হাসপাতালে? হয়তো কাজে চলে গেছে—ইউনিয়ন করছে।

ওর মেয়ে তহুরার কাছে চাবি কেন? তাহলে যে-টাকাগুলো এনেছিল সিরাজ সবই বার করে নেয়নি তো? রোগের সময় খরচ করলে অথবা স্টুডিও তৈরির জন্যে দিলেও, কতটা দিয়েছে? দশ হাজার টাকা এনেছে তো বলেছিল।

আলী হোসেন আবার বাড়িতে ছুটলেন। তোরঙ্গ খুলে দেখলেন, না দশ হাজার টাকাই আছে। তহুরা মেয়েটা তাহলে সত্যিই সৎ। কি ভয়ঙ্কর অপরূপ দেখতে ওকে। কুমারী মেয়ের মতো এখনো ওর পরিপূর্ণ ডৌল আছে। বোধহয় সিরাজের সঙ্গে ওর ভাব-ভালবাসার মতন একটা কিছু হয়ে থাকতে পারে।

টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে—কিছু বেগতিক দেখলে ফোন করবে ওরা, রউফও আছে হাসপাতালে—এ্যাডভান্স টাকা জমা দিয়ে এসেছে—কুড়ি টাক করে প্রতিদিনের ফিজ।

বিকালে গিয়ে দেখলেন আলী হোসেন, নাকে গ্যাস দেওয়া আছে সিরাজের। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার পর জানতে চাইলেন রোগীর অবস্থা কেমন।

ডাক্তার বললেন, 'সময় লাগবে সেরে উঠতে। আগামী কালই কথা বলতে পারবেন আশা করছি। জর নেমে গেছে। আকস্মিক একটা কিছু ঘটেছে। হার্ট

আনব্যালেন্সড। ব্রেনের রক্ত ক্ষরণটা কেন হল ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ধরা যেতে পারে। আচ্ছা, রোগী কি মদ খেতেন খুব?'

'না না, মদ ও মোটেই খায়না।' বললেন আলী হোসেন।

সন্ধ্যার সময় কলন্দর এলো—দোকান থেকে খোঁজ নিয়ে নাকি জেনেছে সে নার্সিং হোমের ঠিকানাটা।

ডাক্তার বারণ করে দিয়ে গেলেন যেন রোগীর ঘরে বেশি কেউ নড়া-চড়া না করেন।

তহুরা বাবার কাছ থেকে শুনল সিরাজের অবস্থার কথা। তার নাকে নাকি গ্যাস দেওয়া আছে।

তহুরা বাবাকে আর মেয়েকে খাওয়াল, মাহমুদ বুড়োও খেয়ে উঠে শুতে গেল। কিন্তু তহুরা কিছু খেল না। চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল। বিড়ালটা ম্যাও ম্যাও করে ডাকতে লাগল। শিখা তুলে এঁকেবেঁকে জলছে লম্ফটা। সারাদিন আজ অনাহারে দিন কাটল তহুরার। থালাবাসন গুটিয়ে রেখে সে শুতে যাবে বলে যেই এগিয়ে এসে সিঁড়ির কাছটায় এলো অমনি সে ডুকরে কেঁদে উঠল। সিরাজকে এখান দিয়ে বয়ে নিয়ে গেছে, তার হাত দুটো ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল। লাল কুঁচের মাতা চোখ মেলল একবার। ওর সবকিছু নিয়ে গেল কেন এখান থেকে? তবে কি আর এখানে ফিরবে না?

সিঁড়ির রেলিংয়ের থামের মাথায় কপাল রেখে কাঁদতে লাগল তহুরা। বলতে লাগল, 'আল্লা, আমার অপরাধ নিওনা। আমি যদি সারারাত ওর মাথায় বরফ দিতে পারতাম তাহলে সকালে অমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত না। আল্লা, ওকে বাঁচিয়ে দাও।...'

কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গেছে।

কলন্দর একসময় নেমে আসছে জানতে পেরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দোর এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল তহুরা।

কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে।

॥ ১৮ ॥

গালিচা-শিল্পীদের ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল।

তাদের মিছিল বের হল। হাজার হাজার লোকের মিছিল। পুরোভাগে আছে কলন্দর। মানুষের হাতে আছে ফেসটুন, পতাকা। তারা ধ্বনি দিচ্ছে: 'গালিচা-শিল্পীদের শোষণ করা চলবে না—চলবে না। সাতদফা দাবি মানতে হবে। নইলে কারখানা অচল থাকবে।...'

সারা শ্রীনগর শহর গালিচা-শিল্পীদের মিছিলের ভিড়ে ডুবে গেল। মিছিলে লোক এসেছে কাশ্মীরের নানান শহর, গ্রাম, জনপদ থেকে।

শেষে তারা মহাকরণ ভবনের চারপাশে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করল—স্মারক লিপি পাঠাল শিল্পমন্ত্রীর দরবারে।

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

মানুষ বিক্ষুব্ধ হতে লাগল।

হঠাৎ জনতার ওপরে ইট, পাথর, সোডার বোতল ছোঁড়া হলে তারাও মরিয়া হয়ে ইট-পাথর ছুঁড়তে লাগল।

পুলিস ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে শুরু করল। মারামারি হুড়োহুড়ি আরম্ভ হল। কয়েকজন পুলিস আহত হল। তখন গুলি করতে আরম্ভ করল! অনেক লাস পড়ে গেল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। অনেকে বন্দী হল।

মালিকদের পক্ষে তাদের টাকা কাজ করল। কলন্দর আহত হল খুব গুরুতর ভাবে।

বাবা মিছিলে যাওয়ার সময় ফাঁক পেয়ে তহুরা তার মেয়ে লায়লাকে নিয়ে নার্সিং হোমে গিয়েছিল সিরাজকে দেখতে। সিরাজ তখন অনেক খানি সুস্থ হয়ে উঠেছে। নার্সিং হোমের ডাক্তারবাবুরা তহুরাকে দেখে খুশী হয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তোয়াজ করতে লাগলেন। চা জল-খাবার দিলেন। ওর প্রতি রোগীর আগ্রহ আর মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টি দেখে তাঁরা বোধহয় শিরঃপীড়ার কারণ অনুমান করতে পেরেছেন।

নার্সিং হোমের মালিক ডাঃ সেনগুপ্ত শুনেছিলেন বটে হাবিলদার আবদুল

হামিদের স্ত্রী অসামান্ত রূপবতী কিন্তু তার দিকে কেউ এগোতে পারে নি—ভয়ঙ্কর তেজি মেয়ে, সেকথাও তিনি জানালেন কাশ্মীরী ভাষায় মিষ্টি মিষ্টি করে।

তহুরা হাসল শুধু।

সিরাজ কয়েকদিনের মধ্যে কত যেন রোগা হয়ে গেছে। ফর্সা সুন্দর লালিত্য ভরা রং ওর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সিরাজ জানত না যে তার বাক্স প্যাট্রাগুলো সব নিয়ে আসা হয়েছে। যখন তা জানতে পারল মামার ওপরে ক্ষুণ্ণ হল। বলল, 'মামা কি টাকাগুলোও এনেছেন?'

তহুরা বলল, 'বাক্সেই তো ছিল—'

সিরাজ অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বাইরের ফুলভরা গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।

গালিচা-শিল্পীদের মিছিল চলেছে সে কথাও শুনল ডাঃ সেনগুপ্তর কাছ থেকে।

জানালায় এসে মিছিল দেখছিল তহুরা আর লায়লা। তারা দেখল কলন্দরকে মিছিলের পুরোভাগে। অনেক বুড়ো মানুষ চলেছে মিছিলে।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে তহুরা যখন শুনল তার বাপ আহত হয়েছে আর তাকে পুলিস ভ্যান তুলে নিয়ে চলে গেছে—কোথায় কোন হাসপাতালে রেখেছে তা তারা জানে না—তখন তার দু'চোখ থেকে অশ্রু নামতে শুরু করল। গ্রামের আরো সব লোকজন এলো। কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। অনেকেই চোটচাট পেয়েছে বা বন্দী হয়েছে।

তারা চলে যেতে তহুরা মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। না, তার কপালে সুখ নেই।

জেগেই ছিল সে—কোরআন শরীফ নিয়ে বসেছিল। আল্লাকে শরণ করছিল সে।

হঠাৎ এই মাঝরাতে কে যেন ডাকল, না?

দোতলার ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে উঁকি মারল তহুরা। কম্বল মুড়ি দেওয়া দুজন লোক!

'কাকে চাই?' শুধোলে তহুরা।

'এদিকে শোনো—খবর আছে।' বলল একজন ভুতুড়ে অচেনা গলায়।

মশালের আলো জ্বলছে হালকাভাবে নিচের বারান্দায়।

মাহমুদকে ডাকতে নিচে নেমে এলো তহুরা। ডাকতে ডাকতে মাহমুদ যখন

উঠল, তহুরা বুঝতে পারল, লোক দুটো অস্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া করছে। রেলিংটা টপকে আসবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ওদের উদ্দেশ্য খারাপ। ছুটে সে উঠে গেল দোতলায়। তলোয়রটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে কর্কশস্বরে শুধোলে, 'কারা তোমরা? কি চাই তোমাদের? মামুদ, পাকডাও করো ওদের।'

মাহমুদ লাফ দিয়ে পড়ল তাদের ওপরে। ঝটাপটি শুরু হয়ে গেল। একজন ছুটে এসে তহুরাকে ধরতে গেলে তহুরা তলোয়ারের আঘাত হানল তার মাথায়। লোকটা 'বাপ' বলে মাথায় হাত দিয়ে ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল খোলা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে।

অন্য লোকটার দিকে ছুটে গেল তহুরা। সে তহুরার তলোয়ার-ধরা হিংস্র মুর্তি দেখে বুড়ো মাহমুদকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিয়ে লাফ মেরে ছুটে পালিয়ে গেল।

তহুরা নিচের ঘর থেকে লায়লাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল দোতলায়। সিঁড়ির মুখের কপাট ফেলে চাবি এঁটে দিল। দোর বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল সিরাজ যে বিছানায় শুত, সেই বিছানাটাতে।

মেঝেয় মোমবাতি জ্বলছে। কোরআন শরীফ খোলা আছে। উঠে কোরআন শরীফটা তুলে রাখল তহুরা।

লায়লা বলল, 'চোর এসেছিল হ্যাঁ মা?'

'হ্যাঁ, তুই তো মরে ঘুমুস।'

আর ঘুম এলো না তহুরার চোখে। লোক দুটো কেন এসেছিল ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারল সে তার বাবা আহত, সিরাজ নার্সিং হোমে, এখন বাড়ি ফাঁকা —মাহমুদ বুড়ো থেকেও নেই—তাই তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার ফন্দি এঁটেছিল কেউ পিছন থেকে। এ কাজ কে করতে পারে? গালিচা-শিল্প-মালিক রিজিয়ার বাপ? অথবা মোল্লাপন্থীরা কেউ? লোকটা আঘাত পেয়েছে। চিনতে পারেনি দুজনের কাউকে। এই এলাকার লোক নয়।

যদি তলোয়ার না নিয়ে কথা বলার জন্যে নেমে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করত হঠাৎ তাকে নিশ্চয়ই জড়িয়ে ধরত আর মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে পালাত!

ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

যার বাড়িতে বিপদ তার ওপরে এই পাশবিক অন্যায় করার মন্ত্রণা যারা চালাচ্ছে তারা কারা?

এক সময় সকাল হল।

ইউনিয়নের লোকজনরা এলো কয়েকজন। গতদিনের মিছিলের ঘটনা কিছু বলল। খবরের কাগজ পড়ে শোনাল। কলন্দর নাকি মেডিক্যাল হাসপাতালে আছে। তার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বিকালের দিকে তহুরা আর লায়লা কলন্দরের খোঁজ পেল একজন নার্সের দয়ায়।

অচৈতন্য অবস্থায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শরীর নিয়ে পড়ে আছে কলন্দর।

দমকা দমকা শ্বাস উঠছে তার।

কাঁদতে লাগল তহুরা আর লায়লা।

একজন ডাক্তার এসে হটিয়ে দিল তাদের। অভদ্র ব্যবহার করল।

চলে এলো তারা।

সিরাজের সঙ্গে নার্সিং হোমে দেখা করল।

সিরাজ কলন্দরের অবস্থার কথা শুনে ওদের আশ্বস্ত করবার ভাষা খুঁজে পেল না।

ওরা কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুছতে মুছতে চলে এলো। সিরাজ খানিকটা এলো আর ওদের সঙ্গে যাবার জন্যে ছুটি চাইল কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করলেন। বললেন, 'আর দু'চারদিন থাকুন।'

পরদিন সকালের খবরের কাগজে সকলেই জানতে পারল কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ গালিচা-শিল্পী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কলন্দর সাহেব শহীদ হয়েছেন।

সিরাজ লাফ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কাগজটা হাতে নিয়েই। ডাক্তার নার্স সবাই হাঁ হাঁ করে পিছনে পিছনে ছুটলেন। নিশ্চয়ই রোগী পাগল হয়ে গেছে।

পথে এসে ট্যাক্‌সিতে উঠে বসল সিরাজ। একবার বলল, 'চালাও মেডিক্যাল কলেজ'—পরে বলল, 'না না, শাহী গাঁও চলো—শহরকা পূব তরফ—'

কলন্দর সাহেবের বাড়ির সামনে তখন অনেক লোকজন। তারাও খবর পেয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষক তাদের যেন কি সব বোঝাচ্ছেন।

সিরাজকে দেখতে পেয়ে শিক্ষক এগিয়ে এলেন। সালাম জানালেন। হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দিল একজন।

সিরাজ দেখল তহুরা আলুলায়িত কেশে মাথা কুটে কুটে কাঁদছে। লায়লাও কাঁদছে। কতকগুলো পড়শি মেয়ে তাদের কান্নায় অংশ গ্রহণ করে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সিরাজকে দেখে তহুরা আরো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। হাত ধরে টেনে তুলল তাকে সিরাজ। বলল, 'বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়, এভাবে ভেঙে পড়তে নেই। ওপরে এসো—কথা আছে।'

সিরাজ উপরে এলো। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। তহুরা ওর পাশে বসে পড়ে দুহাতে ওকে চেপে ধরে বলে, 'তুমি অসুস্থ, হঠাৎ ছুটে এলে কেন?—ওগো আমার কি হবে—আমি যাকে ধরি সেই ভেসে যায়, এমনি আমার কপাল!'

সিরাজ হাত ছাড়িয়ে দিয়ে ওর লাল-হয়ে-যাওয়া মুখখানা দেখল—চুলগুলো সরিয়ে দিল। বলল, 'ভালই হল, আমি বাঁধন-কাটা সোনার তরী ধরে নেবো। শোনো তহুরা, সকালে খবরের কাগজে সংবাদ দেখেই আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছি। ডাক্তার নার্স'রা পিছনে পিছনে ছুটলেন—ভেবেছেন বোধহয়, পাগল হয়ে গেছি? তুমি ধৈর্য ধরো, কেঁদো না। মানুষ পৃথিবীতে কেউ বেশিদিন থাকে না। সার্থক মৃত্যু অনেক ভাল। এখন আমি আব্বার লাস আনতে যারা যাবে তাদের মিছিলে যাব। যেখানে গুলির ঘায়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেখানে শহীদ মিনার গাঁথা হবে।'

'না না, আপনি'—

'তুমি বলো।'

'না, তুমি—যেও না। তোমার এই রোগা শরীর!'

'ঠিক আছে দেখছি—এসো তুমি।' সিরাজ উঠে দাঁড়াল। মাথাটা ঘুরছে তার। তবু দুহাতে ওর মুখখানাকে দেখল সে কিছুক্ষণ। যেন এক অমৃতের পেয়ালা। ঠোঁট দুটো কি অপূর্ব স্ফুরিত আর নিখুঁত। চোখভরা জল। সেই জলভরা চোখেই ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খেল সিরাজ।

তহুরা হাত দিয়ে ওর মুখটা সরিয়ে দিল মৃদু চাপ দিয়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রাত্রের দুর্বৃত্তদের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ সিরাজের বুকের ওপরে ভেঙে পড়ল: 'আমাদের কি হবে। কে আমাদের দেখবে! এবার আমরা যে অনাথ হয়ে গেলাম।'

মাথাটা বুকে চেপে ধরে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে সিরাজ আশ্বাস দিতে লাগল, 'আমি আছি তো, আজই চলে আসব—কেউ আটকাতে পারবে না। বলো, তুমি আমার হবে?

'হ্যা।'

সিরাজ এবার তহুরাকে যেন উন্মাদের মতো জড়িয়ে ধরল। চুমো খেতে লাগল ঠোঁটে, নাকে, চোখে, গণ্ডে, কপালে, চুলে, হাতে। তারপর হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে নেমে গেল।

এত দুঃখেও আনন্দে যেন বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করতে লাগল তহুরার। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল মাথায় কালো কাপড় জড়িয়ে হাজার দুয়েক লোক চলেছে শহরের দিকে। পুরোভাগে আছে সিরাজ। এতখানি পথ ও হেঁটে যেতে পারবে তো!

॥ ১৯ ॥

সারা শহর ঘুরে শবযাত্রীরা মিছিল নিয়ে কলন্দর সাহেবের বাড়ির সামনে যখন এসে হাজির হল সিরাজকে একচোখ দেখে ভয় পেল তহুরা।

কাফন-দাফনের ব্যবস্থা হতে লাগল।

সিরাজ এক সময় ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে উঠে এসে শুয়ে পড়ল। পায়ের জুতো পর্যন্ত খোলা হল না। ক্লান্তি ক্ষুধা আর অবসন্নতায় তার আর হুঁস রইল না।

মাদ্রাসার ওস্তাদজী জানাজা পড়ালেন। কবর দেওয়া হয়ে গেল রাত আটটা নাগাদ।

সবাই চলে গেল। পড়শীরা লায়লাকে খেতে নিয়ে গেল—তহুরা কিছুতেই গেল না। নিচের ঘরে আলোর সামনে চুপচাপ মাথা গুঁজে বসে রইল।

মাহমুদ এক সময় খাবার এনে তাকে ডাকল, 'মা, কিছু খাও এবার। ওঠো মা-মণি।'

'তোমার কোনো শোক-দুঃখ নেই, না?'

মাহমুদ এবার হা হা করে কেঁদে উঠল।

'আমার মনিব, অনেক কালের বাপ-সমান মনিব মারা গেল—আমি আর কি নিয়ে থাকব—মা-মণি এবার আমাকে ছুটি দাও—দেশে চলে যাই।'

'আচ্ছা মামুদ, তুমি দেখেছ, ও কোথায় গেল?'

'কে মা?'

'ওই যে আমাদের বাড়ি থাকত, ছবি-আঁকা বাবু, ও যে খুব অসুস্থ—

মিছিলের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে এসেছিল—কোথায় সে? কবর দিতে গিয়েছিল কি?'

'না মা-মণি, 'তাকে তো দেখি নি। বড় ভাল লোক মা। ওকে তুমি ছেড়ো না। ও তোমার সুখ চায়।'

'ওপরের ঘরে নেই তো?'

'বারো-সতেরো ঝামেলা নিয়ে ছিলাম—ওপরে যাইনি তো মা—তাছাড়া আমি বুড়ো মানুষ, মনিবের শোকে একদিনেই যেন আরো বুড়িয়ে জড়ো হয়ে গেলুম—সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে গেলে আমার বাতে-ধরা হাঁটু দুটো বড্ড কনকন করে—'

'বসো, আমি দেখে আসছি'—তহুরা তাড়াতাড়ি আলো না নিয়েই অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখল ঘরের দোর খোলা। বিছানায় হাতড়াতে গিয়েই হাত পড়ল সিরাজের জুতো-পরা পায়ের ওপরে। সে ভয়ে যেন কাঁপতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে এগোতে লাগল। নাকে হাত দিয়ে দেখল বেঁচে আছে কিনা। দেখল, নিঃশ্বাস পড়ছে!

কাঁপছে তহুরা। কি করবে এখন সে? জাগাবে? আলো নেই ঘরে।

'এই!' ডাকল তহুরা।

সাড়া পেল না।

'এই, ঘুমোচ্ছ নাকি!'

'কে! এঁ্যা! ওঃ! কবর হয়ে গেছে! অন্ধকার যে! তুমি, তহুরা—'

'কি আশ্চর্য! তুমি এভাবে সেই সন্ধ্যা থেকে মরার মতো পড়ে আছো! অসুস্থ শরীর। চলো, নিচে চলো।'

তহুরাকে ধরে ধরে সিরাজ নিচে নেমে এলো। বুড়ো চাকরটাকে দেখল। লালমুখ বুড়ো মাহমুদ তখনো কাঁদছে।

আলো নিয়ে কবরটা কোথায় হয়েছে তাকে দেখাতে যেতে ইংগিত করল সিরাজ।

মাহমুদ আলো হাতে নিয়ে বাগানের মধ্যে গেল—কাছে এসে সিরাজ পরপর তিন মুঠো মাটি দিল কবরের ওপরে। তারপর ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বসতে তহুরা খাবার এনে দিল।

লায়লা ফিরে এসে নিচের ঘরে শুয়ে পড়ল। পড়শি যে মেয়েটা তাকে দিতে এসেছিল সেও চলে গেল।

খাবার পর সিরাজ দোতলার ঘরে এসে ঘর বন্ধ করে দিয়ে কম্বল মুড়ি দিল।

তহুরাও খেলে কিছু। তারপর মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে সিরাজ বুঝল তার পেট খারাপ করেছে। প্রচুর পিত্ত উঠে গেল বাথরুমে যেতে। পায়খানাও হল প্রচুর। সে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

তহুরা এক গ্লাস গরম ছাগল-দুধ এনে দিতে সিরাজ বলল, 'পেট খারাপ করেছে, দুধ খাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। ভয়ঙ্কর দুর্বল লাগছে।'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো তাহলে। আজ কোথাও বেরুবে না। মিস্ত্রিরা এসেছে, স্টুডিয়ো তৈরির কাজটা বন্ধ ছিল, ওদের বাকি মজুরীগুলো আমার কাছে যা ছিল দিয়ে দিয়েছি।'

'আহা, এখন ওসব থাক না। আমার সুটকেশ তোরঙ্গগুলো নিয়ে গেল কেন? টাকা কি তার ভেতরেই আছে?'

'হ্যাঁ, আমি মামুকে চাবিও দিয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, মিস্ত্রিদের কাজ করতে বলো। কোনো কাজেও হাত দিতে পারছি না। কবে যে সুস্থ হয়ে উঠব।'

'হরি ডাক্তারকে ডাকব?'

না থাক।'

'মাহমুদ ওর দেশের বাড়িতে চলে যাবে বলছে।'

'যায় যাক—কিন্তু তুমি তো এই হাতে রান্নার কাজ করতে পারবে না।'

হাসল তহুরা। বলল, 'দুঃখে পড়বার পর পেটের দায়ে লোকের গম, যব, ছোলার যাঁতা ঘুরিয়েছি, গম কেটেছি, ছোলা পাছড়েছি, আর রান্না করা তো সামান্য মেয়েলি কাজ কিন্তু তা হোক মামুদকে বিদায় দেওয়াও দরকার, রোজগার যখন বেশি হবে তখন আবার লোক রাখা যাবে। আচ্ছা, যে মহাজনের কারখানায় আব্বা কাজ করত সেখানে তো মাইনে বাকী আছে বোধহয়, কি করে সেটা পাওয়া যাবে?'

'একেবারে হাতে কিছু নেই?'

তহুরা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল।

লায়লা ম্লান মুখে এসে দাঁড়াল। তহুরা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও মা, ছাগল-ভেড়াগুলোকে রোদ্দুরে মাঠে দিয়ে এসো।'

লায়লা চলে গেল।

নেমে গেল তহুরাও।

মিস্ত্রিদের কাজ করার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

'কিছুক্ষণ পরে তহুরা কতকগুলো ফল কুঁচোনো এনে মাথার ধারে বসে সিরাজকে খাইয়ে দিতে লাগল।

হঠাৎ রউফ আর ইসমত এসে ডাকতে তহুরা বেরিয়ে গেল।

রউফ বলল, 'কি কেলেঙ্কারী! নার্সিং হোম থেকে ওভাবে ছুটে বেরিয়ে এলেন, মামু তো রিপোর্ট পেয়েছেন আপনি পাগল হয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন!'

সিরাজ হাসল একটু। বলল, 'আমার একটু উপকার করো ভাই রউফ—মামাকে বলে বাক্স-তোরঙ্গগুলো এনে দাও। আমি এখানেই থাকব।—বসো ইসমত।'

ইসমত বলল, 'আপনি তো ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমার বাবার কাছ থেকে কিছু কাজ এনেছি।' ঝোলা থেকে কাগজপত্র বার করল ইসমত। বলল, 'এই দুটি সিনেমার লেটারিং করে দিতে হবে। সবই লেখা আছে। দুটিতে আপনি পরিশ্রমিক কত নেবেন?'

'আমি আর কি বলব? পছন্দ হলে বিল করে দেবো।'

'আশু ব্যানার্জি আগে করতেন। বম্বে থেকে উনি সম্প্রতি কলকাতায় চলে গেছেন। বাবা স্যুটিংয়ের জন্য কাশ্মীরে এসেছেন। সপ্তাখানেক পরে বম্বে চলে যাবেন। আপনি কি এ্যাডভান্স কিছু নেবেন?'

'আমার লেটারিং পছন্দ হয় কিনা দেখ।'

'হবে হবে। নিন, এই আড়াইশো টাকা রাখুন।'

'এটা তুমি ব্যক্তিগত ভাবে দিচ্ছ বোধহয়।'

'নাহয় দিলামই।'

'ঠিক আছে, আমারও হাতটান আছে-ভাই রউফ, তুমি যাও—মামাকে না হয় একটা চিঠি লিখে দিই।'

কাগজ আর পেন দিল ইসমত।

সিরাজ লিখে দিল: মামা, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। কলন্দর সাহেবের মৃত্যুসংবাদ কাগজে দেখেই আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। কলন্দর সাহেবের বাড়িতেই থাকব ঠিক করেছি। আপনি আমার বাক্স-তোরঙ্গগুলো রউফের হাতে পাঠিয়ে দিন। স্টুডিও তৈরির কাজ আবার চালু করা হয়েছে—এখানেই বসব।'

রউফ আর ইসমত চলে গেল।

অনেকক্ষণ তহুরা এলো না।

আস্তে আস্তে সে নিচে নেমে এসে দেখল মাহমুদ বাড়ি যাবার জন্তে তৈরি। হাতের টাকাগুলো তহুরার হাতে গুঁজে দিল সিরাজ।

তহুরা টাকাগুলো একবার দেখল। হাসল সে মুখ টিপে। একশো টাকা নিয়ে মাহমুদকে দিতে সে নিয়ে নিল। তারপর বোঁচ্‌কাটা কাঁধে গলিয়ে নিয়ে সালাম জানিয়ে নেমে গেল। লায়লা তাকে দেখতে লাগল চেনার গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মাহমুদ যাবার সময় কলন্দরের কবরটা তিনবার বেড় করে ঘুরল তারপর বসে হাত তুলে মোনাজাত করল। পরে উঠে দীর্ঘ হাঁটা পথে ন্যুব্জ দেহে চলে যেতে লাগল উত্তরদিকে। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তহুরা আর লায়লা।

সিরাজও পৈঠার ওপর রোদে বসে সরু একটা গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে কেটে মাহমুদের মূর্তিটা কয়েকবার আঁকল আবার মুছে ফেলে দিল।

ঘণ্টাদুই পরে লায়লা বাজার করে এনে দেবার পরে তহুরা যখন রান্না বসিয়েছে ঠিক তখনই টাঙ্গায় করে এলো রউফ।

বাক্‌স প্যাটরাগুলো নামিয়ে টাঙ্গাওয়ালার সাহায্যে সেগুলো ওপরে তুলে দিল রউফ। চাবির রিংটা হাতে দিল সিরাজের।

সিরাজ তোরঙ্গ খোলার পর দেখল টাকার বাণ্ডিলগুলো নেই। সে খুব বিস্মিত হল। অন্য বাক্‌সগুলোও দেখল, না, একটি বাণ্ডিলও নেই।

বলল, 'তাহলে। টাকাগুলো কি হল?'

রউফ বলল, 'কত টাকা?'

'হ্যাঁ, দশ হাজার টাকা ছিল যে!'

'কি জানি,' মামু বললেন, ওঃ! থাকবে তাহলে ওখানে? ঠিক আছে, নিয়ে যাও ওর মালপত্র। বাকসগুলো দারোয়ান বার করে দেবার পর যখন টাঙ্গায় উঠি তখন আলী মামু চাবির রিংটা দিলেন আর কিছু বললেন না।'

'মামা বার করে নিয়ে রাখতে পারেন কি?' সিরাজ নেমে এলো। তহুরার কাছে গেল। তার মুখের পাশ থেকে চুলের গোছাটা তুলে দিয়ে বলল, 'জানো তহুরা, ঐ টাকাগুলো না—'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে?'

'বাক্‌সে নেই।'

'বলো কি!' হাত থেকে ঝনাৎ করে আনাজের পাত্রটা পড়ে গেল। তহুরা বলল, 'আমি তো যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে। হয়তো মামা আমাকে জব্দ করার জন্যে টাকাগুলো বার করে নিয়ে রেখেছেন। তার টাকার অভাব নেই, দিয়ে দেবেন।'

সিরাজ অন্যমনস্কভাবে চলে এলো। বাক্‌স প্যাঁটরা খোলাই পড়ে রইল।

রউফ বলল, 'আমি ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়ে গেলাম।'

'আরে কিছু না।' পিঠ চাপড়ে দিল সিরাজ। 'চলো দেখি, মামার কাছে যাই।'

দুজনে নেমে এলো।

তহুরা বেরিয়ে এলো উন্মুক্ত মাথায়। এই প্রথম রউফ তহুরাকে অমন মুক্ত বেশে দেখল। সে যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকাল। তারপর মাথা হেঁট করে নিল। অস্ফুটে বলল, 'সত্যি এত সুন্দরী মেয়ে আমি বোধ হয় আর কখনো দেখি নি।'

সিরাজ বলল, 'আমাকে দোষ দিও না তাহলে একটি বিধবাকে দেখে ভুলেছি বলে!' তহুরাকে বলল, আসছি আমি, মামার কাছ থেকে ঘুরে আসি।'

বাসে করে শ্রীনগরে পৌঁছে মামার সঙ্গে তাঁর দোকানে দেখা করল সিরাজ।

আলী হোসেন বললেন, 'কি ব্যাপার, তুই যে পাগলের মতো নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে গেলি হঠাৎ! এখনো দুর্বল শরীর।'

'ঠিক আছে, আর কিছু হবে না। নার্সিং হোমের পাওনা কড়ি কি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ সে সব মিটিয়ে দিয়েছি, তাহলে তুই ওখানেই থাকবি? বসো, বাবা রউফ।'

'ওখানেই থাকব। নিরিবিলি জায়গা।'

'হুঁ হুঁ বাবা—বুঝতে পারছি সব! যা ভাল বোঝ করো।'

'আচ্ছা মামা, বাক্সের মধ্যে আমার যে দশ হাজার টাকা ছিল—'

'সেগুলো নেই তো? আগেই বলেছিলাম, ওগুলো ব্যাঙ্কে রাখো। এখন সব গেছে তো! আমাকে যেন দোষ দিও না।'

সিরাজ যেন অন্ধকার দেখল।

কাকে সে এখন দোষ দেবে?

দুর্ভাগ্যের হাতে পড়েছে সে। কত কষ্ট করে টাকাগুলো এনেছিল জমি-জায়গা বেচে। চাষীদের মুখগুলো তার মনে পড়তে লাগল। তাকে দেনা করে টাকা দিয়েছে।

'ঠিক আছে। নার্সিং হোমের চার্জটার পরিমাণ কত পরে জানালে আমি দিয়ে দেবো।' বলেই সিরাজ উঠে চলে এলো।

রউফ বসে রইল ম্লান মুখে।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল সিরাজ—তহুরা, আলি হোসেন আর রউফের মধ্যে কে নিতে পারেন টাকাগুলো?

তহুরা তো নিতেই পারে না। রউফ নেবে কি? না, তা মনে হয় না। অবস্থাপন্ন ঘরের বেকার ছেলেরা অবশ্য কিছুটা হাত ছ্যাচ্‌ড়া হয় কিন্তু রউফের টাকার তেমন অভাব নেই—নিজেও ব্যবসাতে বসে। তাছাড়া সিরাজকে ও শ্রদ্ধা করে।

মামা আলী হোসেন—তাঁকে সন্দেহ করা যায়—কারণ আছে। কারণগুলি এক এক করে বিশ্লেষণ করা দরকার। পকেটে পয়সা নেই—হাঁটতে হাঁটতেই চলল সে। রোদের তাপ বাড়ছে। খুব দুর্বল লাগছে শরীরটা। এখন সে পথের ভিখারী। অথচ তহুরা আর লায়লার ভার এসে পড়েছে তার ওপরে। যদি আবার আরো কঠিন রোগে পড়ে যায় তবে তহুরা কেমন করে সামলাবে? আবার কি সে দৈহিক শ্রম করতে বেরুবে?

না, এটা আর ভাবতেও পারে না সে।

শাহী গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে প্রধানত দুটি কাজ আছে—এক গালিচা বোনা আর নকশার কাজ, অন্যটি কাঠ কুরে কুরে নানান আসবাব তৈরি করা। কেউ কেউ জরি-চুমকির কাজও করে।

বাগানের নিচের জমিতে কিছু গম পেকেছে কলন্দরের, দেখেছে সিরাজ। ওগুলো তহুরা নিশ্চয়ই কেটে মেড়ে-ঝেড়ে নেবে।

ফুলের চাষও আছে কাশ্মীরে। সরু চালের ধানও হতে দেখেছে। তবে চাষের কাজ এখানে তেমন বেশিদিনের নয়। এটা মরশুমী। নকশা বা গালিচা, শাল বোনার কাজই সারা বছর চলে।

॥ ২০ ॥

ঝিলামের তীরে এসে গাছের নিচে অনেকক্ষণ বসে রইল সিরাজ। সে এখন নিষ্কপর্দক। যদি আঁকতে পারেও কিন্তু এখন হাতে হাতে টাকা পাবার ব্যাপারই বা কি আছে। কমার্সিয়াল কিছু কাজ সে পেতে পারে কিন্তু কাশ্মীরী ভাষাটা তো তার জানা নেই। হিন্দী বা ইংরেজিতেই সে কথাবার্তা চালায়। অনেকেই হিন্দী ভাল বলতে পারে—কেউ কেউ আবার হিন্দী বোঝেই না। তাদের সঙ্গে ইশারায় কথা বলতে হয়।

রউফ আর ইসমত বাংলা বললে বুঝতে পারে কিন্তু বলতে পারে না। কলন্দর ভাল বাংলা বুঝতেন, হিন্দী বলতে পারতেন। তহুরা বা লায়লা আদৌ বাংলা বোঝে না কিন্তু হিন্দী বলতে পারে। ওরা মা-মেয়েতে যখন কাশ্মীরী আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে কিছুই প্রায় বোঝা যায় না।

সিরাজ ভাবল তহুরাকে বাংলা শেখাবে আর নিজে কাশ্মীরী ভাষাটা তাড়াতাড়ি শিখে নেবে। আরবী উর্দু কিছুটা সে জানে, কাজেই অসুবিধে হবে না। উঠে পড়ে হাঁটতে লাগল সে।

পাহাড়ের নিচে একটি বিস্তীর্ণ গভীর নীলাভ জলাশয়। ওপাশে সুন্দর গাছের সারি। ফুল ফুটেছে গাছে গাছে। একটি মেম চেন বাঁধা কুকুর নিয়ে চলে যাচ্ছে নিচের উপত্যকা পথে। শাল গস্ত করে নিয়ে তিন জন কাবুলী চলেছে—কালো বোরখা মুড়ি দেওয়া কয়েকটি মেয়ে যাচ্ছে অনেক পিছনে।

টাঙায় চড়ে চলেছে বেজায় মোটা একটি লোক।

দূরে বাস গাড়ি যাতায়াতের শব্দ।

পাখিরা পাকা গমের ক্ষেতে ঝাঁক বেঁধে এসে নামল। নির্মেঘ আকাশ। উত্তরদিকে পর্বতচূড়া। সবুজ কালো জঙ্গলের ছায়া পর্বতের গায়ে।

নিসর্গ শোভা এখানে এতই চমৎকার যে মানুষের দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়।

মামা আলী হোসেন কেন টাকা নিতে পারেন সেই কথাটা এখন ভাবা দরকার। এক নম্বর, মামা তাকে আয়ত্তে আনতে চান। দুই, মামা আজ ধনীলোক হয়েছেন ঠিকই কিন্তু তিনি নব যৌবনে মায়ের গহনাগাঁটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। কলন্দর কমিউনিস্ট, তাঁকে ধনী হিসাবে তিনি পছন্দ করতেন না।

কলন্দরের ভাসমান সংসারের হালধরা, বিশেষ করে একটি শিক্ষিত নামজাদা সুদর্শন কুমার হয়ে বিধবা সুন্দরীর প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া বোধহয় পছন্দ করতেন না।

তিনি বলেছিলেন তার যা রূপ তাতে রাজকন্যা মুগ্ধ হতে পারে এবং তাহলে রাজ্যপাটও লাভ হবে। এরজন্য যদি দুশ্চরিত্রা রিজিয়াকেও বিয়ে করতে চায় তবে বোধহয় মামা অরাজি হবেন না। কিন্তু এসব কারণের জন্য মামা কি তার টাকা নিয়ে আটকে দিয়ে তাকে জব্দ করতে পারেন? না কি ঐ টাকা তহুরা বা লায়লাদের খাইয়ে শেষ করে ফেলি মামা তা চান না।

মামী কি ঐ টাকা সরাতে পারে? না, তা মনে হয় না। সে জানে মামীর কাছ থেকে সে টাকা আদায় করতে পারে যদি সে তার সঙ্গে গোপন প্রেমপ্রণয় করে। তওবা আসতাগ ফেরুল্লা—মনে মনে বলল সিরাজ।

ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল সে। পাহাড় থেকে নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলল সে। পথে একটি বুড়ী ভিখারী তার কাছে হাত পেতে কিছু চাইল। সিরাজ তাকে সালাম জানিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে এলো। ভিখারীটি সম্ভবত গালাগালি দিল তার মাতৃভাষায়।

দুপুরে যখন বাসায় ফিরল তার শরীর বড় ক্লান্ত।

তহুরা আর লায়লা বারান্দায় বসে শালের নকশার কাজ করছিল। তাকে দেখেই উঠে পড়ল তহুরা।

বলল, 'কি হল? টাকার সন্ধান পাওয়া গেল?'

সিরাজ কিছুই বলল না। মাথা হেঁট করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো। তহুরাও পিছনে পিছনে এলো তার।

জামাকাপড় খুলে ফেলল সিরাজ। তোয়ালে দিয়ে হাত-পা মুছল। বলল, 'আমি গোসল করব আজ। ভাত খেতে দেবে তো? রুটি আমি খাব না।'

'ঠিক আছে, পানি গরম-করা আছে উনুনে ভাত রান্নাও হয়েছে। মাছের ঝোল আর কচি মুরগীর স্টু খাবে তুমি। আর কিছু ফল দুধ।'

'খুব ভাল, তুমি বাঙালী বাবুর বউ হবার উপযুক্ত।' বলে সিরাজ তহুরাকে ধরে একটু আদর করল।

তহুরা ম্লান একটু হাসল।

সিরাজ নিচে নেমে এসে স্নান আর আহারাদি করল। খোঁজ নিয়ে জানল ভেড়ার মাংস আর রুটি খাবে নাকি ওরা।

দোতলায় এসে শুয়ে পড়তে তহুরাও এলো একবার। বলল, 'যা গেছে যাক,

তার জন্যে আর দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমরা মা-মেয়েতে শালের নকশার কাজ করে কিছু উপায় করতে পারব। কিছু গম হবে, ফলও আছে কিছু। দরকার হলে ভেড়া-ছাগল বেচে দোব। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। ডাক্তাররা কি বললে, 'হঠাৎ ওরকম রক্ত বের হল কেন নাক দিয়ে?'

অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ায় আর হঠাৎ কোনোরকম মানসিক পরিবর্তনের জন্যে নাকি হয়েছে ওটা। কে জানে কেন হল।

তবে মূল কারণ অন্য। পরে বলল, যাও, 'তোমরা খেয়ে নাও।'

তহুরা নেমে গেল।

যখন তারা উপরের ঘরে কথা বলছিল বাড়ির পিছনের পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বালতির শব্দ করে গরম ঠাণ্ডা জলে স্নান করছিল লায়লা।

তহুরা যেতে সে চলে এলো। লায়লা দোতলার বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিতে এলো। পর্দা ঠেলে একবার উঁকি মেরে দেখে হেসে চলে গেল।

তহুরা স্নান করছিল ঘাটে। চারদিকে বাগান। খিড়কীর দিকে লোকজনের গুজার নেই। বাগানের ওপারে কবরস্থান।

জানালার ধারে দাঁড়াল সিরাজ।

তহুরার স্নান-করা দেখতে লাগল সে। অপূর্ব গঠনভঙ্গিমা। যে সমস্ত অংশ ঢাকা থাকে ওর সে জায়গা অত্যন্ত সাদা। ঘন কালো চুল সারা পিঠের ওপরে। পীনোন্নত বুক। কোমর পাছা পেট নিখুঁত সুডৌল।

সিরাজ আশ্চর্য হল, কুমারী মেয়ের মতো ওর অমন নিটোল যৌবন থাকবে কেন যখন মা হয়েছে। স্তনবৃন্তও ওর নেই—চক্রাকার রক্তাভ দুটো রেখা মাত্র।

বুকের যতখানি পরিসর সে তুলনায় স্তন দুটি ছোট চাপা এবং চ্যাপটা ধরনের। সম্ভবত তহুরা কখনো ব্রা পরে না।

একটু গলা খাঁকারি দিতেই তহুরা উপরে তাকিয়েই হঠাৎ গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে হেসে লজ্জায় পিছন ফিরল আর বালতিটা নিয়েই দৌড় মারলে ঘরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত ভাবল সিরাজ তহুরাই আমার লাখ টাকার সম্পদ। ওর রূপ সৌন্দর্য আমাকে মৃত্যু থেকে টেনে আনবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। একটু ঘুমিয়ে উঠে বিকালে সে আঁকতে বসবে।

কিন্তু যখন তার ঘুম ভাঙল, শুনতে পেল ছেলেমেয়েরা সুর করে পড়াশুনো করছে নিচের পাঠশালায়। সকালে আর বিকালে পাঠশালা বসান ওস্তাদজী ঐ

ঘরটাতে। আগে কলন্দর সাহেবের বাবা নাকি কাপড় বোনার তাঁত বসিয়েছিলেন ওখানে।

তখনো কিছু বেলা ছিল।

নিচে নেমে এসে দেখল তহুরা দেয়ালে হেলান দিকে নক্‌শার কাজ করতে করতে আলুথালুভাবে ঘুমোচ্ছে। লায়লা মাদ্রাসায় পড়তে গেছে বোধ হয়। আস্তে আস্তে কাছে এলো সিরাজ। নিদ্রাকাতর তহুরাকে সে দেখল কিছুক্ষণ। আবার দোতলায় গেল কাগজ আর স্কেচপেন এনে হাত তিনেক দূরে বসে তহুরার ছবি আঁকতে বসল।

অবিকল তাকে এঁকে তুলল।

ছবি আঁকা শেষ হতে আলতো হাতে সে ওর কপালে একটা টিপ এঁকে দিল। হঠাৎ জেগে গেল তহুরা।

লজ্জা পেয়ে মাথায় গায়ে কাপড় দিল। ছবিটা তাকে দেখাল সিরাজ।

তহুরা সলজ্জ চোখে তার ঘুমন্ত মূর্তিখানা দেখে বলল, 'শিল্পীর কাজ কি চুরি করে দেখা আর সেই অপ্রস্তুত মূর্তিটা এঁকে ফেলা?'

'যা স্বাভাবিক তার কদর সবাই করবে। নকল সৌন্দর্যের দাম নেই।'

শাসনের সুরে তহুরা বলল, 'ঘাটে গোসল করার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা হচ্ছিল কেন?'

'কেন তা তো জানি না, তবে মন বলল, দেখো—দেখে চরিতার্থ হও। পৃথিবীর রূপসৌন্দর্য আল্লা কেমন করে একটি মেয়ের শরীরে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে তাই তুমি দেখ।'

'উঃ। পৃথিবীর রূপসৌন্দর্য না হাতি!'

'আচ্ছা একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'না, থাক। চা খাওয়াও। আমি কাজ নিয়ে বসব আজ।'

'আচ্ছা, চলো ওপরে।'

তহুরা উঠে পড়ে শালটা তুলে রেখে উনুন ধরাতে গেল।

সিরাজ উপরে এসে আঁকা-জোকার কাজ নিয়ে বারান্দার কোনটাতে বসল। ইসমতের বাবার কাজে সে হাত দিল।

চা আনল তহুরা। সেখানে থেকে মাদ্রাসাটা দেখা যাচ্ছে।

'কি কথা, বলবে না?'

চায়ে চুমুক দিয়ে বলল সিরাজ, 'এখন না। কাজ করছি।'

নেমে গেল তহুরা।

মন দিয়ে দু'খানা লেটারিং শেষ করল যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর মাদ্রাসার ছুটি হয়ে গেল।

চট করে সে উঠে একটা বাক্স খুলে মাউথ অরগ্যান বার করে নিয়ে নিচে নেমে এলো। তারপর বারান্দায় বসে বাজাতে লাগল।

যত ছেলেমেয়ে ছুটে এলো তার কাছে। একটা পরিচিত হিন্দী গানের গৎ বাজাতে বাজাতে সে যখন অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল তহুরা লায়লা তো হেসেই খুন!

আজান হচ্ছে আর মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব এগিয়ে আসছেন দেখে সিরাজ ছেলেমেয়েদের মারবার ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল বেদী বাঁধান চেরিগাছটার নিচে। মৌলবী এসে সালাম জানালেন। বললেন, 'কলন্দর সাহেবের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করার জন্য কিছু ভাবছেন কি?'

'হ্যাঁ, ছ'দিনের দিন 'কাঁধি কোদালে' তো করে। খতম পড়াতে হয়। আপনি মৌলবীদের ডেকে খতম পড়াবার ব্যবস্থা করে রাখবেন।' তহুরাকে নাম ধরে ডাকল সিরাজ।

সে এলে মৌলবীর কথাটা বলল তাকে। তহুরার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সে কিছু না বলে চোখ মুছতে লাগল।

সিরাজ বলল, 'একটা ভেড়া কিংবা খাসী আর গোটা দুই মোরগ জবাই করা হবে। পোলাওয়ের জন্যে দেরাদুন চাল আনতে হবে।'

'যদি অনুমতি দেন চালটা আমি দেব।'

তহুরা মাথা নেড়ে নিষেধ করল। সে নিজেই এসব করবে বলল। 'আপনি শুধু জন দশেক মৌলাবীদের বলবেন।'

মৌলবী বললেন, 'আর ঐ পবিত্র দিনে আরো একটি অনুষ্ঠান আমরা গ্রামবাসীর তরফ থেকে চাই, সেটি হল আপনাদের সাদি মোবারক।'

সিরাজ যেন হঠাৎ চমকে উঠল কিন্তু তহুরা লজ্জা পেয়ে অধঃবদন হল। এ সম্বন্ধে গ্রামের লোকদের মধ্যে কি আলোচনা চলছে?

সিরাজ বলল, 'এখনি কি এটা না করলেই নয়?'

'হয়ে যাক না, আপনি যাকে যাকে বলা দরকার বলবেন। কলন্দর সাহেব এটা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।'

'ঠিক আছে। আমি আমার মামাকে আর পরিচিত কিছু লোককে বলব।'

মৌলবী সাহেব নামাজ পড়তে মসজিদে চলে গেলেন।

সিরাজ আর তহুরা চলে এলো। ওপরে তহুরাকে আনল হাত ধরে টানতে টানতে। তারপর তাকে জড়িয়ে চেপে ধরে শুধোলে, 'তুমি কি জন্যে এত তাড়াতাড়ি এসব ঘটাতে চাচ্ছ বলতে হবে?'

'বারে, আমি কিছু জানি না! এই ছাড়ো ছাড়ো, লক্ষ্মীটি। মেয়ে দেখে ফেলবে।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বারান্দায় পালিয়ে এলো তহুরা। লোকটা কি দুষ্টু রে, তার গালে কামড়ে দিয়েছে। দাঁত বসে গেছে বোধহয়! ঘরের মধ্যে গিয়ে আয়নাতে মুখটা দেখতে লাগল।

সিরাজ জামা-কাপড় পরতে পরতে বলল, 'কি হল?'

জিভ বার করে ভেংচি কাটল তহুরা। 'তুমি ভীষণ দুষ্টু!'

'কি হল দেখি! আহা আহা! তবে আর এক গালে করে দিই।'

'উঃ। বাবারে বাবা!'

'কী সুন্দর তুমি। কী মিষ্টি মধুর! এই, আসছি আমি—ঘণ্টা তিনেক পরে আসব। শ্রীনগরে যাচ্ছি। গোটা পাঁচেক টাকা হবে? বিয়ের কার্ড কিনব।'

নিচে নেমে এসে ঘরে ঢুকল তহুরা।

লায়লা তখন উনুন ধরাচ্ছিল।

টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলো সিরাজ। বাসে উঠে শ্রীনগর এলো। বিয়ের কার্ড কিনল পঞ্চাশটা। তারপর রউফের কাছে গেল। রউফ খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি খাবার আনল। বলল, 'কাল সকালে আমি আপনার কাছে যেতাম। চার পাঁচটি কমার্সিয়াল কাজ যোগাড় করেছি। আমাকেই করতে দিয়েছিল, আমি তাদের আপনার কথা বলেছি। বড় বড় কোম্পানী। বিজ্ঞাপনের ক্যাপসান। তেল, সাবান, সেণ্ট আর সিগারেট কোম্পানীর কাজ।'

'ঠিক আছে। এই কার্ডটা তোমাকে দিলাম। ছাপার খরচ নেই, হাতে লিখে দিলাম।'

'আরে বাপ! ম্যারেজ সেরিমনি। আপনার বিয়ে। কলন্দর সাহেবের কন্যা বিবি তহুরার সঙ্গে! ইস! অনেকেই ঈর্ষান্বিত হবে। এই সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে অন্তত ডুশো লোকের প্রস্তাব এসেছিল। তার মধ্যে অনেকেই

ধনাঢ্য গালিচা ব্যবসায়ী, বাগিচা মালিকও আছেন, এমন কি বড় মসজিদের ইমাম পর্যন্ত। কিন্তু আপনার সেই টাকাগুলোর কোনো খোঁজ পেলেন ?'

মাথা নাড়ল সিরাজ।

মামার কাছে এলো সে। বলল, 'এই কার্ডটা রাখুন আপনি।'

আলী হোসেন কার্ডটা হাতে নিয়ে পড়ে দেখলেন।

সিরাজের হাতের লেখাটা বড় সুন্দর। মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার মামীর সঙ্গে একবার দেখা করে এসো। এখনি যাও।'

সিরাজ মামীর কাছে এলে মামী মাহমুদা বলল, 'তোমার শরীর এখন ভাল তো সিরাজ ?'

'হ্যাঁ মামী।'

'আচ্ছা সিরাজ, কলন্দর বুড়োর বাড়িতে তুমি থাকবে কেন ? আমাদের বাড়ি, আমার বাপের বাড়ি তোমার অপছন্দ হল কেন ? আমরা কি তোমাকে আহারাদি দিয়ে সাহায্য করতে পারি না ? ওখানে পাড়া গাঁয়ের মধ্যে কি পেয়েছ তুমি ?'

'পেয়েছি মামী—একটি হীরকের খনি—কালো কয়লার মধ্যে ডুবে আছে !'

হাসল মাহমুদা। বলল, ঐ মেয়েটাকে পাবার জন্যে বছর চোদ্দ ধরে কত কীর্তি যে ঘটে গেছে তুমি যদি তা জানতে। আবার তুমিও শিকার হবে দেখছি।'

'ওকে আমি বিয়ে করছি।'

'তাই নাকি !' ভয় পেয়ে যেন চোখ বড় বড় করল মাহমুদা। বলল, 'জানো, ঐ মেয়েটাকে তোমার মামা পর্যন্ত বিয়ে করার চেষ্টা করেছিল আর তুমি সেই আসনে দাঁড়িয়ে কৃতকার্য হতে চলেছ বলে তোমার রোগের সময় বাক্স প্যাঁট্‌রাগুলো এনে টাকা বার করে নিয়েছে তোমাকে জব্দ করার জন্যে।'

হাসল সিরাজ। বলল, 'তুমি তো আছ মামী। কাল সকালে একবার এসো কলন্দরের বাড়িতে। তুমি আমার পক্ষের একমাত্র গার্জেন—মায়ের মতো।'

'হ্যাঁ যাব, নিশ্চয় যাব। তুমি যা চাও তাই হবে। তোমার মামা যখন এসে বলল তোমার টাকা চুরি করে রাখার কথা। আমার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হয়ে গেছে।'

'দুজনেই মদ খেয়েছিলে ?'

হেসে খুন হল মাহমুদা। বলল, 'ঝগড়া-বচসা হচ্ছিল আর মদ খাচ্ছিলাম দুজনেই। এক সময় ও বলল যে তোমার দিকে নাকি আমার টান আছে—সেই

জন্যে বাপের ঘরে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক রাত্রে। দিলাম ওর পাঁজরে এক ঘুষি। ও আমাকেও মারল। আমি ওকে বালিশের বাড়ী মারতে মারতে শেষে লেপ চাপা দিয়ে তার ওপরে চেপে বসে রইলুম। দাসীটা এসে ছাড়িয়ে দিয়ে দুজনকে দুঘরে চাবি দিল।

হাসতে লাগল মাহমুদা।

বলল, 'টাকাগুলো তুমি এখন নিয়ে যাবে।'

'হাজার খানেক দিলে ভাল হয়। কলন্দর সাহেবের মানে ভাবী শ্বশুরের কাঁধি কোদালে আর বিয়ের খরচ আছে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে নিজের থেকে এক হাজার টাকা দিচ্ছি।' টাকাটা কিভাবে তোমার মামা তোমাকে ফেরত দেয় দেখ না। আটকে রেখেও মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে। বিয়ে করার পর বউ নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসবে। তিনটে সম্পত্তির এখন মালিক তুমি—তোমার মামার, মামার শ্বশুরের আর তোমার নিজের শ্বশুরের।'

খুশী হয়ে মাথা হেঁট করল সিরাজ।

সিরাজ ফল আর ডিমের তৈরী একটা কেক খেলো। মামীর হাত থেকে টাকা নিয়ে সেদিনের মতো চলে এলো।

ফিরে এসে দেখল মোমের আলোয় বসে তহুরা আর লায়লা দুজনেই কোর-আন শরীফ পড়ছে।

তহুরা উঠে আসতে তাকে বলল সিরাজ, 'টাকার হদিস মিলেছে তহুরা, মামা সরিয়ে রেখেছিল, মামী বলল। মামী কাল সকালে আসবে।'

তহুরা খুশী হয়ে আস্তে সিরাজের বুকে মাথা রাখল।

॥ ২১ ॥

দিনের দিন এসে হাজির হল।

মৌলবী সাহেব, তহুরা আর পাড়ার প্রতিবেশী আত্মীয়-কুটুম্ব মিলে সমস্ত আয়োজনই শেষ করেছেন।

তহুরার না হলেও সিরাজের প্রথম বিয়ে তাই নানী আর ভাবী সম্পর্কের পাড়ার মেয়েরা সিরাজকে হলুদ তেল মাখাতে বসল সকালে। সারারাত তারা

গান করেছে মেয়েলী সাপ খেলানো সুরে আর আলু পেঁয়াজ ছাড়িয়েছে, পান সুপারি, মসলা মাংস কুচানো ইত্যাদির কাজ করেছে।

সকালে দশজন মৌলবী মৌলানা এসে গেলেন। তাঁরা মাদ্রাসা-ঘরে বসে কোরআন শরীফ পড়তে লেগে গেলেন।

তিরিশ সেপারা কোরআন সম্পূর্ণ পড়া দরকার। মৌলবী একা পড়েছেন পাঁচ সেপারা, তহুরা আর লায়লা পড়েছে পাঁচ পাঁচ দশ সেপারা। পনেরো সেপারা থেকে পড়া শুরু হল।

ভিজোনো ছোলা কিলো পাঁচেক এনে মাদুরীর ওপর ঢেলে দিতে মাদ্রাসার বড় বড় ছেলেগুলো ছোলা পড়ার কাজে লেগে গেল। প্রত্যেক ছোলাটাকে ধরে ধরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' বলে পড়তে হবে—এবং মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ কলেমাটা বলতে হবে—মোহম্মদ রসুলাল্লা। একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়তে হবে। কারণ এক লক্ষ চব্বিশ হাজারজন নবী এসেছেন পৃথিবীতে। তাঁদের সম্মানে, এই কলেমা আবৃত্তি। সংখ্যা মনে রাখার জন্য ভিজোনো ছোলাকে গ্রহণ করা হয়।

ঘণ্টা তিনেক পড়ার পর কে কত পড়েছে যোগাযোগ করে দেখা হয়। সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যাবার সময়েই তিরিশ সেপারা কোরআন শরীফ পড়া সাঙ্গ হয়ে যায়।

বেলা দশটা পর্যন্ত পড়া খতম, ছোলা গণনা শেষ হয়ে গেল। সমস্ত পুরুষরা কলন্দর সাহেবের কবর জিয়ারত করে আসেন। গোটা কবরস্থানেই গোলাপ জল ছিটিয়ে দিয়ে আসা হয়।

সিরাজের আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সবাই প্রায় এসে পড়েন।

বারান্দায় তাঁদের গালিচা পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে দেওয়া হয়।

সিরাজের মামী মাহমুদা আগের দিন চলে এসেছে। তহুরাকে সে তিন ভরি সোনার হার আর দুভরি সোনার কাঁকন পরিয়ে দিয়েছে।

মামা আলী হোসেন আনলেন খাট-পালঙ্ক, হাঁড়িভর্তি মিষ্টি, গান বাজনার মাইক, ফুলে সাজানো মোটর, একটা তোরঙ্গ ভরা প্রসাধানী জিনিস, শাড়ি-কাপড়-চোপড় আর দরকারী জিনিসপত্র।

মাহমুদার বাবা উকিল জামসেদ আনোয়ার আনলেন তিন হাজার টাকার একটা লোহার আলমারি। একশো টাকা করে দামের চারখানা বই। তাতে আছে পৃথিবীর বহু শিল্পীদের ছবি এবং জীবনী। আর আঁকাজোকার নানান দামী দামী জিনিস।

রউফ, রমজান, আখতার, অজিত, শরিফ, রিক্তা, আকলিমা, ছন্দা, রেহানা, জয়ন্ত, ছন্দন এরা সবাই এলো এক একজন এক একটা জিনিস হাতে নিয়ে।

ইসমৎ পালকিওয়ালা এনেছে একটা দারুণ সুন্দর জাপানী রেডিও। চাষী বুড়ো গোলাম নবী আর তার কলেজের পড়া ছেলেটি এলো। বুড়ো একখানা স্টীলের থালা একটা গ্লাস আর একহাঁড়ি মিঠাই এনেছে।

রিজিয়া তার ভাই কাশেম আলী, বাবা আজিজ ওসমান এসে হাজির হতে অনেকেই যারা প্রতিবেশী গালিচা শিল্পী অখুশী হল। তছুরাকে তারা অনুযোগ করল, ওদের কে বলল জানো, ঐ আজিম বুড়োর টাকা খেয়ে পুলিশে কলন্দর চাচাকে গুলি করে মেরেছে।'

দামী মোটর চড়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আয়াতউল্লাহ বসির এলেন। আলী হোসেন আর আজিম ওসমান ছুটে গিয়ে করমর্দন করে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলেন।

আলী হোসেন নাকি এই দুজন শিল্প ব্যবসায়ীকে নিজের ভাগ্নে বা উত্তরাধিকারীর বিয়েতে না বলে পারেন নি। এঁদের কারখানার মাল নিয়ে তিনি ব্যবসা করেন।

প্রচুর ফুল এসে গেল চারিদিক থেকে।

নাস্তাপানি দেওয়া হল অতিথিদের।

সিরাজের গালে ক্ষীর দেওয়া চলছিল। সব অতিথিই টাকা দিয়ে ক্ষীর গালে দিয়ে এলেন। দুই ব্যবসায়ী একশো করে দুশো টাকা দিলেন।

এরপর বর সাজানোর পালা। মাইকে গান বাজনা হচ্ছিল। কনের গায়ে তখনো হলুদমাখা কাপড়। তাকে হলুদ মাখাতে ছাড়েনি বুড়ী দিদিমা বা বৌদিরা। বড় বড় দেগ হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে বাড়ির পুব পাশে।

বর সাজানোর পর আলী হোসেন মোটরে তুললেন সিরাজকে। শহর থেকে ঘুরিয়ে আনতে পাঠালেন। সঙ্গে গেল ইসমৎ, রউফ, আখতার, আর রেহানা।

তারা যখন ফিরল সবাই দেখল তাদের গাড়িতে আর একজন তরুণ. কাঁধে তার অ্যাকর্ডিয়ন, শান্তিনাথ দেউশকর।

দুটি শিল্প পত্রিকার তরফ থেকে ফটোগ্রাফার এসেছিলেন। তাঁরা ছবি তুলতে লাগলেন বর বসার পর।

মাদ্রাসার মৌলবী গোপনে সবাইকে ইংগিত করলেন দুই শিল্প ব্যবসায়ীকে বেশি তোয়াজ তোবামোদ না করতে—সিরাজের মামা আলী হোসেন সাহেবের

উচিত হয়নি ওঁদের "দাওয়াত" (নিমন্ত্রণ) করা। তাই তাঁরা তিনজনে প্রায় কোণঠাসা হয়ে বসেছিলেন। মুসলিম বিয়ে বাড়িতেও শিল্পপতি দুজন স্যুট পরে এসেছেন আর পায়ের উপরে পা তুলে বসে পাইপ টানছেন।

আয়াতউল্লাহ্ সাহেব বুঝলেন, তাঁদের কেউ তেমন পছন্দ করছে না।

ইসমৎ রেকর্ড বাজানো বন্ধ করে দিতে বলে মাইকের সামনে দাঁড করালো শান্তিনাথ দেউশকরকে।

শান্তিনাথ বাজাতে শুরু করল। ইসমৎ আর অজিত গান গাইতে লাগল। মানুষ-জনের ভিড়ে চারদিকে ভরে গেল।

ইসমৎ আর রেহানা নাচ দেখাল।

উচ্ছ্বাস আনন্দের মধ্যে কে যেন বলে উঠল বরও ভাল গান গাইতে জানে। তাকেও গাইতে দেওয়া হোক।

সিরাজ প্রথমে প্রত্যাখ্যান করল।

কিন্তু আয়াতউল্লাহ সাহেবও যখন কৌতুক অনুভব করে গাইতে অনুরোধ করলেন। সিরাজ ভেতরে ভেতরে আবেগে উদ্বেগে ঘেমে উঠলেও গাইতে শুরু করল। হারমোনিয়াম এনে দিতে হল তাকে পাড়া থেকে।

মিষ্টিমধুর শান্ত ভরাট গলায় সে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে লাগল। তারপর গাইল ফিল্মের পরিচিত গান। সবাই বাহ্‌বা দিল।

দুপুরের খানাপিনা শুরু হল।

পুরুষদের আহারাদি শেষ হতে হতে দেডটা বেজে গেল।

ইসমৎ, রেহানা, ছন্দা, রিক্তা, আকলিমা ··আধুনিকারাও মেয়েদের মহলে যোগ দিল। কনেকে স্নান করানোর আগে প্রসাধনী পোশাক ইত্যাদি পাঠালেন আলী হোসেন। স্নানের পর মাহমুদা তহুরাকে প্রথমে সাধারণ পোশাক পরালেন। তারপর মেয়েদের আহারাদির জন্যে বসানো হল পর্দা ঘেরা পুব বারান্দার মধ্যে।

তাদের খানাপিনা শেষ হলে তহুরাকে ঘরের ভিতরে এনে মাহমুদা, রেহানা, আকলিমা সাজাতে শুরু করল।

মেয়েরা যারা হলদি মাখিয়েছিল সবাই একবাক্যে সন্দেহ করেছে তহুরা নাকি আদৌ মা হয়নি। তহুরা কেবলই লজ্জায় মাথা গুঁজে হেসেছে কিছু বলে নি। লায়লা কিছু মনে করল না। প্রায়ই তো সে শোনে এরকম কথা। তবু তার মনের ভেতরে কেমন করতে লাগল। এতবড় এই আনন্দ যজ্ঞে তার যেন কোথাও এতটুকু ঠাঁই নেই। সে পর হয়ে গেছে। পর্দার আড়াল থেকে সে নির্নিমেষ

চোখে বরকে দেখেছে। তারপর বাড়ি ছেড়ে খিড়কীর দিকে গিয়ে গাছের আড়ালে খুব কেঁদেছে। পাড়ার একটি মেয়ে তাকে কাঁদতে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'কাঁদিস কেন লা?'

লায়লা চট্ করে চোখ মুছে ফেললেও সারামুখের রক্তিমাভা লুকোতে পারে নি। সে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে, 'কেন আমি জানি না, আমার বুকের ভেতরটা যেন ফেটে যাচ্ছে!'

'কাল থেকে তুই কিছু খাস্ নি?'

মাথা নাড়ল লায়লা। সে ভেড়া ছাগল দেখতে মাঠে চলে গেল।

পড়শী মেয়েটি ফিরে গিয়ে লায়লার কথা তার মা বা অন্য কাউকে বলে নি, বলবে কি তখন যে মহিলা মহলে সেই গোপন ষড়যন্ত্রটি ফাঁস করে ফেলার আয়োজন চলেছে।

ইসমৎ হঠাৎ নিরাবরণ করে ফেলল তহুরাকে, দেখি দেখি ভাবী, আরে আরে কি আশ্চর্য এ যে নিখুঁত কুমারী দেহের মতো—উহু আদৌ সন্তানাদি হয়নি তোমার বউ দিদিমণি।'

তহুরা রেগে গেল। বসে পড়ল লজ্জায়। সে একেবারে মরে গেছে!

মাহমুদা তাড়া দিল কৃত্রিমভাবে। তারপর পোশাক পরিয়ে দিল। কাঁদতে লাগল তহুরা।

তার, চোখ মুছিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগল সবাই। তহুরাকে অপূর্ব দেখাতে লাগল।

বিয়ে পড়ানো শুরু হল। গয়নাগাঁটি বাদে পাঁচ হাজার টাকার দেন-মোহরে গাওয়া এবং উকিলদের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিল তহুরা। বারবার তিনবার সম্মতি পাবার পর সাক্ষী উকিলরা এসে মৌলানাকে জানালেন। তারপর কলেমা ইত্যাদি পড়াবার পর প্রার্থনা শেষ হল। বিয়ের কাজ সাঙ্গ হয়ে গেল।

একটি কাবীননামাও লেখা হল। বর-কনের স্বাক্ষর নেবার পর সকলে সাক্ষী স্বরূপ সইও করলেন।

বর কনেকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হল। তাঁদের মোটরে তোলা হল।

ঠিক সে সময় হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। পাগলা বেশধারী গ্রিজিয়ার শ্বশুর সহসা পিছন থেকে লাফ দিয়ে আজির ওসমান সাহেবকে জড়িয়ে

ধরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর বুকে চড়ে মুখে কীল ঘুষি মারতে লাগল। কালের আলী তাদের টেনে তুলল।

'এই শালা, এই শালা, বদমাশ। শালাকে সাবাড় করে দাও।' চেঁচাতে লাগল হরমুজ বুড়ো।

সিরাজ নেমে পড়ে তাকে সরিয়ে নিল। আজিম ওসমান পিস্তল বার করে পাগলটার দিকে হাত বাড়াতেই বাধা দিলে। করজোড়ে নিষেধ করলে।

কিন্তু তখন তারা বহু লোকের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে। কাশেম আলী আহত বাবার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল।

জোর চেঁচামেচি তখন।

'কলন্দরের মৃত্যুর কারণ ঐ শালা বুড়ো আজিম ওসমান। ঐ পাগল বুড়োর ছেলেকে জামাই করার পর চাবুক না মারলে সে কি আত্মহত্যা করত?'

'তারপর যে রাত্রে কলন্দর হাসপাতালে ছিল সেই রাত্রে দুজন গুণ্ডা লেলিয়ে সুন্দরী তহুরাকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্র করেছিল এই শালা!' বলল হরমুজ বুড়ো।

'ক্ষমা চাইতে হবে।'

সকলেই সমস্বরে বলতে লাগল: 'ক্ষমা চাইতে হবে। পুলিসকে টাকা খাইয়ে সাধারণ মানুষদের ওপর নির্যাতন করা চলবে না। নইলে কলন্দরের প্রাণের বদলা আমরা নেবই।'

লাঠি বল্লম শড়কি তলোয়ার এসে হাজির হয়েছিল। থরথর করে কাঁপছিলেন আজিম ওসমান।

ঠিক সন্ধ্যার সময় তখন।

ধরে থাকা পাগলটা তখনো আক্রোশে মাঝে মাঝে লাফঝাঁপ দিয়ে ছাড়িয়ে এসে আজিম ওসমানের ওপরে পড়বার চেষ্টা করছিল।

মোটর দুটোর ক্ষতি করে দেবার ভয়ে হঠাৎ শিল্পপতি আয়াতউল্লাহ বসির করজোড়ে বলতে লাগলেন, 'আপনারা শান্ত হোন। আমরা ক্ষমা চাইছি। কলন্দর সাহেবের মৃত্যুর জন্য আমরা দুঃখিত। তাঁর নামে শহীদ মিনার করে দেওয়া হবে। দশ হাজার টাকা তাঁর মৃত্যুর জন্য আমরা দান করব। কাশ্মীরের গালিচা শিল্পে অনেক দান আছে কলন্দর সাহেবের। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আর আমি শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে আজ এখানে কথা দিলাম গালিচা শিল্পীদের সাত দফা দাবি দাবা মেনে নিলাম।'

'নারায়ে তকবীর আল্লাহ আকবর' বলে সমস্ত মানুষ ধ্বনি দিয়ে উঠল।

করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে আজিম ওসমানও মাথা নিচু করে বড় অংশীদার আর শিল্পপতিদের সভাপতি আয়াতউল্লাহ সাহেবের কথায় সম্মতি দিলেন। তখন সবাই তাঁর শরীর থেকে ধুলোবালা ঝেড়ে দিতে লাগল। বরের গলা থেকে একটা মালা খুলে নিয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিল।

আজিম ওসমান সেই মালাটা খুলে নিয়ে পাগলটার গলায় পরিয়ে দিলেন। মালা পরাবার অর্থ কি বুঝতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল পাগল বুড়ো। তারপর সে মালাটা খুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মানুষজনের মাথার ওপরে ছড়িয়ে দিল। তারপর গোঁ ভরে চলে গেল অন্যদিকে।

শিল্পপতি দুজনে মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আবার বাজনা বাজতে লাগল।

তহুরা সিরাজের কানে কানে বলল, 'লায়লা কই, তাকে ডাকা উচিত।'

সিরাজ লায়লাকে আনতে বলল কিন্তু তাকে তখন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সংবাদটা সিরাজ আর তহুরাকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করে দিল।

বর্ণাঢ্য শ্রীনগর শহরে বর-কনের গাড়ি চলল। কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে গাড়ি থেকে নেমে জলের কাছাকাছি গিয়ে একটা পাথরের ওপরে বসল দুজনে।

ঝিলমের জলে চাঁদ ঝিলিমিলি।

সিরাজ হাতখানা ধরল তহুরার। ডাকল, 'তহুরা!'

'বলো!' সাড়া দিল তহুরা।

'কেমন লাগছে এখন তোমার?

'ভাল।'

'কোনো দুঃখ-বেদনার কথা মনে পড়ছে না?'

'না।'

'পিতৃমাতৃ কুলে তোমরাও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই।'

তহুরা শুধু অবাক চোখে ঝিলমিল জলের দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুটে বলল, 'ঐ রকম করছে আমার বুকের ভেতরটায়।'

'আমারও।' বলল সিরাজ জলে-খেলা-করা আলোটার দিকে তাকিয়ে।

পিছনের দিকে একবার তাকাল সিরাজ। দূরে আলো-অন্ধকারে তাদের মোটর দাঁড়িয়ে আছে।

তহুরাকে কোলের ওপরে টেনে নিয়ে চুম্বন করতে লাগল সিরাজ। তহুরাও আদায় করে নিল। তারপর সচেতন হল, বলল, 'চলো, এখানে নয়, ঠাণ্ডা লাগছে, বাড়ি যাই চলো।'

'আর একটু থাকি এসো-না।'

'না গো শিল্পী, একটু বাস্তববোধ জাগ্রত করো। সুন্দরী রমণী আর সোনা-দানা বড় লোভের বস্তু।'

'তাই তো! চলো তবে।' আর একবার চুম্বন-ক্রিয়া সমাধা করার পর তারা চলে এলো। তারা গাড়িতে উঠলে ড্রাইভার সিগারেট ফেলে দিয়ে গাড়ি ছোটাল।

বাড়িতে পৌঁছে দেখল মামা আলী হোসেন আর মামী মাহমুদা বাইরের বারান্দায় বসে গল্প করছেন।

মাহমুদা তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল। এবার বন্ধু-বান্ধব আর অতিথিরা তাঁদের দেয় জিনিসগুলি দিতে এলেন। যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা যে যার জিনিস দিয়ে গেছেন মৌলবী সাহেবের কাছে।

তহুরা সব কিছু হাত পেতে নিয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিল।

তাঁদের বিদায় হতে আরো ঘণ্টাখানেক লাগল।

আলী হোসেন আর মাহমুদা বিদায় নিতে এলেন।

আলী হোসেন বললেন, 'আমাদের তো যেতেই হবে বাবা, চাকর-বাকরদের ভরসায় বাইরে রাত কাটানো যায় না। শোনো বাপ সিরাজ, তোমার দশ হাজার টাকাটা আমার জিম্মায় আছে, যে কোনো সময় নিতে পারো। আগে নিলে হয়তো সব খরচ করেই ফেলতে।'

তহুরা বলল, 'আপনি ঐ টাকাগুলো ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেবেন।'

আলী হোসেন সম্মত হয়ে আর একটি কথায় নিজের বাহাদুরী জাহির করতে চাইলেন। বললেন, 'আমি দুই শিল্পপতিকে বিয়ে বাড়িতে এনে ওস্তাদের মতো কাজ করেছি কি না?'

হরমুজ খুব খুশী হয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

সিরাজ বা তহুরা কোনো মন্তব্য করল না।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হরমুজ যখন দুজনের আহারাদি আনল, তহুরা লায়লার খোঁজ করল। হরমুজ কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না লায়লাকে।

সিরাজ আর তহুরা টর্চ নিয়ে বাগান-ঘর, খিড়কীর দিক, রান্নাশালা নিচের

ঘরগুলো—সমস্ত জায়গা দেখল, কোথাও নেই লায়লা। স্টুডিয়োটার মধ্যেও নেই। তার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তহুরার খুব দুশ্চিন্তা হল। তার আগেকার বাড়িওলী বুড়ীটার সঙ্গে চলে যায়নি তো! বুড়ীকে সবাই জিজ্ঞেস করেছিল, লায়লা তহুরার সত্যিকার গর্ভজাত সন্তান কিনা। বুড়ী বলেছে, 'তাই তো ওরা বলেছিল, তবে লায়লা আমার বাড়িতে হয়নি। ওকে চার-পাঁচদিন পরে হাসপাতাল থেকে এনেছিল।'

তহুরার সন্দেহ হল গোয়ালঘরটার মধ্যে নেই তো লায়লা। একটা সাদা ভেড়ি ওর খুব ন্যাওটা। পিছনে পিছনে সব সময় ঘুরঘুর করে।

টর্চের আলো ফেলতে হঠাৎ দেখল গোয়ালঘরের এক কোণে ভেড়ার সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে লায়লা।

সিরাজও সে দৃশ্য দেখল।

তহুরা তাকে ডেকে তুলতে সে প্রথমে ভয় পেল। সিরাজকে দেখে লজ্জিত হল।—'চলে আয়, এখানে কেন? মেয়ের অবস্থা দেখ না! সারাদিন খাসনিও বোধ হয়? তোকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা।' বলল তহুরা।

ঘরের মধ্যে এনে গায়ে একটা শাল মুড়ি দিয়ে দিল তার। খাবার এনে দিতে চুপচাপ কাঁদতে লাগল লায়লা। তাকে ধমকাল তহুরা: 'সুখ তোমার কপালে নেই। তোমাকে আনার পর থেকে আমার কপাল ভাঙল। খেয়ে নাও—বিরক্ত করো না।'

'আমি খাবখন। তুমি যাও। তুমি যাও।'

"কেন, তোর হয়েছেটা কি?'

'আমাকে' আনার পর থেকে 'মানে কি?'

'সে তোমার এখন জানার দরকার নেই। যখন তোমার বিয়ে হবে, বিয়ে পড়ানোর সময় সব কিছু জানানো হবে।'

'আমি তোমার পেটে জন্মেছি কিনা শুধু তাই জানাও।'

'না, জন্মাওনি কিন্তু আমি তোমার মা। জন্মের দু'দিন পর থেকে মানুষ করেছি। যদি আমার বাধ্য না হও তো আর কোনো কিছু বলব না।'

অকস্মাৎ লায়লা উঠল। মুখ হাত ধুয়ে এসে খেতে বসল। তার যেন একটা ঘোর কেটে গেল। ভাবতে লাগল, তাইত তার মা বিয়ে করতে পারল। তাইত তার ভাললাগার লোকটিকে অমন নির্দয়ভাবে ছিনিয়ে নিল। তাকে যদি পথ থেকে কুড়িয়েই আনে তবে পথেই সে আবার ভেসে যাবে।

'খেয়েদেয়ে ঘর এঁটে শুয়ে পড়ো। কোথাও এক-পা যাবে না।'

তহুরা ফুলের মতো নরম কিন্তু যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন বড় নির্মম লাগে তাকে।

সিরাজ দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রায় সব কথাই শুনেছিল। আস্তে আস্তে এবার সে উপরে উঠে এলো।

মনটা কেমন অবসাদে অথচ আনন্দে ভরে উঠল।

তহুরা কিছুক্ষণ পরে এসে দোর বন্ধ করে দেবার পর দোরে কপাল ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে সিরাজ উঠে এলো। তার হাত ধরে ফুল-ভরা বিছানায় আনল। দেখল, তহুরা কাঁদছে নীরবে।

চোখ মুছিয়ে দিল সিরাজ।

বলল, 'সব দুঃখের কথা ভুলে যাও, আজ আমাদের আনন্দের দিন।'

তহুরা সিরাজের বুকে মাথা গুঁজে আবার কাঁদতে লাগল। আজ তার বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ছে। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর তহুরা শান্ত হল।

ফুলের গন্ধে সারা ঘর মাৎ হয়ে আছে। হালকা সবুজ কাঁচের দীপাধার জ্বলছে।

তহুরার শায়িত শরীরের পাশে বসে সিরাজ ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ আকাশের শব্দ শোনা গেল। সারাদিনটা বেশ গরম গেছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে।

পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলে দিল সিরাজ। দেখল আকাশে মেঘ ঢেকে গেছে।

তহুরার কাছে এসে তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করল। বলল, 'আমার ভাগ্যটা নেহাত খারাপ নয়, কি বলো তহুরা। যে সুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, জানতাম তার একটি চোদ্দ বছরের মেয়ে আছে কিন্তু এখন দেখছি আদৌ তা সত্য নয়। তাই তোমার দেহ-সৌষ্ঠব এমন নিটোল আর সুন্দর। দেখি দেখি....'

'এই না, ভীষণ লজ্জা করে! আলোটা নিভিয়ে দাও!'

'বেশ।' উঠে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল সিরাজ। কিন্তু মিলনের মুহূর্তে টর্চ জ্বালল সে আর তহুরার দেহের রং আর লাবণ্য দেখে সে যেন হতবিহ্বল হয়ে গেল।

খুশীতে পাগলের মতো সে তহুরাকে আদর করতে লাগল।

তহুরাও মুগ্ধ। আদর আলিঙ্গনে বলল, 'তুমি আমার সোনা। আমার সাত রাজার ধন।'

আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে।

এক সময় সিরাজ জানতে চাইল লায়লাকে কেমন করে কোথায় পেলে তহুরা।

তহুরা দেখল ভোর হয়ে আসছে।

বৃষ্টির ধারা তখন প্রায় শান্ত হয়ে গেছে।

তহুরা বলতে আরম্ভ করল লায়লাকে পাওয়ার কাহিনী।

লায়লা খেয়ে নিয়ে দোর এঁটে আলো নিভিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছিল : সে এখন সম্পূর্ণ একা। হঠাৎ এমন কেন হল?

তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তাকে আনার পর থেকেই নাকি দুর্ভাগ্য ঘটছে, তার মা বলল। মা না হাতি। পেটে ধরেনি তাহলে ঐ সুন্দরী তহুরা বিবিটি। তাই ওর ওতো রূপ। চেক্‌নাই বাহার। কক্ষনো তো সে মাই খাওয়ায়নি।

কোত্থেকে সে এলো? কে তাকে আনল? হাবিলদার আব্দুল হামিদ কি তাহলে অর আসল বাপ নয়? কে তার আসল বাপ? কাকে শুধালে সে সঠিক উত্তর পাবে। মা তো বলল, তোর বিয়ের সময় জানতে পারবি। বিয়ের সময় কেন? ও, বুঝতে পেরেছে লায়লা। বিয়ে পডানোর সময় অমুকের কন্যা অমুক বলবে।

মা যদি এখন না বলে তবে যে বাডিওলী বুড়ীর কাছে তারা থাকত সে বলতেও পারে। তার কাছেই যাবে লায়লা।

কিন্তু তার দুর্ভাগ্য ঘটানোর মূল ব্যক্তিটাই তো হল সিরাজ। ঐ বাঙালী বাবুর প্রথমে চোখ পডেছিল তার ওপরেই। কিন্তু সে তা বুঝতে দিতে চায় নি। তারপর চোখ পড়ল তার মায়ের দিকে।

মা না ঘোড়ার ডিম! সেই যদি বিয়েই করল তবে এত বছর দেরি করল কেন? কেন কাউকে তার মনে ধরেনি! রাগী কলন্দর বুড়োর অভাব থাকলেও নাম ছিল—যাকে তাকে বিয়ে করলে তার মান যাবে একথাও বোধহয় ভাবত। অনেক সময় মা চুপচাপ থাকত। কখনো বা একা একাই কাঁদত। রান্না করার সময় অনেকবার তাকে নীরবে কাঁদতে দেখেছে সে। মুখখানা লাল হয়ে যেত। কেন কাঁদছ মা, শুধোলে তাকে হঠাৎ বুকে চেপে ধরে আরো কাঁদতে থাকত।

পরে লায়লা জানতে পারত কোনো একজন লোক তার মাকে নিকে করতে চেয়েছে। অথবা বাজে কথা বলে মনে আঘাত দিয়েছে।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে একসময় কখন যে কম্বলের গরম তাকে ঘুম

পাড়িয়ে দিয়েছিল সে বুঝতে পারে নি। যখন ঘুম ভাঙল তার, বাইরে যাবার দরকার হল। যদিও তাকে দোর খুলতে নিষেধ করেছিল তবু সে উঠল। চোরের মতো সন্তর্পণে সে এগোল। প্রায় নিঃশব্দে সে দোর খুলে বাইরে এসে দেখল চারদিকে জমাট কুয়াশা নেমেছে। বোধহয় ভোর হয়ে এসেছে। গাছপালাগুলো সব সাদা। যখন তুষার পড়ে এমনিই অবস্থা হয়।

ওরা কি করছে এখন? এখন অবশ্য ঘুমোবে না, লোকে তো বলে, নতুন বর-কনেরা সারারাত জেগে থাকে, গল্প করে, যদি ঘুমোয় তো এই ভোর রাতেই সে রওনা দেবে বাড়িওলী বুড়ীর কাছে।

কৌতূহল সে দমন করতে পারল না। থালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠল। দেয়ালের গা বেয়ে বেয়ে সেই সাজানো ঘরটার জানালার পাশে গেল যেখানে ওরা মধুরাত যাপন করছে।

শুনতে পেল সে, তার মা তহুরা বিবি বলছে: 'আবদুল হামিদ আমার বাবাকে সহ্য করতে পারত না। পিস্তল দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিল। আর বউ হিসাবে সে তার বাপমার ডেরায় আমাকে নিয়ে গেল না কেন না আমার প্রেমে পড়ার জন্যে মার খেয়ে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। বিয়ের তিনদিন পরে সে আমাকে আমার বাপের ঘর থেকে নিয়ে চলে গেল। বাপ আদৌ কথা বলত না, তবে এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আবদুল হামিদ আমাকে নিয়ে প্রথমে গেল জম্মুতে। সেখান থেকে নিয়ে গেল দিল্লীতে। দিন পনেরো পরে আবার ফিরিয়ে এনে বাপের বাড়ি রেখে চলে গেল। মাস তিনেক পরে ফিরে এলো। কথায় কথায় তর্ক বেধে গেল বাবার সঙ্গে ওর। তারপর নিয়ে গেল সেই বাড়িওলীর বাড়িতে। সে নাকি ওর চাচাতো খালা হত।'

সিরাজ শুধোলে, 'আব্বার সঙ্গে কি নিয়ে মতান্তর ঘটেছিল বলতে পার?'

'ভারত-পাকিস্তানের ব্যাপার। আব্বার মত ছিল উল্টো।'

'কাশ্মীর সম্বন্ধে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বলো।'

'দিন পনেরো থাকার পর হঠাৎ চিঠি এলো সীমান্ত এলাকায় লড়াইয়ে যেতে হবে।'

'লড়াই থেকে ফিরল তিনমাস পরে 'হাবিলদার' উপাধি নিয়ে। সেই সময় যে-কদিন সে আমার সান্নিধ্যে ছিল খুব আনন্দ-ফুর্তি করেছিল। আমাকে নিয়ে

নানান জায়গায় বেড়াতে যেত। শিকারায় কত রাত ঘুরেছি আমরা, পহেলগাঁও গিয়েছি। পাহাড়ে উঠেছি। একদিন হল কি, বুড়ীর ঐ নোংরা ঘর ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে আমার চোখে কি যেন পড়ে গেল। চোখ যত কচলাই ততই জ্বালা করে। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলাম।'

'সকালে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাবে বলে বের হল, ওকে বুড়ী শুধোলে, 'হ্যাঁরে বাপ, হাসপাতালে যাবি কেন? তোর বউয়ের কি বাচ্চা হবে নাকি? সারারাত কাতরাচ্ছিল।'

হামিদও ঠাট্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার আন্দাজ ঠিক খালাআম্মা। আমার একটা বাচ্চা হলে তোমাকে জ্বালাবে আর তোমার দুষ্টু ভেড়াগুলোকে শায়েস্তা করবে—কেমন, ভাল হবে না কি?'

'বুড়ী খুব খুশী হয়ে হামিদকে দোয়া করল। আমরা হাসপাতালে এলাম। আমার চোখ পরিষ্কার করার সময় হামিদ ঐ হাসপাতালেই অন্য একটি রোগীকে দেখতে গিয়েছিল।'

'কে সে?'

'ঐ লায়লার মা। লায়লার মা ছিল আবদুল হামিদের আপন মাসতুতো বোন। তার বিয়ে হয় এক গুণ্ডা মাতালের সঙ্গে। ঐ মাতালটা নাকি একসময় হামিদের বন্ধুও ছিল। মাসতুতো বোনের কেউ ছিল না, ঐ মদত দিয়ে বিয়ে দেয়।'

'বিয়ের পর একটা বস্তিতে থাকত। মাঝে-মধ্যে হামিদ বোনের কাছে যেত। একদিন নাকি বোনকে হরদম মারতে তার সেই গুণ্ডা মাতাল স্বামীকে ভীষণ মার দেয় হামিদ। তারপর বোনের স্বামী পালিয়ে যায়। লোকটার নাম ছিল রেজা। রেজা পালিয়ে যায় নাকি বিহার মুলুকে। সঙ্গে নিয়ে গেছিল অন্য একটি মেয়েকে। যাহোক ওর মাসতুতো বোন রহিমা তখন ছিল গর্ভবতী। মাঝে মাঝে উনি গিয়ে কিছু টাকা পয়সাও বোধহয় দিত। রহিমা মুরগী-ছাগল পুষে সেলাই করে দিন কাটাত। ওকে দিনের দিন হাসপাতালে দিয়ে এসেছিল। চোখ দেখানোর পর আমাকে বাপের ঘরে এনে রাখল দিন পাঁচেক। তারপর আবার হাসপাতালে নিয়ে গেল আমাকে, চোখের বাঁধন খুলতে। কিন্তু চোখ দেখিয়ে ফেরার সময় মাত্র দুদিনের বেওয়ারিস একটা কচি তুলতুলে বাচ্চা আনল হামিদ। আমার কোলে তুলে দিল। ওর মুখে-চোখে কি আনন্দ! বলল, 'দুঃখের ব্যাপার! আমার মাসতুতো বোন রহিমা এই বাচ্চাটাকে প্রসব করার বারো ঘণ্টা পরে মারা

গেছে। এখন একে কে নেবে তুমি আমি ছাড়া?—আমি আদর করে তুলে নিয়েছি যখন আর কি বুক থেকে নামাতে পারি? সেই বাচ্চাকে নিয়ে সোজা আমরা চলে এল্যাম বাড়িওলীর বাড়িতে। বুড়ী জানল আমারই বাচ্চা হয়েছে। এই বাচ্চাকে রেখে সেই যে হাবিলদার চলে গেল আর ফিরল না।'

॥ ২২ ॥

লায়লার কাছে এখন সমস্ত কিছু দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু বাইরের প্রকৃতি যেমন ঘোলাটে অন্ধকারে আর কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢেকে আছে তেমনি তার বাস্তব জীবনের সব পথই অজানা অন্ধকারে ঢাকা। কোথায় যাবে এখন সে? জগৎসংসারের কিছুই তো তার জানা নেই। তার চোখ ভরে জল এলো। তার মা তহুরা চিরকালের জন্ত পর হয়ে গেল। কিন্তু ওরা সুখে থাক—ওরা সুখে থাক।

লায়লা আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। তার পর সে তার কাপড়গুলো একটা পুঁটুলিতে বাঁধল। শালটা মুড়ি দিয়ে পুঁটুলিটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বুড়ো হরমুজের কাশি শুনতে পেল কিছুক্ষণ। সাদা প্রিয় ভেড়াটার কাছে গেল সে। তাকে দেখে ছুটে উঠে এলো ভেড়াটা। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মাথায় মুখে চুমো খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসতে গেলে ভেড়াটাও বেরিয়ে এসে তার পিছু পিছু চলতে লাগল। তাকে তেড়ে গোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দোর বন্ধ করে দিল।

তারপর কুয়াশা ভেদ করে একাই চলতে লাগল। মাঠের পথ অন্ধকার কুয়াশায় ঢাকা। যে মাঠে প্রথম সিরাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেখানে আসার পর সকাল হয়ে গেল। হাত-পা কনকন করতে লাগল। আকলিমা বুড়ীর কাছে গেলে হয়তো সে মেষ চরাতে দেবে কিন্তু বুড়ীটা মারে বড্ড। এখানেই সিরাজের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল! যে খেজুরকুঞ্জটার মধ্যে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে আহার্য এনে খাইয়ে ছবি এঁকেছিল সেখানেও গেল সে। খানিকটা বসে থাকল। কেবলই তার কান্না পেতে লাগল। বসে বসে বেলা হল, রোদ উঠল। গা-হাত গরম হতে সে মাঠের পথ ধরে সোজা উত্তরে চলতে লাগল।

এদিক সেদিক এলোমেলো ঘোরার পর সে দুপুরের দিকে নিশান গাঁওয়ে বুড়ী বাড়িওলীর কাছে এসে হাজির হল।

বুড়ী তাকে দেখে বলল, 'কি খবর রে লায়লী? তোর মা কি তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি নতুন বর পেয়ে? পুঁটলি কেন? কোথা যাবি তুই?'

কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে গেল লায়লার। বলল, 'নানী, আমার জন্মের কথা তুমি কি সব জানো?'

'কেন, তুই তো আবদুল হামিদের মেয়ে—তহুরা তোর মা—এই তো আমি জানি।'

মাথা নাড়ল লায়লা।

বুড়ীর আগ্রহ বাড়ল। গরম-করা ছাগল-দুধের খানিকটা খেতে দিল লায়লাকে। দুটো রুটি আর একটা আপেল দিল।

লায়লা যা কিছু তার মাকে বলতে শুনেছে সবই বলল বুড়ীকে। বুড়ী সব শোনার পর গালে হাত দিল। বলল, 'তোর বাপের নাম রেজা আর মায়ের নাম রহিমা! তারা কোন বস্তিতে থাকত?'

লায়লা বলল, 'তা তো জানি না। জানলে আমি সেখানে যাব।'

'গিয়ে আর কি করবি! মা তো জন্ম দিয়েই মরেছে—বাপ নাকি গুণ্ডা বদমাশ—পুবদেশে কোথায় ভেগে গেছে—কোথায় তার নিশানা খুঁজে পাবি। তবে তোর বাপ, মানে আবদুল হামিদ, আমাকে একদিন বলেছিল একটা মেয়েকে আমার এখানে রাখার জন্যে, আমি রাজি হইনি—ওই মাসতুতো বোনটার কথা বোধহয় বলেছিল। বড় ভাল মেয়ে, বড় দুর্ভাগা, স্বামী বদমাশ, পেটে বাচ্চা আছে। আমি ভেবেছিলাম অন্য আর একটা মেয়ে আনলে তহুরার মন গরম হবে, সংসারে অশান্তি হবে। কোন বস্তিতে থাকত মেয়েটা বোধহয় বলেছিল আবদুল হামিদ। মনে থাকে কি সব, বুড়ো হয়ে গেছি।'

'মনে করে দেখ না নানী। যদি সেখানে থাকে আমার বাপ খুঁজে দেখব। বরে তো আবার বাসায় ফিরে আসতেও পারে। যখন মা মারা গেল আর হাবিলদার আবদুল হামিদও শহীদ হয়ে গেল—তার মার খেয়েই তো চলে গিয়েছিল, পরে কোথাও কিছু করতে না পেরে যদি কাশ্মীরের ঐ বস্তিতেই চলে আসে?'

বুড়ী মনে করতে পারল না। পাশের বাড়ির একটি মাঝবয়সী মেয়ে লায়লাকে দেখে তাদের খোঁজখবর নিতে লাগল। বুড়ীর কাছে আগেই শুনেছিল তহুরা আবার বিয়ে করেছে।

মেয়েটি যখন লায়লার জন্ম বৃত্তান্তের কথা শুনল সে বলল, 'আমি ঐ বস্তিরই মেয়ে। রেজা ভাইকে আমি জানতুম। সে আমাকে সাদি করতে চেয়েছিল। বাপ রাজি হয়নি। তারপর হামিদ বিয়ে দিল তার মাসতুতো বোনের সঙ্গে। রেজার বউয়ের নাম রহিমাই ছিল বটে। আমার বাপ ছিল সেই আনজুমান বস্তির মোল্লা। রেজা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার বউকে মারপিট করলে আমার বাপের কাছে নানান আর্জি পেশ করতে আসত। তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল আর কিছু জানি না।'

মেয়েটি চলে যাবার পর আনজুমান বস্তির খোঁজে বের হল লায়লা। কোন দিক দিয়ে কোথায় যেতে হবে যাবার সময় বউটিকে ডেকে জেনে নিল। সে নাকি অনেক দূর। এখান থেকে মাইল তিনেক। এক জায়গায় পার্বত্য উপত্যকার মধ্যে বস্তিটা। ঘন ঘন বাড়ি। সেখানকার লোকরা সবাই প্রায় কাঠ খোদাই করে নকৃশার কাজ করে। ছুতোরপল্লী বললেই হয়।

লায়লার কাছে পয়সাকড়ি নেই যে গাড়িতে উঠবে। হেঁটেই চলল সে। বাড়িতে হয়তো তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে, বড় বড় কারখানাগুলোতে গালিচা বোনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। লোকজন হাটে-বাজারে চলেছে পথ দিয়ে। গাড়িঘোড়া চলেছে। তার দিকে কেউ কেউ তাকায়। মুখে বসন্তর দাগভরা একটা বদমাশ প্রকৃতির ছোঁড়া তার পিছু নিল।

খানিকটা আসার পর বলল, 'কোথা যাবে তুমি?'

লায়লা রেগে উঠে বলল, 'যেথা যাই না, তোমার তাতে কি?'

'যদি বলি পালিয়ে যাচ্ছ!'

'যাচ্ছি!'

'ধরে নিয়ে যাব।'

'আহা কি জোতনার চেহারা! মুখটা যেন আরশুলায় কুরে খেয়েছে। বদমায়েশী ছাড়িয়ে দোব। ভাগো বলছি। কুত্তার মতো পিছু নেওয়া—আচ্ছা ঐ লোকগুলোকে বলছি।'

ছেলেটা অন্য পথে চলে যাবার সময় হঠাৎ হেসে একচোখ দেখাল।

তাকে লাথি দেখাল লায়লা।

তারপর সে চলতে লাগল। এই ভয়টাই তার মেয়ে-জীবনের বড় ভয়। তার দেহে যৌবন আসছে। কোথায় কিভাবে রাত কাটাবে সে! বস্তিতে খোঁজ নিয়ে যদি তার বাপ রেজার না দেখা পায় তো বুড়ী বাড়িওলীর কাছেই ফিরে আসবে সে।

বিকালে আনজুমান বস্তিতে এসে একটি বুড়ীর কাছে খোঁজ নিতে সে বলল, 'সে বহু বচ্ছর আগের কথা। রেজা ফিরেছিল বটে কিন্তু ঘরদোর বেচে আবার চলে যায়। সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল।'

নিরাশ হয়ে সন্ধ্যায় সময় একাই আবার ফেরার পথে হাঁটতে লাগল। পথে নানান ভয়। সেই ছেলেটার মতো যদি কেউ তার পিছু নেয়? বাড়িতেই ফিরে যাবে কি সে? কোথায় রাত্রে থাকবে সে? কেন এমন করে চলে এলো। শাল মুড়ি দিয়ে অন্ধকার পথে ভূতের মতো হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে আবার বুড়ীর বাড়ি ফিরে এলো। বুড়ী তাকে আশ্রয় দিল। বলল, 'সিরাজ সাহেব তোকে খুঁজতে এসেছিল বিকালের দিকে। খুব দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে। সকালে উঠেই বাড়ি চলে যাবি। মেয়েছেলে, এ ভাবে ঘোরা ঠিক নয়। যাবি তো?'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল লায়লা।

। ২৩ ।

পনেরো দিন কেটে গেল কিন্তু লায়লার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। তহুরার খেয়ে-পরে বসে-শুয়েও কোনো শান্তি নেই। মেয়েটাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে, এত মায়া ছিল ওর ওপরে সে কি জানত! কেন সে পালাল? তাদের মেয়ে নয় এ কথাটা প্রকাশ করা ঠিক হয় নি। কিন্তু তার চেহারায় মা হবার কোনো ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন আবিষ্কার করার জন্যে মেয়েরা বিয়ের সময় যেভাবে নির্লজ্জ তাল্লাসী চালাল এরপর প্রকাশ না করেই বা উপায় কি ছিল তার? ওদের কাছে না বললেও সিরাজ জানতে পারত।

সিরাজ এখন বলে, 'আমাকে তো খুব একটা বাজে দেখতে নয়. বরং ভাল বলেই বলে লোকে। অনেক মেয়েই আমার দিকে তাকায়। মেয়ের লোভ আমার থাকলে আমি বহু মেয়েই পেতে পারি কিন্তু তোমার মতো সন্তানের জননী বিধবা মেয়েকে আমার মতো শিল্পীর চোখে পড়ল কেন? চেহারায় খুঁত থাকলে হাজার পোশাক দিয়ে ঢাকা দিলেও তার রেখা ফোটে আলাদা। শেষ পর্যন্ত দেখলাম আমার চোখ বা দৃষ্টি আমাকে ঠকায় নি।'

এসব কথা মনে করতে করতে মুখ টিপে হাসে তহুরা।

মাহমুদ বুড়ো মেষ ছাগলগুলো মাঠে চরাতে গিয়ে লায়লার খোঁজ করে—প্রতিদিন ফিরে এসে বলে, 'না, কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।'

সিরাজ ভেবেছিল শিল্পমন্ত্রীকে এনে ঘটা করে তার স্টুডিয়োর উদ্বোধন করাবে কিন্তু লায়লার হঠাৎ উধাও হওয়ার ব্যাপারে সে খুব ব্যথা পেল, হতাশ হল। যখন সে কলকাতা থেকে কাশ্মীরে চলে আসে, ট্রেনের মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে মনে পড়েছিল হজরত মোহম্মদের নির্দেশের কথা। যুদ্ধে শহীদ হওয়া বীর সৈনিকের অসহায় বিধবা বা তার পরিবারবর্গকে দেখ। হঠাৎ মনে হয়েছিল, এই তো পথ। হঠাৎ সে টর্চের আলোটা ফেলল তহুয়ার মুখের উপরে। যদি সে লায়লাকে গ্রহণ করত তাহলে তহুয়ার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেত—হতাশা নিরাশায় তার যৌবনটা শুকিয়ে যেত। তহুয়াকে বিয়ে করলে দুদিকটাই রক্ষে হবে এই ভাবনা তাকে যেন মহৎ অনুপ্রেরণা দিল। ওদের প্রতি স্নেহ মমতার আকর্ষণই তখন তার কলকাতার জীবন বীতস্পৃহ করে তুলেছিল। তার উপর আবার তাদের জমিজায়গা দখল করে নিয়েছিল। কানাকড়ির মূল্যে সেসব বেচে দিয়ে এসেই এখানে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজতে হল।

স্টুডিয়োর আঁকাজোকার কাজে বসে নানান কথায় মন সরে যাচ্ছিল সিরাজের। প্রচুর কাজ হাতে পেয়েছে সে। সরকারী কাজ পেয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলো। টুরিষ্ট ব্যুরো, রেল কোম্পানী, জন্মনিয়ন্ত্রণ বিভাগ, অরণ্য সংরক্ষণ বিভাগ, পশুপ্রাণী বিভাগ—রাজ্যের কিছু।

তহুয়া কফি আর কিছু নোনতা নাস্তা নিয়ে এলো। শ্যাম্পু-করা এলো চুলে কপালে লাল ফোঁটা দেওয়া দিব্যি সুন্দর শাড়িপরা বাঙালী মেয়ের মতো সেজেছে তহুয়া। তাকে বাংলা শেখাতে আরম্ভ করেছে সিরাজ। তহুয়া তাকে কাশ্মীরী ভাষা শেখায়।

বাংলাতে বলল সিরাজ, 'কিগো বউরানী!'

হাসল তহুয়া।

সিরাজ বলল, 'একটু কফি খেয়ে নিন।'

তহুয়া তা বলতে চেষ্টা করল। তার আড়ষ্টতা দেখে সিরাজ খুব যেন আমোদ পেল। কাছে টেনে আদর করে রঙ দিয়ে ঠোঁটটা এঁকে দিল। আদর পেয়ে তহুয়া স্টুডিয়োর মধ্যেই একটু আরাম-আয়েস পাবার জন্তে গা আলগা দিয়ে বসতে বা শুতে চাইল সিরাজ তাড়া দিলে, বলল, 'উঁহু, এখানে নয়, এখন কাজের সময়, অনেক টাকার কাজ।'

তহুয়া জিভ কেটে ক্ষমা চেয়ে উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় তার আঁচল ধরে টান দিল সিরাজ। হেসে তহুয়া সরে এসে সিরাজকে চুম্বন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিরাজ কাজে মশগুল ছিল কতকক্ষণ কে জানে, হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো কাম। স্থন ইমিডিয়েটলি, জামসেদ আনোয়ার।

হাতের কাজ যে অবস্থায় ছিল ফেলে রেখে সিরাজ বের হয়ে পড়ল।

স্টুডিয়োর দোর বন্ধ করে দিতে বলে গেল তহুরাকে।

পাজামা পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়িয়ে নিয়েই সিরাজ চুরুট টানতে টানতে টাঙ্গায় চড়ে এসে হাজির হল উকিল বুড়োর বাড়িতে।

জামসেদ আনোয়ার বললেন, 'নতুন সুন্দরী বউ পেয়ে যে আমাদের ভুলেই গেলে বন্ধু। বসো। কথা আছে।'

উকিল সাহেব আলমারি থেকে মদের বোতল বার করে এনে টেবিলে রাখলেন। তাঁর খৃস্টান রক্ষিতাটি আদাব জানিয়ে কিছু স্যাণ্ডুইচ আর এগ্‌রোল দিয়ে গেল।

উকিল সাহেব ব্রাণ্ডি ঢেলে সিরাজকে পান করতে অনুরোধ করলেন।

সিরাজ প্রথমে দ্বিধা করল। তারপর পান করল খানিকটা। হঠাৎ সে চমকে গেল, যখন লায়লাকে দেখতে পেল জানালার মধ্যে দিয়ে। ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে কাচা কাপড় মেলে দিচ্ছে সে।

বলল, 'আশ্চর্য! ঐ তো লায়লা, এখানে এলো কি করে? কতদিন ও আছে এখানে?'

'সবুর ভায়া, সবুর! সেই জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি। ও একদিন মলিন বেশে ভিক্ষে করতে এলো। ওকে দেখে যেন মনে হল কোথাও দেখেছি। শুধোলেম, কেউ নেই তোমার? মা-বাপ নেই? বলল, না। বললাম, তাহলে পথে পথে ভিক্ষে না করে আমার বাড়িতে থাকো। ভাল খাবার পোশাক পাবে, বাড়িতে টুকিটাকি কাজ করবে। বাজার করে এনে দেবে। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে আদর করতেই মেয়েটা অঝর নয়নে কাঁদতে লাগল। ওকে রেখে দিলাম। ওকে পড়াই এখন আমি। বেশ সুন্দর মেয়ে।—লায়লী'—ডাক দিলেন জামসেদ আনোয়ার।

'কেন দাদু! সাড়া দিয়ে ছুটে এসে হঠাৎ সিরাজকে দেখে লজ্জায় যেন এতটুকু হয়ে গেল লায়লা।

সিরাজ যেন চেনে না এমন ভান করে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'এদিকে এসো।' উকিল সাহেব ডাকলেন। 'বলো তো এই লোকটি কে হতে পারে?' শুধালেন তিনি।

লায়লা কিছু না বলে মাথা নিচু করে পা ঘষতে লাগল।

'ইনি খুব বড় শিল্পী। তোমাকে যেমন দেখতে ঠিক তেমনি একটা ছবি এঁকে দিতে পারেন।'

সিরাজ এবার হাসল একটু।

লায়লাও তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে হাসল।

লায়লাকে কাছে টেনে কোলের ওপরে বসিয়ে তার মাথায় চুলগুলো সুবিন্যস্ত করতে করতে উকিল জামসেদ আনোয়ার বললেন, 'একে আমি পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। চিরকাল আমার কাছে থাকবে। আমার বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে সব একে দেব ভেবেছি। নতুন করে মানুষ করব। নিজেই ওর টিউশনির ভার নিয়েছি। আর এক মহিলা ওকে নাচ শেখাচ্ছেন, ভদ্রমহিলা বলছেন, নাচ ওর নাকি হবে। চুল কেটে বব্ করে ওকে একেবারে মেম বাচ্চা বানিয়ে ছাড়ব।'

সিরাজ মৃদু সমর্থন জানান।

লায়লা স্থির চোখে কিছুক্ষণ সিরাজের মুখটা দেখার পর হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

'তাহলে দুপুরে আমাদের এখানে আজ খানাপিনা করা হোক ভাই সিরাজ।' বললেন উকিল সাহেব। সিরাজ বলল, 'জী না। আমি তো কিছু বলে আসিনি, খাবার নিয়ে মুখ চাইবে। অন্য একদিন আমরা আসব। আচ্ছা দাদু, মেয়েটি কি কিছু বলেছে, এর আগে সে কোথায় ছিল, কে ওর মা-বাপ?'

'সেসব কিছুই বলেনি, তবে ও বলেছে আগে নাকি আনজুমান পল্লীতে জন্মেছিল। শিশুকালেই ওর মা রহিমা বিবি মারা যায়। একটা বিধবা মেয়ের পালিতা। আকলিমা বুড়ীর মেষ চরাত। বাপ রেজা নাকি নামকরা গুণ্ডা বদমাশ ছিল। সে কার একটা মেয়ে নিয়ে পুবদেশে বহুকাল আগে পালিয়ে গেছে। আকলিমা বুড়ী ওকে মারধর করত বলে মেষ চরানো ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াত।'

'ওর পালয়িতা মা তো ওকে খুঁজতে পারে?' বললে সিরাজ। উত্তরে উকিল সাহেব বললেন, তা পারে. তবে মেয়ে নিয়েও তো ঝক্কি কম নেই। ওর পালয়িতা যদি গরিব হয় তবে ওর সুখের জন্য ওকে এখন ত্যাগ করাই মঙ্গল।'

সিরাজ হেসে বলল, 'আপনি জাদু জানেন দেখছি, ওকে কি করে বশ করলেন? পথে পথে মুক্ত স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে, সে কি সহজে বশ মানবে? শেষ পর্যন্ত আপনি ওকে মানুষ করার পর বড় হয়ে যদি কোনো ছেলেকে ভালবেসে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়, কেন না ওর রক্তেও উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ থাকতে পারে।'

'অসম্ভব কিছু নয়! সাবালিকা হলে যা খুশী করবে। এখন বুড়োর কাছে তো থাকুক। স্নেহমমতায় ওকে আচ্ছন্ন করেছি। ওর বয়সের সঙ্গে আমার বয়স যেন সমান করে ফেলেছি। দুজনে সারাদিন ছেলেমানুষী করি।'

'মহিলাটিকে কি দেবেন?' শুধোলে সিরাজ।

জামসেদ আনোয়ার মদ খেলেন খানিকটা। চোখ মুখ বিকৃত করলেন। বললেন, ও এখন নাকি নান্ হয়ে মিশনারীতে যোগ দিয়ে সুদূর আফ্রিকায় চলে যাবে আর্তের সেবা করার জন্যে, যেখানে আছেন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক সায়েৎজার।'

সিরাজ আর কিছু বলল না। মদ খেতে লাগল। উকিল সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। সিরাজ ভাবতে লাগল, লায়লা তাহলে তাকে ভালবেসেছিল। তার মায়ের ওপরে ঈর্ষায় পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসে ভিক্ষেও করেছে! ওকে এখন আর তাদের সংসারে রাখা যায় না। ওর চোখে মুখে নতুন আলো জেগে উঠেছে। তাকে হঠাৎ সেই আলোয় বিমোহিত করেও তো ফেলতে পারে। মানুষ তো পশুই। শয়তানের ফন্দিতে পড়ে হঠাৎ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তারপর ও জহুরার গতিবিধি গোপনে লক্ষ করতে থাকবে। তাছাড়া তাকে 'বাপ' বলে সম্বোধন করতেও চাইবে না। থাক ও, এখানেই থাক। ওকে নিয়ে যাবার কথা কোনো কিছুই বলবে না সে। মানুষ হতে পারলেই ওর মঙ্গল।

উকিল সাহেব ফিরতে উঠে পড়ল সিরাজ। বলল, 'অনেক কাজ এখন আমার। আপনার একটা ছবি এঁকে দেবো একদিন। ভারী সুন্দর আপনাকে দেখতে। রুপোলী চুলওয়ালা, এমন সুস্বাস্থ্য, সুন্দর লাবণ্যভরা বুড়ো মানুষ বড একটা আমি দেখিনি।'

'তাহলে লায়লী আমার কাছে রইল?'

'থাক।' বলে সিরাজ যখন হাঁটার জন্যে পা বাড়াল তার তখন বেশ নেশা ধরেছে। পা টলছে। চোখে পড়ল লায়লা দোরের মাঝখানে দুদিকে দুটো হাতে চৌকাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝল সে, বুড়ো উকিল সাহেব সবই জানেন। জানেন যে লায়লা তাদেরই কন্যা। ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা গোপন করলেন।

পথে দাঁড়ানোর পর টাঙ্গা পেয়ে গেল সিরাজ। তাতে উঠে বসার পর উকিল সাহেব হাত তুলে বিদায় জানালেন। বাইরে এসে তখনো দাঁড়িয়েছিল লায়লা। ফিরে তাকিয়ে দেখল উকিল সাহেব তাকে ধরে বাড়ির মধ্যে নিয়ে চলে গেলেন। চোখ বন্ধ করে ঝিমোতে লাগল সিরাজ। নেশার ঘোরে সে ভাবতে লাগল:

তহুরা কি অনন্ত সৌন্দর্যরসের খনি। তার মধ্যে অবগাহন করার সুখ জগৎজনেই বা কতটুকু বুঝবে।

সিরাজ ফিরে আসার পর যখন তাকে ধরে নামাতে আর পাঁজা করে টানতে টানতে দোতলার ঘরে আনতে হল তহুরাকে, তখন সে শুধু বলতে লাগল, 'না না, এসব কাণ্ড ভালো নয়, সীমা ছাড়ানো উচিত নয়, কে তোমাকে এত খাওয়াল—জানো তোমার এসব সহ্য হয় না—আবার যদি কিছু হয়—এই এই—ছাড়ো, এখানে নয়, মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরা দেখতে পাবে। মামুদ জানতে পেরেছে।'

সিরাজ বিছানায় শুয়ে পড়ার পর চোখ বন্ধ করে হাতটা একবার হতাশ ভঙ্গিতে নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'যাকগে শালা, চুলোয় যাক। লায়লা বুড়োর কাছেই থাক।'

'লায়লা!' বাংলাতে কথা বলছিল সিরাজ। তহুরা সবটা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে লায়লার কথা বলছে তা বুঝতে পারল।

সিরাজ আর কিছুই বলতে পারল না। মাথা তুলতে পারছে না। যেন অগাধ জলের তলায় অথবা অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তহুরা তাকে চেপে ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ।

মাহমুদ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে তাকে রান্নার বাকিটা দেখতে বলল তহুরা। সিরাজের সুন্দর নকশার মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল। কেমন বিকৃত হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ডাকল তাকে 'এই, শুনছ।'

'শিল্পীর খেয়ালকে এদেশ ভালবাসে না—পিকাসোও এখানে মরে যেত—তহুরা তুমি মাঠে মারা যেতে, আমি যদি সর্বহারা হয়ে তোমার কাছে না আসতাম—'

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলছ। তুমি কি ভাল। আমার দুঃখের ঘরে সূর্য উঠবে। তুমি স্থির হও, শান্ত হও, বুঝেসুঝে কাজ করো। তোমাকে জগতের একজন নামকরা শিল্পী হতে হবে—'

'ধ্যেৎ। জগতের নামকরা শিল্পী! আমি কিছু চাই না, শুধু তোমাকে চাই।'

সিরাজের উন্মত্ততার মধ্যে তহুরা হেসে কেঁদে আনন্দে দুঃখে যেন পাগল হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, এই ভাল, এমনি ঝড়, এমনি প্লাবনই সে চেয়েছিল—তাকে দলে পিষে দিয়ে যাক। ভদ্রতা লজ্জা শালীনতা সব এখন ধুয়ে মুছে যাক।

মাহমুদ গালে হাত দিয়ে বসে রইল। রান্না করা গরম জিনিসপত্র ঠাণ্ডা হতে লাগল। বিরক্ত হয়ে সে এক সময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসে কাশতে কাশতে দোরের কাছে অপেক্ষা করেও যখন সাড়া পেলে না তখন পর্দা সরিয়ে ভেতরে চোখ পড়তেই হঠাৎ পর্দা ফেলে দিলে। ওরা ঘুমোচ্ছে এখন বেঘোরে।

নেমে এসে তামাক সেজে নিয়ে শুকনো পেটে গড়গড়া টানতে লাগল। বহু কালের বিশ্বস্ত বুড়ো চাকর মাহমুদ—মনিব মরার পর সে দেশে চলে গিয়ে চারটে দিনও সেখানে থাকতে পারে নি।

॥ ২৪ ॥

এক বছর পরে সিরাজের মনে হল কাশ্মীরে আসা তার সার্থক হয়েছে। স্টুডিয়োতে এখন তার প্রচুর ভিড়, অনেক কাজের চাপ। সেক্রেটারী. স্টেনো টাইপিস্ট, দারোয়ান, দুটো ঝি, একটা চাকর রাখতে হয়েছে।

কথামতো শিল্পপতি আয়াতউল্লাহ সাহেব কলন্দরের নামে দশহাজার টাকা দিয়েছেন তহুরার হাতে। ইউনিয়নে একহাজার টাকা দান করার পর শ্রমিকরা উদ্যোগী হয়ে শহীদ-স্তম্ভ তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সিরাজ নিজে দরবার করার পর তিনি শহীদ-স্তম্ভ নির্মাণ করার অনুমতি দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

কাশ্মীরী ভাষা শেখার পর অবাধে এখন সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সিরাজের মেলামেশা করা সহজ হয়ে গেছে।

এক বছরের মধ্যে তিনটি প্রদর্শনী করতে পেরেছে সে। শ্রীনগর, বোম্বাই এবং দিল্লীতে। নাম হয়েছে, বিক্রি হয়েছে অনেক ছবি, নানান কাগজে আলোচনা হয়েছে তার ছবির নতুন দিক-দর্শন সম্বন্ধে।

তহুরা তার বাপের মৃত্যুপণ হিসাবে যে টাকাগুলো পেয়েছে তা দিয়ে একটা ফলের বাগান কিনেছে।—মাহমুদ সেই বাগান দেখাশুনো করে।

প্রচুর কাজ, ধার্য-করা-দিনে কাজ দিতে পারে না সিরাজ, লোক এসে ফিরে যায়—সে দিন পেছোয়। এর মধ্যে সাঙ্গপাঙ্গরা এসে ভিড় করে, বাজে সময় নষ্ট করে।

রিজিয়াকে রমজান বিয়ে করল শেষ পর্যন্ত সিরাজের অনুরোধে, অবশ্য এর জন্য রমজান তার ক্ষয়িষ্ণু দশা থেকে মুক্তি পেল।

ইসমত নাকি কোনো এক সাহেবের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেছে।

তিন জায়গায় প্রদর্শনীর ব্যাপারে প্রচুর খেটেছে রউফ তার সঙ্গে থেকে।

শান্তিনাথ দেউশকর এখন সিরাজের সেক্রেটারির কাজ করে। ছেলেটি বেশ বিনয়ী, কাজ বুঝে নিতে এবং পার্টিকে বোঝাতেও পারে।

সিরাজের নিজের চেষ্টায় শাহী গাঁওয়ে ইলেকট্রিক এসেছে—কয়েকটি রাস্তা তৈরি হয়েছে।

গাঁয়ের লোকরা তাকে এখন বেশ মান্যগণ্য ব্যক্তি বলে সালাম ঠোকে।

কলন্দরের কাঠের দোতলা বাড়ি মেরামত করে রঙ দিয়ে ছবির মতো সুন্দর করে নিয়েছে সিরাজ। ফুলবাগান চারদিকে।

মাদ্রাসাটিকে সরকারী অনুমোদন পাইয়ে একটু দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

একদিন নিজের কাজের মধ্যে ডুবে ছিল সিরাজ, শিল্পপ্রেরণার কাজ, কাশ্মীরের নিচুতলার দুঃখী দরিদ্র জীবনের ওপরে নানান ধরনের স্কেচ আঁকছিল সে, হঠাৎ তহুরা এসে বলল বাংলাতেই, 'দেখ, দেখ কে এসেছে, ফিরে তাকাও একবার।'

সিরাজ মুখ ফেরাল। দেখল লায়লা এসেছে। তার ববকাট্ চুল। একটু লম্বা হয়ে গেছে। পরনে ম্যাক্সি।

আদর করে কাছে টেনে বলল, 'এই যে মা-মণি এসো।'

তহুরা খুশীতে যেন উছলে পড়ছে। বলল, 'ও নাকি চলে এসেছে, আমার কাছেই থাকবে। এসে মা বলে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

'হ্যাঁ, আসবেই তো। আমাদের মেয়ে! আমাদের সোনা! কিন্তু বুড়ো উকিল তোমাকে ছাড়লেন?'

'লোকটা ভাল নয়। বলল লায়লা।'

'বলতে নেই, চুপ চুপ। ঠিক আছে আমি সব ম্যানেজ করে নেবো। তাঁর কাছে সেই খৃস্টান মেয়েটি আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'যাও, তুমি কিছু খাও। আমিই তোমার পড়াশুনো, নাচ শেখার সব ব্যবস্থাই করব।'

'চার জায়গায় নেচে আমি ফার্স্ট হয়েছি। সেই মেডেলগুলো বুড়োর বাড়ি পড়ে আছে।'

'থাক গে, তোমার নাচ শেখাটা তো সঙ্গে আছে, তাই হলেই যথেষ্ট।'

রউফ এসে লায়লাকে দেখেই বলে উঠল, 'আরে ব্যাস, এ যে মেমসাহেব হয়ে গেছে! বেশ নাচে মেয়েটি—শ্রীনগর শহরে ওর নাম হয়ে গেছে।'

তহুরা বলল, 'বেশ তো—তাহলে তুমি ওকে বিয়ে করো।'

সিরাজ হাসতে লাগল।

রউফ বলল, 'আপনাদের সম্মতি থাকলে আমার অবশ্য আপত্তি নেই।'

লায়লা লজ্জায় মাথা নিচু করল।

সিরাজ উঠল। বলল, 'সে পরে হবে। লায়লা আর একটু বড় হোক।'

মা-মেয়েতে ওরা দুপাশে-গোলাপ-ফোটা-কেয়ারী-করা রাস্তা দিয়ে কুঠিবাড়ির দিকে চলে গেল।

সিরাজ একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

রউফ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে সিবাজ আবার কাজ নিয়ে বসল।

দুপুরে লায়লা এসে ডাকল, 'বাপি, এসো, খাবার সময় হয়েছে, মা ডাকছে।'

স্নান আহারাদির পর ঘুম দিল কিছুক্ষণ সিরাজ। বিকেলে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে-বসে-থাকা তহুরাব দিকে চোখ পড়তেই সিরাজ চমকে উঠল, এই তো সেই মূর্তি। সেই মোনালিসা! অবিকল এক রকম। তেমনি চোখ মুখ, ভাবভঙ্গি। তেমনি চুল, বসার ভঙ্গি পর্যন্ত।'

সে খুশী হয়ে এসে ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলল, 'কি ভাবছ বলো তো?'

মৃদু চাপা হাসি হেসে মাথা নিচু করল তহুরা।

'কি গো, শুধু হাসছ কেন, বলোনা কি হয়েছে তোমার, এমন অন্যমনে কি ভাবছ তুমি একা একা।'

'বলতে আমার লজ্জা লাগে।'

'মা হয়েছ বুঝি!'

তহুরা হেসে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ সিরাজের পায়ের ওপরে মাথা নামিয়ে দিল।

সিরাজ তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'বীর শহীদ হাবিলদার আবদুল হামিদের স্বপ্ন তোমার মধ্যে বেঁচে থাকুক এই কামনাই আমি করি।'

তহুরা যখন মাথা তুলল, দেখা গেল তার চোখভরা জল॥
